শৃঙ্খল ঝঙ্কার

বীণা দাস

প্রস্তাবনা

১৫ই আগস্টের আর দেরি নাই। মনের মধ্যে ক্ষোভ, নিরাশা, আর সংশয়ের অন্ধকার যত গাঢ় হয়েই জমে থাকুক না কেন, তারই মাঝে মাঝে বিদ্যুতের শিখার মতো সমস্ত দেহমনে শিহরণ তুলে, নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের বুক চিরে, একটা কথা বারে বারেই জ্বলে উঠছে—আমরা স্বাধীন হচ্ছি! স্বপ্ন নয়, মায়া নয়, মতিভ্রম নয়! স্বাধীনতার অধিকার আমরা লাভ করেছি, ইংরাজ এ দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে। আশেপাশে সকলের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি, সবার মুখ এখনও এত নিষ্প্রভ কেন? স্বাধীনতার সূর্য উঠছে তার আলোতে সারা দেশটা ভাস্বর হয়ে উঠছে না কেন? স্বাধীনতার এই রূপ? এই বিচ্ছেদ, ভ্রাতৃহত্যা, নিষ্ঠুর রক্তের হোলিখেলা, এই ক্ষুদ্র স্বার্থান্ধ কলহ? কিন্তু তা হোক, তবু ভুলতে পারি না, কাউকে ভুলতে দিতে ইচ্ছা করে না—ভারতবর্ষের পরাধীনতার কালিমা আজ মুছে যাচ্ছে। "শিকল দেবীর পূজাবেদী" আজ আর আমাদের এগিয়ে চলার সমস্ত পথ রুদ্ধ করে নেই। এ না-থাকা যে কত বড়ো না-থাকা, তা আজ হয়তো আমরা ঠিক বুঝতে পারছি না, কিন্তু ক্রমে ক্রমে বুঝব; আর বুঝবে তারা—যারা আমাদের পরে আসবে, যারা গড়ে তুলবে স্বাধীনতার ভিত্তিতে আমাদের ভবিষ্যতের স্বর্ণসৌধ।

জাতির জীবনে আজ একটা সন্ধিক্ষণ। রাত্রি—বেদনার কালরাত্রি এসে মিশছে "দিনের পারাবারে"। আলোয় অন্ধকারে জড়ানো এ এক অপূর্ব বিচিত্র মুহূর্ত। ঠিক এমনি সময় আমাদের অনেকেরই জীবনগুলোও যেন কিছুক্ষণের জন্য থমকে যেতে চায়, গতি শ্লথ হয়ে আসে, চোখে ঘনিয়ে আসে যেন কিসের স্বপ্নঘোর। কলে-চাবি-দেওয়া ইঞ্জিনের মতো নিশ্বাস রুদ্ধ করে আমরা একদল মানুষ একটানা একটিমাত্র লক্ষ্য সামনে রেখে ছুটে চলেছিলাম। দিগ্‌বিদিক জ্ঞান ছিল না, বিশ্রাম পাই নি, নিজেদের প্রতি দয়া করি নি—কিসের যেন নিষ্ঠুর কশাঘাত দিবারাত্র ছুটিয়ে নিয়ে চলেছিল। আজকে পৌঁছেছি একটা জায়গায়—সামনে বড়ো বড়ো হরফে লেখা "মুক্তি"! স্বাধীনতা!" চোখকে বিশ্বাস হয় না, চারদিকে তাকিয়ে প্রত্যয় জাগে না মনে এরই জন্য এমন করে ছুটে চলেছিলাম। আশেপাশে এরই মধ্যে কারা যেন গুঞ্জন শুরু করে দিয়েছে—"হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনও খানে।"

তবু স্বাধীনতার অরুণোদয়ের প্রদোষান্ধকারে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থাকতে ইচ্ছা করে। এরই অস্পষ্ট আবছা আলোয় ইচ্ছা হয় জীবনের পাতাগুলো উলটিয়ে দেখে

নিতে। নতুন যুগ আসবে, তার আবাহন শিগগিরই শুরু হবে। হয়তো সে বৃহৎ কর্মযজ্ঞে আমরাও বাদ পড়ব না। কিন্তু তার আগে কিছুক্ষণ মনটা মগ্ন হয়ে থাকতে চায় যে যুগ চলে যাচ্ছে তারই বিষণ্ণ অস্ত আভায়। আর ইচ্ছা হয় তারই কিছুটা সুর কোনো একটা বাঁশিতে ধরে রেখে দিই। পুরাতনকে সবাই ভুলবে জানি—আজকের দিনের সমস্যায় কালকের বেদনাকে কেউ স্থান দেবে না। তবু আশা হয়, অতীত দিনের বাঁশির সুরের এই করুণ ভৈরবী ভারতবর্ষের নতুন প্রভাতের শুভ্র আলোয় একেবারে বেসুরো শোনাবে না হয়তো। হয়তো বা পথিকের পায়ে-চলা ক্ষণেকের জন্য উদাস করে তুলবে, তার চোখের সামনে এঁকে তুলবে হারানো দিনের বেদনা-বিধুর স্মৃতি।

১

কত সময় কতজন আমায় জিজ্ঞাসা করেছে, "আপনার নিজের জীবনের গল্প শুনব।" তাদের সাগ্রহ কৌতূহল কোনোদিন মেটাতে পারি নি। গল্প করবার মতন কী যে আছে কিছুই যেন ভেবে পেতাম না। তাছাড়া মনে হত, নিজের প্রগাঢ় অনুভূতির কতটুকুই বা মানুষ গল্প করে প্রকাশ করতে পারে? আজও কাগজে কলমে ঠিক সে দুঃসাধ্য চেষ্টা করব না। কিন্তু সম্পূর্ণ একটা যুগকে কেন্দ্র করে আমার যে এই ৩৬ বছরের জীবন বিচিত্র ওঠানামার মধ্যে বয়ে চলেছে—সেই যুগ, সেই দিনগুলো, আর সেদিনকার বিচিত্র অভিজ্ঞতাগুলোকে কিছুটা ভাষা দিতে চেষ্টা করব। জীবনের মূল্য আমার অতি সামান্য; কিন্তু তার মধ্যে যে-সব জীবনের ছায়া পড়েছে, যে বেদনা আর সাধনার সংঘাতে আমার ক্ষুদ্র জীবনের সৃষ্টি—তাদের তো তুচ্ছ করতে পারি না। একদিন যে ঝড়ের উদ্দাম হাওয়া গৃহের শান্ত সুখনীড় থেকে আমাকে ছিনিয়ে নিয়ে দুঃসাহসী যাত্রাপথের মাঝখানে টেনে নিয়ে ফেলেছিল, সেই দুর্দম ঝড়ই তো ক্রমে ক্রমে বিরাট হয়ে, প্রবল হয়ে সারাদেশেরই যা-কিছু জীর্ণ, যা-কিছু স্থবির, যা-কিছু আবর্জনাময়, নিঃশেষে উড়িয়ে দিয়ে সারা দেশটাকে মুক্তির উপকূলে এনে দিল। আমার এই যাত্রাপথের কাহিনীর প্রতি ছত্রে, প্রতি ছত্রের অন্তরালে থাকবে সেই প্রবল ঝড়েরই পদধ্বনি।

কিন্তু তবু এও ঠিক, লিখতে গেলে নিজেকেই কেন্দ্র করে লিখতে হবে। আমি তো শুধু আমারই মনের মুকুরখানি মেলে ধরতে পারব যাতে চিরদিনের জন্য আঁকা হয়ে রয়েছে কত চলমান পথিকের ছায়াছবি। তাছাড়া শিল্পীর সম্পূর্ণ নিরাসক্ত দৃষ্টিভঙ্গিই বা আমার কোথায়? আমার পৃথিবীর যে ছবি আমি আঁকব সে আমারই মনের আনন্দ-বেদনার রঙ, আমারই কামনার তুলি দিয়ে। সেজন্য তার মধ্যে না জানি থেকে যাবে কত আত্মকেন্দ্রিকতা, কত কল্পনার অতিরঞ্জন, কত বাসনার বিভূতি। তবু সান্ত্বনা এই যে ব্যক্তির মধ্যে দিয়েই বিশ্বপ্রকৃতি চিরদিন কথা কইতে ভালোবাসে। প্রতিটি মানুষের মধ্যে দিয়েই বিশ্বমনের বিচিত্র আত্মপ্রকাশ। সেদিক দিয়েও কোনো মানুষই একক নয়, বিচ্ছিন্ন নয়, তুচ্ছও নয়।

২

আমার ছেলেবেলাটা ছিল একান্ত গৃহগত—মা-বাবার কোলে অতিরিক্ত আদর দিয়ে ঘেরা। ভাইবোনেদের মধ্যে আমি প্রায় সকলেরই ছোটো, খালি একটিমাত্র ভাই আমার ৮ বছর পরে জন্মায়। সেজন্য ছোটোর আদর অনেকদিন ভোগ করে নিয়েছি, তার

ফলে খুব আবদারে আর জেদী ছিলাম নাকি। রাগ হলে দিদিদের চুল নাকি এমনই টেনে ধরতাম যে কিছুতেই ছাড়ানো যেত না। এ-সব অবিশ্যি আমার মনে নেই। তবে আবদার করে পা ছড়িয়ে কেবলই যে কাঁদতে বসতাম সেটা মনে পড়ে। মা ভোলাতে না পেরে হাল ছেড়ে দিতেন, বাবা বাড়ি ফিরে এসে কোলে তুলে নিয়ে উঁচু করে ধরে বলতেন—"দেখি, দেখি ম্যাজিক—এই কত বড়ো হয়ে গেলি তুই—আমার চেয়েও বড়ো।" সঙ্গে সঙ্গে আমি হেসে উঠতাম। শেষে এটা যেন কতকটা অভ্যাসের মতো হয়ে দাঁড়িয়েছিল, কান্না আরম্ভ করে মনে হত বাবা না আসা পর্যন্ত কিছুতেই আমার থামা চলবে না!

ছোটোবেলায় বন্ধুবান্ধব বা সমবয়সীদের সঙ্গে খুব বেশি খেলাধুলা করতাম না, তার চেয়ে ভালোবাসতাম মা'র কোলে বসে গল্প শুনতে আর নিজে গল্প করতে। এই গল্প করার অভ্যাস বড়ো হয়েও ছিল, যেখানে যা-কিছু হত বাড়ি ফিরে এসেই মা'র কাছে বলা চাই। মা'র মতন অমন ভালো শ্রোতা আর কোনোদিন পাই নি।

এ ছাড়া মনে পড়ে ছোটোবেলায় দিদির (সবচেয়ে বড়োদিদি) কাছে কবিতা শোনা আর কবিতা শেখা। রবীন্দ্রনাথের 'শিশু'র অনেকগুলি কবিতা খুব ছেলেবেলায় দিদি আমায় মুখস্থ করিয়েছিলেন, অনেক জায়গায় সেগুলি আমাকে দিয়ে বলানো হত। দিদিদের স্কুল-কলেজের কোনো কোনো অনুষ্ঠানে আমাকে সাজিয়ে-গুজিয়ে নিয়ে যাওয়া হত কবিতা বলবার জন্য। কিন্তু ও-সব কবিতা ঠিক কবিতা বলে বুঝতাম না, এমনিই বলে যেতাম।

কবিতার রস প্রথম যেদিন পাই সেদিনকার কথাটা কিন্তু খুব মনে আছে। একদিন বর্ষার দিনে, বাইরে বৃষ্টি পড়ছে, ঘরে জানালার ধারে একটা টেবিলের উপর বসে দিদি আমাকে 'শিশু' থেকে "নদী" কবিতাটা আবৃত্তি করে শোনালেন। দিদির মুখের দিকে তাকিয়ে তন্ময় হয়ে কবিতাটা শুনলাম—অদ্ভুত, সম্পূর্ণ নতুন ধরনের একটা অনুভূতি সেদিন হয়েছিল। তখন বুঝি নি, এখন বুঝি তাকেই বলে কাব্য-রসাস্বাদন। দিদিকে উচ্ছ্বসিত হয়ে বললাম, "অনুদিদেরও (প্রায় সমবয়সী মামাতো বোন) এটা পড়ে শুনিয়ো দিদি।" দিদি আমার কথা রেখে একদিন ওদের সামনেও কবিতাটা পড়লেন। কিন্তু সেদিনের সে জিনিস আর হল না। সেদিনের বৃষ্টির গান, দিদির গলার স্বর আর কবিতার ছন্দ একসুরে মিলে গিয়ে যা সৃষ্টি হয়েছিল তা আর ফিরিয়ে আনা গেল না।

ছোটোবেলায় আমার লেখাপড়া শুরু মা-বাবারই কাছে। ছেলেমেয়েদের অনেকদিন অবধি স্কুলে না দিয়ে বাড়িতে নিজেরা পড়াতেই তাঁরা ভালোবাসতেন। ছোটোবেলায় লেখাপড়া শেখাটা হাসিখেলার মধ্য দিয়েই হয়ে গিয়েছিল। মা কুটনো কুটতেন, আমি পাশে ফার্স্ট বুক নিয়ে পড়তাম। বাঙলা ইংরিজি শিখতে কষ্ট হয় নি কিন্তু বাবা যখন রাতে মুখে মুখে নামতা শেখাতে আরম্ভ করতেন তখনই চোখে একসঙ্গে ঘুম আর কান্না ভিড় করে আসত।

এ ছাড়া আর-একটা জিনিস খুব মনে পড়ে। বাবা মাঝে মাঝে আমাদের সব

বোনেদের কাছে বসিয়ে গম্ভীর গলায় ডি. এল. রায়ের নাটক ভীষ্ম, সাজাহান প্রভৃতি পড়ে পড়ে শোনাতেন। বীররস আর করুণরসের সঙ্গে সেই আমার প্রথম পরিচয়। আড়ালে গিয়ে একা একা বাবার গলার নকল করে "তখন ছিল না ভীষ্ম" কথাটা বলবার চেষ্টা করতাম। এরপর আমরা বাড়ির ভাইবোনেরা মিলে সাহাজান অভিনয় করি। আমি 'জহরৎউন্নিসা হয়েছিলাম। অত ছোটোবেলার (বছর দশ হয়তো হবে) আন্দাজে অভিনয় নাকি আমার খুব ভালো হয়েছিল। "কিন্তু আমি ক্ষমা করি নাই ঘাতক, পৃথিবী শুদ্ধ লোক যদি তোমায় ক্ষমা করে আমি করব না, আমি তোমায় অভিশাপ দিই—ক্রুদ্ধ ফণিনীর উষ্ণ নিশ্বাসে আমি তোমায় অভিশাপ দিই" প্রভৃতি কথাগুলো এত তেজের সঙ্গে বলেছিলাম যে দর্শকরা নাকি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু এর পরে, বড়ো হবার সঙ্গে সঙ্গে আর আমার অভিনয় ভালো হত না। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে একটু বেশি আত্মসচেতন হয়ে উঠেছিলাম বলেই বোধ হয়। খানিকটা আত্মবিস্মৃত ভাব না থাকলে অভিনয় করা যায় না। আর যায় না ভালো বক্তৃতা দেওয়া! বেশি কথা বলতে কোনোদিনও ভালোবাসতাম না; এক মা-বাবার কাছেই শুধু আমার মুখ খুলত, অন্য সব জায়গায় মুখ বুজে থাকতাম। ইংরিজিতে যাকে বলে "ইনট্রোভার্ট—স্বভাবটা ছিল তাই। আমার মা ছিলেন কিন্তু একেবারে অন্য প্রকৃতির; মানুষের সঙ্গে মেলামেশায় তাঁর ছিল পরম আনন্দ। সমস্ত উৎসবে-অনুষ্ঠানে, আনন্দ-সভায় তাঁর যাওয়া চাই। আর সব জায়গায় আমাদের নিয়ে যেতে চাইতেন, না যেতে চাইলে রাগ করতেন। বলতেন, "অন্যের আনন্দে আনন্দ করতে চাস না, এমন স্বভাব হচ্ছে কেন রে?"

নানারকম সামাজিক কাজেও মার আগ্রহ ছিল খুব বেশি। মেয়েদের মধ্যে সমিতি করা—তার মারফত গরিব মেয়েদের লেখাপড়া শেখানো, সেলাই শেখানো—সংসারের সব কাজের উপরেও এ-সব কাজ মার সব সময়েই থাকত—এজন্য কোনোদিন সময়ের অভাব তাঁর হয় নি। দুঃস্থ মেয়েদের জন্য একটি আশ্রমও তিনি গড়ে যান। এই আশ্রমের জন্য কত প্রতিকূলতা, বাধা, আর অভাব যে তাঁকে সইতে হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু কোনো দিনও তাঁকে বিচলিত বা সংকল্পভ্রষ্ট হতে দেখি নি।

বড়ো হয়ে ছুটুদি (শ্রীযুক্তা কল্যাণী ভট্টাচার্য) আর আমি দেশের কাজে নিজেদের যখন জড়ালাম, বাবা বলতেন, "এ-সব বাপু তোমরা মা'র কাছে থেকে শিখেছ। আমি হচ্ছি ভীতু মানুষ, এত সব বড়ো কাজের কথা আমি ভাবতেও পারি না!" আমরা মুখে বলতাম না কিন্তু মনে মনে বলতাম, "কিন্তু মা'র কাজের পিছনে আসল জোর আর সাহস তো ছিলে তুমিই।"

বাবার কাছে আমরা সবচেয়ে বড়ো যে জিনিস পেয়েছিলাম সে হচ্ছে স্নেহের গভীর আতিশয্য আর উদ্বেগ-মেশানো অবাধ স্বাধীনতার ঐশ্বর্য। সে সময়কার সমবয়সী মেয়েদের সঙ্গে নিজেদের তুলনা করে বুঝতে পারতাম আমাদের অবস্থার পার্থক্য কত। মাঝে মাঝে আমার স্বভাবের জিদ খেয়ালিপনাগুলো লক্ষ্য করে কোনো কোনো আত্মীয়

বাবার কাছে এসে অনুযোগ করতেন : "মনুকে আপনি আদর দিয়ে দিয়ে স্পয়েল করে ফেলছেন।" বাবা তাতেও ভয় পেতেন না, বলতেন, "ও-সব বড়ো হলে ঠিক হয়ে যাবে।" স্পয়েল্‌ড্ কতটা হয়েছি জানি না, তবে এটা ঠিক জানি মা-বাবার অতখানি স্নেহ আর আদরের সম্পদ নিয়ে জীবন যদি না আরম্ভ করতাম, জীবনের এই দুর্গম পথে এতদিন ধরে এগিয়ে চলার পাথেয় নিশ্চয়ই আমার থাকত না। বড়ো হয়ে কলেজের একটি মেয়েকে যখন আমাদের কাজের মধ্যে টানতে চেষ্টা করি সে আমাকে বলেছিল, "তোমাদের মুখ দেখলেই মনে হয় তোমরা বাড়িতে মা-বাবার বড়ো আদুরে মানুষ। জীবনে অত পেয়েছ বলেই তোমরা সব-কিছু ছাড়বার জন্য প্রস্তুত হতে পার—কিন্তু আমি যে ভাই কিছুই পাই নি!" কথাটা তার পরে অনেকবার অনেকরকম অবস্থায় আমার মনে পড়েছে : জেলের নির্জন কক্ষে, বাইরের নিরানন্দ কঠিন রাজপথে।

আমাদের বাড়িতে স্বাদেশিকতার প্রথম ঢেউ এসে যখন লাগে তখন আমি খুব ছোটোই। ১৯২১ সালের আন্দোলনে আমাদের বাড়িতে বেশ-একটু সাড়া পড়েছিল। আমাদের মেজোভাই পড়া ছেড়ে দিয়ে সত্যাগ্রহ করে জেলে গেলেন। আমাদের বাড়িতে চরকা ঢুকল, বাবার কিনে দেওয়া চটের চেয়েও মোটা একখানা লাল খদ্দরের শাড়ি দিয়ে আমার প্রথম পদোন্নতি হল ফ্রক থেকে শাড়িতে। তখন থেকেই বাড়িতে প্রায়ই সুভাষবাবুর নাম নিয়ে আলাপ চলত। সুভাষবাবু আই.সি.এস. ছেড়ে দিলেন—ছাড়বার আগে বাবাকে একটা চিঠি লিখে নাকি মত চান, বাবা কী যেন উত্তর দিলেন—দিদিদের মুখে প্রায়ই এ-সব কথা শুনতাম। তিনি বাবার সবচেয়ে প্রিয় ছাত্র ছিলেন। সুভাষবাবুও ছাত্রাবস্থায় বাবাকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন; মা'র বাক্সে দেখতাম তাঁর কাঁচা হাতের লেখা বাবার কাছে উচ্ছ্বাসভরা চিঠি : "আপনার সঙ্গে আমার যা সম্বন্ধ তা এ জীবনে যাবে না। নইলে নিদ্রায় আপনাকেই স্বপ্ন দেখি কেন? জাগ্রতে আপনার মূর্তি ধ্যান করি কেন?"

১৯২১ সালের আন্দোলন কিছুটা কমে আসার পর একদিন রাতে বাবা এসে মা'কে বললেন, "সুভাষের সঙ্গে মিটিংএ দেখা হল। খেতে বলে এসেছি, শিগগির রান্না তৈরি করো।" এর আগে সুভাষবাবুকে দেখেছি কিনা মনে পড়ে না, কাজেই প্রথম দেখার আশার উত্তেজনায় মনে মনে অধীর হয়ে উঠলাম। খেতে যখন বসলেন তখন কিন্তু ঘর থেকে কেউ আমাকে টেনে বার করতে পারে না। পরে অনেক ডাকাডাকিতে বেরিয়ে এলাম। মা হাত ধরে কাছে টেনে নিয়ে বললেন, "সুভাষ, আমার এই ছোটো মেয়েটি যে আবার তোমার মস্ত বড়ো ভক্ত।" এর কিছুদিন পরেই বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সে সুভাষবাবুদের ধরে নিয়ে গেল। তখন স্কুলে পড়ি, বন্ধুদের সঙ্গে প্রায়ই এইসব আলোচনায় আমারই ছিল সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য। বাবার কাছে শোনা গল্প শতখানা করে বন্ধুদের কাছে বলতাম, আর বলতাম, "আমরাও ভাই এইরকম হব।"

সেই সময়কার একটি ঘটনা খুব মনে পড়ে। একদিন শুনলাম আমাদের স্কুলে বড়োলাট-পত্নী আসবেন। তার আগের দিন আমাদের ক্লাস থেকে ডেকে নিয়ে যাওয়া

হল, তাঁকে কীভাবে সংবর্ধনা করা হবে তার রিহার্সাল দেবার জন্য। তিনি যখন আসবেন ডালিতে করে ফুল নিয়ে তাঁর পায়ের কাছে ছড়াতে হবে।

সমস্ত মনটা বিদ্রোহ করে উঠল, কাউকে কিছু না বলে সেখান থেকে চলে এলাম। চুপ করে ক্লাসে গিয়ে বসে রইলাম, অপমানে চোখে জল আসছিল। খানিক পরে দেখি আরো দুটি বন্ধু পালিয়ে ক্লাসে এসে বসল। গভীর উত্তেজনায় তিনজনে মিলে প্রতিজ্ঞা করলাম : "দেশের স্বাধীনতার জন্য আমরা আমাদের জীবন উৎসর্গ করব।" ছেলেবেলার সেই প্রতিজ্ঞা বড়ো হয়েও কতবার যে মনে হয়েছে, দুর্বলতার মুহূর্তে মনে বল দিয়েছে, হৃদয়কে দৃঢ় করেছে।

এরপরে উল্লেখযোগ্য ঘটনা শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' বইখানা হাতে আসা। সে বছর ম্যাট্রিক দেব। পরীক্ষা সামনে, তবু বইখানা বাজেয়াপ্ত হয়ে গেছে জেনে না পড়ে থাকতে পারলাম না। একবার পড়ে কি আর আশ মেটে—কেবলই পড়ি, বারে বারে পড়ি—শেষে বইটা যেন আগাগোড়া মুখস্থ হয়ে গেল। স্কুলে বন্ধুদের সঙ্গেও বইটা নিয়ে কেবলই আলোচনা আর তর্ক।

বাড়িতে বাবাকেও দেখলাম একদিন রাত তিনটে অবধি জেগে বইটা শেষ করলেন। সকালে আমাকে বললেন, "না বাপু, মেয়েদের সহজ বুদ্ধিতে যা হয় তাই ঠিক, ভারতীর মতই ডাক্তারের মতের চেয়ে ভালো।" বাবার সঙ্গে ডাক্তারের পক্ষ নিয়ে তর্ক করতাম, স্কুলে গিয়ে বাবার কাছে শোনা কথা নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে করতাম উলটো তর্ক! ম্যাট্রিক পরীক্ষায় ইংরিজি ফার্স্ট-পেপারে প্রশ্ন ছিল "তোমার অতি প্রিয় উপন্যাসের উপর রচনা লেখো।" লিখে এলাম 'পথের দাবী'র উপর চার পাতা ধরে কাঁচা ইংরিজিতে এক প্রবন্ধ। হিরণদি (প্রধান শিক্ষয়িত্রী) শুনে মাথায় হাত দিয়ে বললেন, "কী কাণ্ড করলে বীণা—বইটা যে প্রসক্রাইব্‌ড! তোমার ফার্স্ট-পেপার একেবারেই বাতিল করে দেবে হয়তো।" তাঁর আশঙ্কা সম্পূর্ণ ঠিক হয় নি। কিন্তু মার্ক-শীটে দেখা গেল সেকেণ্ড পেপারের চেয়ে ফার্স্ট-পেপারে নম্বর অনেক কম। হিরণদির স্নেহমাখা মুখখানি আর-একবার ম্লান হয়ে গেল, "দেখলে তো, বলেছিলাম না? এই রচনার জন্যই এমনি হল।" এর পর কলেজে উঠে মস্ত বড়ো লাইব্রেরি হাতে পেলাম। নানারকম ইতিহাস আর ইংরিজি উপন্যাস পড়া আরম্ভ করলাম। এ ছাড়া ক্লাসের কোনো কোনো মেয়ে নিয়ে আসত বাইরের লাইব্রেরি থেকে 'নির্বাসিতের আত্মকথা', 'কারাকাহিনী', 'বাংলায় বিপ্লববাদ' প্রভৃতি বই। কলেজের পিছনের দিকের দালানে বসে সবাই মিলে বইগুলি পড়তাম আর ভাবতাম : "এমনি জীবন আমাদের হয় না কেন!"

সুভাষবাবুরা এই সময় বেরিয়ে এসেছেন। ১৯২৮ সালের সাইমন কমিশন বয়কটের ধুম লেগে গেছে। বন্ধুরা সকলে মিলে বেথুন স্কুল-কলেজে হরতাল করবার জন্য উঠে পড়ে লাগলাম। সব ক্লাসে গিয়ে মেয়েদের বলছি, বোর্ডে লিখে রেখে আসছি। হরতাল খুব ভালোভাবেই হল, গভর্ণমেন্ট স্কুল-কলেজে এ ব্যাপার এই প্রথম। ডে-স্কলার ছাত্রীদের প্রিন্সিপ্যাল কিছু বললেন না, কিন্তু বোর্ডিঙের মেয়েদের বললেন, "অ্যাপোলজি

চাইতে হবে, না হলে বোর্ডিং ছেড়ে চলে যাও।" কোনো কোনো মেয়ে চলে গেল, যাদের বাড়ি বহু দূরে, তারা কী করবে ভেবে পেল না, আমাদের খবর পাঠাল। কলেজ বন্ধ হয়ে রইল। কী করা যায় ভেবে পাই না, সারাক্ষণ পরামর্শ আর গবেষণা চলছে।

বাবা আমাদের অবস্থা দেখে সুভাষবাবুকে ডেকে পাঠালেন। তিনি আসতেই আমরা সবাই মিলে তাঁকে ঘিরে ধরে জিজ্ঞাসা করলাম, "কী করব?"

আমাদের সমস্ত উত্তেজনা কৌতুকহাস্যে লঘু করে দিয়ে তিনি বললেন, "কলেজ ছেড়েই দিন-না।"

বললাম, "আপনারা যদি পড়ান তো এক্ষুনি ছাড়তে রাজী আছি।" তিনি হেসে বললেন, "আমরা জেলে যাব, না মাস্টারি করব?"

শেষ অবধি অবিশ্যি কলেজ ছাড়তে হল না। প্রিন্সিপ্যালকেই হার স্বীকার করতে হল। মেয়েরা কেউ ক্ষমা চাইল না, কলেজও উঠল না। কিন্তু প্রিন্সিপ্যাল নিজে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে চলে গেলেন। যাবার সময় আমাদের ডেকে বিদায় নিলেন, চোখে তাঁর জল। মাঠে ঘাসের উপরই বসে পড়লেন, বললেন, "না, চেয়ার চাই না। আমি তো আর তোমাদের প্রিন্সিপ্যাল নই।" এই জেদী দুর্ধর্ষ ইংরেজ মহিলাটিকে কোনোদিনই আমরা আপন ভাবি নি। তবু বিদায়ের মুহূর্তে মনটা সকলেরই ভারী হয়ে উঠল।

আমাদের বিজয়লাভে সমস্ত ছাত্রসমাজে সাড়া পড়ে গেল। অ্যালবার্ট হলে বিরাট সভা ডেকে আমাদের আর প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রদের (ওখানেও ঠিক অনুরূপ ঘটনা ঘটেছিল) অভিনন্দিত করা হল। সরলা দেবী চৌধুরাণী বক্তৃতায় বললেন, "আজ আমার স্থান এখানে নয়—ওই ছাত্রীদের পাশে। আমার সবচেয়ে বড়ো গর্ব আমিও ওই কলেজেরই ছাত্রী।"

এর পরেই বাঙলাদেশে ছাত্র-আন্দোলন প্রথম দানা বেঁধে ওঠে। সেই সময়কার "নিখিল বঙ্গ ছাত্র প্রতিষ্ঠান"ই বোধ হয় বাঙলার ছাত্রদের সংঘবদ্ধ হওয়ার প্রথম সার্থক প্রচেষ্টা। আমার দিদির (শ্রীযুক্তা কল্যাণী ভট্টাচার্য) ও তাঁর বন্ধুদের চেষ্টায় ছাত্রীসংঘও ক্রমে গঠিত হল এবং মেয়েরা তার মারফত নানারকম কাজে যোগ দেবার সুযোগ পেল এই প্রথম।

এই সময় আর-একদিন সুভাষবাবু এমনিই আমাদের বাড়ি বেড়াতে এসেছিলেন। পাশের ঘর থেকে শুনলাম মা বললেন, "ওমা, আমার কী ভাগ্য!"

সেদিন সুভাষবাবু অনেকক্ষণ আমাদের সঙ্গে গল্প করলেন। হঠাৎ প্রশ্ন করলাম, "আচ্ছা, আপনার কী মনে হয়, কীভাবে দেশ স্বাধীন হবে—হিংসার পথে না অহিংসার পথে?"

সুভাষবাবু খানিকটা চুপ করে রইলেন, তার পর বললেন, "আসল কথা হচ্ছে একটা কিছু পাবার জন্য আগে পাগল হয়ে উঠতে হয়। স্বাধীনতার জন্য আমাদেরও সারা দেশটাকে তেমনি পাগল করে তুলতে হবে। তখন হিংসা-অহিংসার প্রশ্ন বড়ো হয়ে উঠবে না।"

সোজা উত্তর তিনি এড়িয়ে গেলেন বটে, কিন্তু আমি তো এই প্রশ্নের এর চেয়ে ভালো উত্তর আজ অবধি আর কারো কাছ থেকে পাই নি। কিছুদিন পর ডিসেম্বর মাসে ১৯২৮ সালের কলিকাতার কংগ্রেস। আমরা সবাই দলে দলে স্বেচ্ছাসেবিকার দলে নাম লেখালাম। সুভাষবাবু আমাদের জি. ও. সি.; লতিকাদি (শ্রীযুক্তা লতিকা ঘোষ) মেয়েদের বিভাগের ভার নিলেন। আমার দিদিদের দলের মেয়েরা নানারকম অফিসার হলেন।

ভোরবেলা বাস এসে আমাদের নিয়ে যেত। বাড়ি ফিরতাম কোনোদিন রাত বারোটা, কোনোদিন একটা। আমাদের ট্রেনিং বেশিরভাগ ছেলেরাই দিতেন। আমার মনের ভুল কিনা জানি না, কিন্তু আজ প্রায় কুড়ি বছর ধরে কত স্বেচ্ছাসেবক দল দেখলাম, এই সেদিন নেতাজীর জন্মদিনে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর বিরাট শোভাযাত্রাও দেখেছি; কিন্তু ১৯২৮ সালের সেই দলকে শৃঙ্খলায়, গাম্ভীর্যে, উৎসাহে আর কেউই যেন অতিক্রম করতে পারল না। তখনকার লোকগুলিই যেন কেমন অন্যরকম ছিল। প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ের চোখেমুখে কী অদ্ভুত দীপ্তি আর দৃঢ়তা! আসল যুদ্ধও লোকে এত নিষ্ঠার সঙ্গে করে কি না সন্দেহ। শুধু মাঝে মাঝে আমাদের ক্ষোভ হত আমাদের অস্ত্রশস্ত্র নেই কেন? সকলে মিলে কেবলই বলাবলি করতাম, "কী ভালোই না হত তা হলে! একবার কল্পনা করো—সুভাষবাবু আমাদের জি.ও.সি. আর আমরা সৈন্যবাহিনীরা চলেছি ইংরেজের সঙ্গে সত্যিকারের লড়াই করতে।"

পরে নেতাজীর আজাদ-হিন্দ-বাহিনীর মধ্যে আমাদের সেদিনের সেই রোম্যান্টিক স্বপ্ন সফল হয়েছিল, কিন্তু আমরা তো সেদিন কাছে ছিলাম না!

আমাদের এই উত্তেজনা নিয়ে আত্মীয়েরা কেউ কেউ পরিহাস করতেন : কী, ঢাল নেই, তলোয়ার নেই, তোমাদের লড়াইটা ঠিক জমবে তো? কিন্তু তোমাদের "নেপোলিয়ান" ঘোড়ায় চড়েন না কেন? শোভাযাত্রায় সেদিন মোটরে চড়ে গেলেন কেন বলো তো?

এই পরিহাসের উত্তর অবিশ্যি পরে দেওয়া গিয়েছিল। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের প্রায় প্রত্যেকটি বীরই ছিলেন আমাদের এই ১৯২৮ সালের কংগ্রেসেরই স্বেচ্ছাসেবক।

কংগ্রেসের অধিবেশন শেষ হয়ে যাবার পর ক্লাসের একটি মেয়ে সুহাসিনী আমাকে একদিন আড়ালে ডেকে বলল, "মনু, তুমি কি এমনি হুজুক করেই দিন কাটাবে? "সত্যিকারের কিছু করবে না?"

"সত্যিকারের করা কাকে বল?"

"যাতে সত্যিই আমরা স্বাধীন হতে পারি। এ-সব তো তুমি যা করছ ছেলেখেলা।"

তখন থেকে কলেজ ছুটির পর, অফ্ পিরিয়ডে, ক্লাস পালিয়ে, কেবলই চলত আমাদের অতি গোপন আলোচনা। ক্রমে ক্রমে কলেজ পালানোও শুরু হল। "সত্যিকারের কাজের" নেশা অন্য সব-কিছু ভুলিয়ে দিল।

আমাদের সে সময়ের কাজ সম্বন্ধে অনেকেরই মনে যেমন কৌতূহলের অন্ত নেই, তেমনি যে-সব ধারণা রয়েছে তার বেশিরভাগই শুধু অস্পষ্ট নয়, ভুল। যুগ বদলেছে, কাজের ধারায় ঘটেছে আমূল পরিবর্তন; কাজেই আজকের মন নিয়ে, আজকের অবস্থায় দাঁড়িয়ে, সেদিনকার মন বা অবস্থাকে বুঝতে পারা সহজ নয়—বোঝানোও বোধ হয় আরো দুঃসাধ্য ব্যাপার। তবু আমরা যারা সে যুগের মানুষ আজও রয়ে গেছি, যাদের একই জীবনে দুটি বিভিন্ন যুগের কর্মধারা একের পর এক বয়ে চলেছে— আমরাই বোধ হয় সবচেয়ে ভালো পারব সেইদিনগুলোর মনের কথা আজকের দিনের মধ্যে পৌঁছে দিতে। অন্তত এ ব্যাপারে আমাদের একটা দায়িত্ব রয়ে গেছে অনুভব করি। আমাদের সেদিনের যুগকে লোকে কত যে ভুল বোঝে এই সেদিনও তার পরিচয় পেলাম। "অভ্যুদয়" গীতিনাট্যে একটি গানের মধ্যে সেদিনের ভাবকে ভাষা দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। সে গানের প্রথম লাইনটা "ক্ষমা করো যদি হিংসার বদলে প্রতিহিংসা জাগে মনে" গোছের। গানটা শুনেই মনে হল : "প্রতিহিংসা" কথাটা ও জায়গায় একেবারেই অপ্রযোজ্য। ওই কথাটার মধ্যে সেদিনকার মনোভাব বিন্দুমাত্রও যেন ধরা পড়ে না। প্রতিহিংসা কথাটার মধ্যে আছে একটা সাময়িক উত্তেজনার আভাস—একটা উদ্দেশ্যহীন এবং কতকটা যেন ব্যক্তিগত প্রবৃত্তির চরিতার্থতা—ওতে শুধু ধ্বংস আর উষ্মারই প্রকাশ।

সেদিনকার অগ্নিযুগ—তার রক্তমাখা ইতিহাস কিন্তু এর চেয়ে অনেক বড়ো, অনেক গভীরতর পটভূমিকায় রচিত হয়েছিল। প্রথমত এবং প্রধানত যে মনোভাব সেদিন দেশের তরুণকে পাগল করে তুলেছিল সে হচ্ছে স্বাধীনতার জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা। ছেলেবেলা থেকেই স্কুল-কলেজে দেশবিদেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস—আর ইংরিজি সাহিত্যে স্বাধীনতার সুর তরুণ-তরুণীর মনকে চঞ্চল করে তুলত। এরই সঙ্গে রঙ্গলালের—

> স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে,

রবীন্দ্রনাথের—

> শিকল দেবীর ওই যে পূজাবেদী,
> চিরকাল কি রইবে খাড়া,
> পাগলামি! তুই আয় রে দুয়ার ভেদি,
> ভুলগুলো সব আন রে বাছাবাছা,

নজরুলের—

> ওই গঙ্গায় ডুবিয়াছে হায় বাঙালীর দিবাকর,
> উদিবে সে রবি আমাদের খুনে রাঙিয়া পুনর্বার,

প্রভৃতি গান বাঙলার তরুণের রক্তে তখন আগুন ধরিয়ে দিত। আকণ্ঠ মুক্তির পিপাসা, বীর্যের মহান মূল্য দিয়ে হারানো স্বাধীনতাকে ফিরিয়ে আনার দুর্দম আকাঙ্ক্ষা অন্তরের অন্য সমস্ত আকাঙ্ক্ষাকেই ডুবিয়ে দিত।

তারপর বয়েসে বড়ো হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করতে শিখল পরাধীনতা কী, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শোষণনীতির কী নিখুঁত লীলা! উপলব্ধি করল একটা বিদেশী শক্তি সমস্ত জাতটাকে ধীরে ধীরে কেমন অমানুষ করে তুলছে। দেশ-জোড়া অভাব, দারিদ্র্য, অশিক্ষা—আর ভীরুতা। একটা প্রতিবাদ করবার কারো সাহস নেই, প্রতিবিধান তো দূরের কথা। নিজের চোখে দেখল, চল্লিশ কোটি ভারতবাসীর প্রতি পদক্ষেপের 'উপায়বিহীন অক্ষমতা'। দেখল কেমন করে ভারতীয় সৈন্য পাঠিয়ে চীনের বিদ্রোহ দমন করা হয়। শুনল জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের কথা। জানল দেশেরই ভাতে কেমন করে বিদেশী কুকুরের পেট ভরে—দেশের লোক ক্ষুধায় ছটফট করে। একদিকে বিজাতীয় শাসনের শোষণদণ্ড সমস্ত জাতটার যা-কিছু সম্বল, যা-কিছু প্রাণশক্তি নিঃশেষে অপহরণ করে নিচ্ছে; অপর দিকে চল্লিশ কোটি অসহায় নরনারী—অশিক্ষায় চোখ তাদের অন্ধ, বেদনায় কণ্ঠ তাদের মূক, নিষ্পেষণে মেরুদণ্ড তাদের ভাঙা। মনে বারে বারে জেগে ওঠে—'পথের দাবী'র—"যারা সমস্ত দেশে মানুষ বলে একটি প্রাণীও বাকি রাখে নি তাদের তোরা ক্ষমা করিস না।" কিন্তু, শুধু তো ক্ষমা করা নয়—করার কথা নয়—জাতটাকে ব্রিটিশ দুঃশাসনের নাগপাশ থেকে মুক্তি দিতে হবে। কিন্তু কী তার উপায়? নিরস্ত্র জাতের হাতে অস্ত্র কোথায় যে আঘাত হানবে অত্যাচারীর উপর? কোথায় সে সাহস যে রুখে দাঁড়াবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে?

ঘোর নৈরাশ্যের অন্ধকারের মধ্যে বাঙলার যুবক সেদিন সেই প্রশ্নের উত্তর নিয়ে এগিয়ে এল। হাতে তার মারণ অস্ত্র, চোখে বিদ্রোহের আগুন, মুখে মরণজয়ী অট্টহাস্য। তার আকস্মিক অস্ত্রাঘাতে অত্যাচারীর রথ-চক্র ক্ষণেকের জন্য থমকে দাঁড়াল—"এও সম্ভব?" দেশের লাঞ্ছনাপীড়িত নরনারী তাদের ভয়-বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখল; তাদেরও বিস্মিত অন্তরে প্রশ্ন জেগে উঠল—"এও সম্ভব? বাঙলার যুবকের অস্ত্রাঘাতে সেদিন ব্রিটিশসাম্রাজ্য চুরমার হয়ে ভেঙে পড়ে নি সত্যি, কিন্তু অত্যাচারী তার অত্যাচার সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছিল। মনে মনে সে হয়ে উঠেছিল ভীত আর সন্ত্রস্ত।

তাদের সেই অভিযান কোনো ব্যক্তিবিশেষের বিরুদ্ধে ছিল না। তারা জানত দু-চারজন ইংরেজ রাজকর্মচারীর অপসারণে ব্রিটিশ রাজশক্তি পরাভূত হবে না। তবু তাদের কয়েকজনকে তারা আঘাত করেছিল, কারণ সেই ব্যক্তিরা ছিল ব্রিটিশসাম্রাজ্যের প্রতীক-স্তম্ভ, তাদেরই উপর ভর করে দাঁড়িয়ে ছিল অতবড়ো সাম্রাজ্য। তাদের আঘাত করলে সে আঘাত সেই সাম্রাজ্যের গায়ে গিয়েই লাগবে।

এই রাজকর্মচারীদের ধারণা ছিল কালা আদমিরা চিরদিনই শ্বেতাঙ্গের পায়ের নিচে পড়ে সবরকম অত্যাচার নীরবে হজম করে যাবার জন্যই জন্মেছে—এইটাই যেন তাদের জন্মগত ধর্ম—অস্ত্রাঘাতে সেই ধারণার চিরদিনের জন্য অবসান হল। অন্যদিকে উপায়বিহীন কাপুরুষতা আর ভীরু আত্মাবমাননার যে অটল পাথর জাতির বুকে চেপে বসে ছিল, সেটা বুক থেকে নামিয়ে ফেলে গোটা জাতটাই যেন সোজা হয়ে দাঁড়াল—অন্ধকারের বুক চিরে আত্মবিশ্বাসের ক্ষীণরেখা ফুটে উঠল তাদের মুখে।

এর চেয়ে বেশি-কিছু সেদিনের কর্মীরা করতে চায় নি। তারা জানত স্বাধীনতা তখনও বহুদুরে। জানত আরও বহুদিনের দুঃসহ তপস্যার প্রয়োজন হবে এই একাধিক শতাব্দীর পরাধীনতা ঘোচাতে। তাদের চেয়ে কেউ বেশি জানত না যে তাদের অপটু হাতের দুর্বল অস্ত্রের চেয়ে অনেক, অনেক সহস্রগুণ বেশি শক্তিতে শক্তিমান তাদের প্রতিপক্ষ—একটা বিরাট সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে মুষ্টিমেয় ক'টি যুবক দাঁড়িয়ে তারা অসাধ্য সাধন করতেই গিয়েছে। অবিশ্যি এও তারা জানত যে তাদের আদর্শ ব্যর্থ হবার নয়—স্বেচ্ছায় হাসিমুখে ফাঁসির দড়ি গলায় জড়িয়ে তারা মৃত্যুভীত জাতিকে মরতে শিখিয়ে যাবে, এতদিন যারা বিনা প্রতিবাদে সব-কিছু সহ্য করে এসেছে তাদের কণ্ঠে দিয়ে যাবে প্রতিবাদের সাহস। তারা জানত আজ যে প্রতিরোধ মাত্র মুষ্টিমেয় ক'টি মানুষের মধ্যে আবদ্ধ রইল, একদিন তা-ই ছড়িয়ে পড়বে গ্রামে-গ্রামে, নগরে-নগরে, কোটি কোটি মানুষের মধ্যে। তাদের কল্পনায় শুধু ছিল ভবিষ্যতের ছবি, তাদের ধ্যাননেত্রে ফুটে উঠেছিল "আজাদ-হিন্দ ফৌজের" সগৌরব অভিযানের মতো অনেক স্বপ্ন; ১৯৪২ সালের ভারত-জোড়া গণবিপ্লবের অভ্যুত্থানের অস্ফুট আভাস।

তারা ছিল 'ড্রিমারস্ অব ড্রিমস্"। অনাগত যুগকে এগিয়ে আনার অগ্রদূত মাত্র।

ইতিহাস লেখার সময় এটা নয়; ঐতিহাসিকের নিরপেক্ষ, নিরাসক্ত বিচারশক্তি আমাদের পক্ষে দাবি করাও অসম্ভব। তবু মনে হয়—যাঁরা দেশের এই অগ্নিযুগকে কোনো মূল্যই দিতে চান না, মনে করেন এটা আমাদের জাতির স্বাধীনতার আন্দোলনের মধ্যে একটা প্রক্ষিপ্ত অধ্যায় মাত্র, যেটা না হলেও চলত এবং শুধু কয়েকটি অর্বাচীন উন্মাদ তরুণের ক্ষ্যাপামি মাত্র—তাদের ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির একান্ত অভাব।

আমাদের মুক্তির ইতিহাসে মহাত্মাজীর দানকে ছোটো করে দেখার নির্বুদ্ধিতা আমার নেই, তাঁর অসহযোগ অস্ত্রের উপযোগিতা এই নিরস্ত্র দেশে দাঁড়িয়ে অস্বীকার করবে কে? তবু বলতে চাই ১৯০৮ সাল থেকে সেই ক্ষ্যাপা তরুণের দল যদি জাতির হৃদয়কে এমনি করে মৃত্যুবরণের জন্য, দুঃখবরণের জন্য, ঘুম ভাঙিয়ে প্রস্তুত না করে যেত, মহাত্মাজীর অসহযোগ-অস্ত্র ধারণ করবার মতো শক্তি দেশের লোকের হত কি না সন্দেহ। যাঁরা বলেন, ভারতবর্ষের পক্ষে গান্ধীজিই সবদিক দিয়ে যোগ্যতম নেতা, তাঁদের সঙ্গে তর্ক করবার ধৃষ্টতা আমার নেই। কিন্তু ভারতবর্ষের মুক্তির ইতিহাসে শুধু তাঁর নাম ও তাঁর কাজ লেখা থাকলেই সে ইতিহাস সম্পূর্ণ হবে না। সেখানে থাকতে হবে বাঘা যতীনের কথা, থাকবে চট্টগ্রাম-অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের গৌরবময় অধ্যায়, নেতাজীর ইম্ফল-অভিযানের কাহিনী। বাদ পড়বে না মেদিনীপুর, বালুরঘাট, সাতারা, বালিয়ার জাতীয় সরকার গঠনের ইতিহাস; স্বকীয় অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার জন্য পুলিশের গুলির মুখে দরিদ্র মজদুর-কিষাণের অবিচল দাঁড়িয়ে থাকার কথা।

সেদিনের যুবকদের আত্মবলিদান যে কত গভীর ভাবে জাতির মনকে নাড়া দিয়েছিল, তার একটা প্রমাণ সুদূর অজ পাড়াগাঁয়েও তাদের ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে-পড়া নাম, তাদের সম্বন্ধে নানারকম প্রবাদ কাহিনী।

শোনা যায় গ্রামের চাষী ধান কাটতে কাটতে গান গাইছে—

বিদায় দে মা ফিরে আসি,
চিনতে যদি না পারিস মা
দেখবি গলার ফাঁসি
বড়লাটকে মারব বলে মারলেম ভারতবাসী॥
অভিরামের দ্বীপান্তর আর ক্ষুদিরামের ফাঁসি
ফিরে আসি।

সেদিনকার ছেলেমেয়েরা যেন ছিল অন্য ধাতু দিয়ে গড়া। কোনো দুঃখ, কোনো ক্লেশ, কিছুই তাদের গায়ে লাগত না। আদর্শের জন্য নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দেওয়ার এমন আশ্চর্য নিদর্শন আমার মনে হয়, পৃথিবীর যে-কোনো দেশেই বিরল। সে সময়কার ছেলেমেয়েদের কী অমানুষিক পরিশ্রমই না করতে দেখেছি—দিনের পর দিন সময়ে নাওয়া নেই, খাওয়া নেই, মাথা রাখবার একটু জায়গা অবধি অনেক সময় জুটত না; না ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে চোখ দুটো জবাফুলের মতো লাল হয়ে উঠেছে—মুখে তবু সেই অদ্ভুত হাসি, দৃষ্টিতে তবু সেই অদ্ভুত প্রতিজ্ঞা।

একটি মেয়েকে দেখেছি রোজ বালিগঞ্জ থেকে শেয়ালদা দুবেলা হেঁটে যাওয়া-আসা করতে, জেনেছি ওই পয়সা ক'টিও সে সাশ্রয় করছে দলের কাজের জন্য। এদের দেখে মনে হত না জীবনের অন্য কোনো অনুভূতি, আকাঙ্ক্ষা বা চেতনা এদের আছে। ভালো ছাত্র বলে যাদের জানতাম, পাঠ্যবইয়ের পাতা তাদের পোকায় খেত—সময় কোথায় যে পরীক্ষা দিয়ে সোনার মেডেল নিয়ে তারা বাড়ি আসবে! জীবনের বৃহত্তর পরীক্ষায় তাদের ডাক পৌঁছে গিয়েছে। কোনো কোনো ছেলেকে জানতাম যারা গরিব মা-বাবার একমাত্র নির্ভর। মা-বাবা প্রায় সর্বস্বান্ত হয়ে ছেলেকে লেখাপড়া শেখাচ্ছেন, ছেলে মানুষ হয়ে তাঁদের খাওয়াবে, ছোটো ভাইবোনদের মানুষ করবে। তাঁদের সেই "অন্ধের নড়ি" কিন্তু অনায়াসে দুর্গম পথের অভিযানে পা বাড়িয়ে দিল—তার বেঁচে থাকা আর মরে যাওয়ার মধ্যে ব্যবধান হয়তো একটি চুলের চেয়েও সূক্ষ্ম!

এক-এক সময় বিচলিত হয়ে এদের কাউকে প্রশ্ন করে বসতাম, "তুমি চলে গেলে তোমার মা-বাবার কী অবস্থা হবে ভেবে দেখেছ?"

"কী আর হবে? এই হতভাগা দেশের ঘরে ঘরে হাজার হাজার মা-বাবার যা অবস্থা তাই-ই হবে। আজকের দিনে ক'জন ছেলে তার মা-বাবাকে খাওয়াতে পারে—তার খবর রাখো? তা ছাড়া শুধু নিজের মা-বাবার কথা ভাবলে তো আজ চলবে না। সমস্ত জাতিকে যে আমরা টেনে তুলতে চাই—আমাদের মরতে হবে যাতে জাতি প্রাণলাভ করে।" অনেক ছেলেমেয়ের আবার বাড়িতে লাঞ্ছনার অবধি ছিল না। বাড়ির লোকেদের দোষ দেওয়া যায় না। এমন উচ্ছৃঙ্খল, অবাধ্য, লক্ষ্মীছাড়া ছেলেমেয়েদের অত্যাচার সহ্য করবেই বা মানুষ কতদিন। প্রায়ই বাড়িতে ভাত জোটে না, প্রায়ই বাড়ি থেকে বার করে দেয়। এ ছাড়া অহর্নিশি পুলিসের চোখ এড়িয়ে বেড়ানোও এক দুঃসাধ্য ব্যাপার।

সে সময় বোধ হয় বাঙলার প্রায় প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ের পিছনেই ছিল একটি করে স্পাই। যতদিন তারা বেঁচে থাকত, এমন করে দেহমনের অশেষ নির্যাতনের মধ্যে দিয়ে তাদের কাজের আয়োজন করে চলতে হত। তার পর একদিন হয় পুলিশের জাল তাকে ছেঁকে তুলে নিয়ে যেত 'ইলিসিয়াম রো'র নরককুণ্ডে, নয় একটি দুঃসাহসিক ঘটনায় তার জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটত। সেই ঘটনার লাল মশালে আকাশ যখন রাঙা হয়ে উঠত, সবাই তার দিকে বিস্ময়ে ফিরে তাকাত : "আহা কাদের সোনার ছেলে গো?"

মৃত্যু তাদের ব্যর্থ হত না। মুখে দেশের লোক যাই বলুক, তাদের অন্তরের অন্তরতম স্থানে জাগত গভীর বেদনার স্পন্দন। এদের এই অভিনব মরণ-বরণ দেশের প্রতিদিনের গতানুগতিক জীবনের মধ্যে নিয়ে আসত তীব্র বিক্ষোভের আলোড়ন। মানুষের দৃষ্টি ক্ষুদ্র স্বার্থের গণ্ডি ছাড়িয়ে গিয়ে পড়ত দেশ-জোড়া অবিচারের দিকে। সুখীর সুখ-নিদ্রা ব্যাহত হয়ে উঠত, দুঃখীর কণ্টকশয্যা আরো কণ্টকাকীর্ণ হয়ে উঠত। দেশের সমস্ত আবহাওয়া সকরুণ হয়ে উঠত বৈরাগ্যের অশ্রুসজল ভৈরবী সুরে—

> রাজা জাগি ভাবে বৃথা রাজ্যধন
> গৃহী ভাবে মিছা তুচ্ছ আয়োজন
> অশ্রু অকারণে করে বিসর্জন
> বালিকা।

৪

গুপ্ত দলে যোগ দেবার পর থেকে জীবনের ধারা ক্রমে ক্রমে বদলে এল। "বাইরে এত মার্কামারা স্বদেশী হলে মুশকিল হবে হে। তোমার এ-সব খদ্দর টদ্দর কমিয়ে ফেলো। বাইরে দেখে কেউ বুঝলে চলবে না।" কাজেই বাইরের হৈ-হৈ আমার কমে গেল। বেথুন কলেজ বদলে ডায়োসেসানে চলে এলাম। এখন আর হরতাল হলেও যোগ দিই না, শোভাযাত্রায় আমায় ওরা খুঁজে পায় না, সভা-সমিতিতে যাবার উৎসাহ নেই। শুধু যখন-তখন বাইরে যাই, রোদে ঘুরে মুখ কালো করে বাড়ি ফিরে আসি।

প্রথম যেদিন বাড়িতে লুকিয়ে একজনের সঙ্গে দেখা করতে নিয়ে গেল, সুহাসিনী রাস্তায় আমাকে বলল, "জানো, আমি ওদের বলেছিলাম তোমাকে কিছুতেই আনতে পারব না। খুব একটা অহংকার ছিল আমার মনে মনে।"

"অহংকার ছিল?"

"হ্যাঁ ভাই, একদিকে যেমন চাইতাম, তুমি আমাদের সঙ্গে কাজ কর, অন্য দিকে তুমি যে কিছুতেই মিথ্যা কথা বল না, লুকিয়ে কিছু কর না, এ নিয়ে মনে আমার বেশ-একটু অহংকার ছিল, ওদের তাই বলতামও।"

কথাটা শুনে মনটা খারাপ হয়ে পড়ল, অন্যমনস্ক হয়ে গেলাম। মিথ্যে কথা

বলা—বিশেষ করে মা-বাবার কাছে—সত্যিই আমার পক্ষে খুব সহজ ছিল না। আরও ছোটোবেলায় ছটুদি অনেকবার আমায় বলেছে, "তুই মিথ্যে বলতে যাস কেন? তোর মুখ দেখেই সবটা ধরা পড়ে যায়।" কিন্তু এখন যে উপায়ও নেই। দেশের মুক্তি আহরণের দুর্গমতম পথে ওরা পা বাড়িয়েছে, নিজেদের জীবন-পণ করছে, ওদের রক্ত দিয়ে ধুয়ে দিয়ে যাচ্ছে দেশের বহুদিনের সঞ্চিত যত কালিমা—সে পথে আমি ওদের সঙ্গে থাকব না, আমি পিছিয়ে থাকব, এইটাই বা কেমন করে হবে! ওদের সঙ্গে থাকতে যে আমাকে হবেই। নিজে তো রইলাম। সব সময় চেষ্টা করতাম যাতে অন্য মেয়েদেরও সঙ্গে আনতে পারি। লোক, অর্থ আর অস্ত্রশস্ত্র—ইংরেজের বিরুদ্ধে আমাদের সশস্ত্র বিদ্রোহ-প্রচেষ্টায় এই উপকরণগুলি যে-কোনোভাবে সংগ্রহ করাই আমাদের প্রধানতম কাজ—দলের উপদেষ্টারা জানিয়ে দিলেন।

অস্ত্রশস্ত্র জোগাড় করা তত সহজ নয়। আপাতত ওটা বাদ দিয়ে লোক আর অর্থ—এই দুটোর দিকেই মন দিলাম। কলেজে যাকেই একটু ভালো লাগত, মনে হত চরিত্রে কিছুটা বৈশিষ্ট্য আছে, তার সঙ্গেই ভাব করতে চেষ্টা করতাম। তার পর আস্তে আস্তে বলতে আরম্ভ করতাম আমাদের আদর্শের কথা, পথের কথা : কেউ সাড়া দিত, কেউ বা ও-সবের আভাস পেয়েই নিজেকে সরিয়ে নিত। প্রথম ধাক্কা পেলাম আমার ছোটোবেলার নাম-পাতানো বন্ধু "চোখের জলের" কাছে। চোখের জল আমার ছাত্রজীবনের সবচেয়ে বড়ো বন্ধু, ওর সঙ্গে আমার মনের মিল ছিল অদ্ভুত ধরনের, ভালোও বাসতাম খুব। এইসব কাজের প্রতি ওর বরাবরই অনেকখানি শ্রদ্ধা আর অনুরাগ আছে জানতাম। প্রথম একদিন ওকেও ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে দলের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে পরিচয় করাতে নিয়ে গেলাম। ফেরবার পথে জিজ্ঞাসা করলাম, "কেমন লাগল?"

বলল, "খুব ভালো। মনে হল 'পাষাণ দেবতা'।"

বুঝলাম ওর কবিপ্রকৃতিতে গভীরভাবেই নাড়া লেগেছে। কিন্তু কিছুদিন পরে ক্রমেই ও কেমন যেন গম্ভীর হয়ে পড়ল, কেমন যেন অন্যমনস্ক। শেষে একদিন আমাকে খোলাখুলিই বললে, "চোখের জল, তোমাদের সঙ্গে শেষ অবধি বোধ হয় আমি যেতে পারব না ভাই। অত কঠিন পথে চলার যোগ্য আমি নই।"

এর সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়ে যাবার দুঃখ যত বড়োই হোক, সেদিন আমার মনে হয়েছিল, ও ঠিক বলেছে, ওর জীবনের সার্থকতা অন্য পথ বেয়েই নেমে আসবে। কবির কথার প্রতিধ্বনি করে ওকে সেদিন চিঠিতে লিখেছিলাম, "তোমার জীবনে তোমার জীবন-দেবতার যা ইচ্ছা তাই-ই পূর্ণ হয়ে উঠুক—আমার ইচ্ছা লজ্জিত হয়ে ফিরে যাক।" আমার সঙ্গে ওর বন্ধুত্ব অবশ্য কমল না। শুধু একদিন একটা গল্প ওকে করতে গিয়ে মাঝখানে থেমে গিয়ে বললাম, "থাক্, আর বলব না।"

ও বুঝতে পেরে ম্লান হেসে বলেছিল, "পর হয়ে গেছি আমি তাই—না?"

আমার সঙ্গীদের মধ্যে শান্তিকে (দাশগুপ্ত) খুবই সম্ভ্রমের চোখে দেখতাম। ও আমার

অনেক আগেই এ-সব কাজের মধ্যে ছিল। ওর প্রকৃতি ছিল আমার বিপরীত। অত্যন্ত স্পষ্টভাষী, গম্ভীর, প্রখর বুদ্ধিমতী। আমার কতকটা উচ্ছ্বাসপ্রিয়, অতিরিক্ত ভাবপ্রবণ প্রকৃতির জন্য ওর কাছে সব সময় কেমন যেন নিজেকে ছোটো ছোটো লাগত, ভাবতাম, 'ওর মতো কেন আমি হতে পারি না?'

শান্তিদের বাড়িশুদ্ধ সবকটি ভাইবোন এই কাজের মধ্যে ছিল। শান্তির ছোটো বোন নীনা—বয়সে আমাদের চেয়ে ছোটো—কিন্তু ওর তেজোদৃপ্ত ভাব আর দুঃসাহসিকতার জন্য মনে মনে আমরা সকলেই ওকে এ-সব কাজে আমাদের চাইতে অনেক উঁচুতে স্থান দিতাম। সবচেয়ে শক্ত সব কাজেই ওকে সামনে ঠেলে দেওয়া হত। ওর মধ্যে অনেক কিছু বড়ো সম্ভাবনা লুকোনো ছিল, শেষ পর্যন্ত হল না কিছুই। জেলের ভিতর করালব্যাধির আক্রমণে ওর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ল—মাত্র একুশ বছর বয়েসেই জীবনের উপর নেমে এলো মৃত্যুর যবনিকা।

নতুন মেয়ে যাদের দলে টানতে চাইতাম তার মধ্যে আইরিনিকে মনে পড়ে। আইরিনি খাঁ—ডায়োসেসানে সেকেন্ড ইয়ারে পড়ত। মেয়েটিকে কলেজে সবাই পছন্দ করত—যেমন সহজ, তেমনি সাহসী আর নির্ভীক। কলেজে, বোর্ডিঙে মেয়েদের অনেকরকম ছোটোখাটো সাহসের পরীক্ষা প্রায়ই দিতে হয়। সে সবগুলোতেই আইরিনি পুরো নম্বর পেয়ে পাস করে যেত। আমার কেবলই মনে হত ওকে দলে আনতেই হবে, ও হবে দলের একটি সত্যিকারের সম্পদ। একটু একটু করে ওকে বললাম আমার বক্তব্য। খুব মন দিয়ে শুনল। অনেক কিছু প্রশ্ন করল, বলল, "অন্যায় দিয়ে কি কখনও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করা যায়?"

"যুদ্ধকে অন্যায় বল তুমি? দেশের মুক্তির জন্য যুদ্ধ?—এত বড়ো একটা পাপের ইমারতকে ভেঙে ফেলার জন্য যুদ্ধ?"

"কিন্তু খোলাখুলি যুদ্ধও তো করছ না তোমরা? তোমরা করছ গুপ্তহত্যা।"

"যুদ্ধ সব সময় সব-কিছু খোলাখুলি যে হয় না তা তো তুমি জান। কিন্তু প্রশ্ন সেটাও নয়, প্রশ্ন হচ্ছে—আজকে নিরস্ত্র জাত আমরা, সম্মুখ যুদ্ধ ইংরেজের মতো অত বড়ো শক্তিশালী জাতের সঙ্গে করি কী করে? যেদিন আমাদের হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নিল ইংরেজ, সেদিন শুধু যে জাতির মেরুদণ্ড ভেঙে দিল তা নয়—ওদের সঙ্গে খোলাখুলি লড়াই করারও সমস্ত পথ রুদ্ধ করে দিল। আজ তো তাই আমাদের গোপনে আঘাত হানতে হয়, আর তার চেয়েও গোপনে তার আয়োজন করে চলতে হয়।"

আইরিনি তর্কে আমার সঙ্গে পারে নি, বরং আমাদের কথাগুলো শুনতে শুনতে ওর চোখ দিয়ে জল পড়ছিল। কিন্তু তবু পরের দিন কলেজে এসেই আমাকে বললে, "বীণা, তুমি হয়তো আমাকে ভীরু ভাববে, কিন্তু কী করব, কিছুতেই মনের সায় পেলাম না। জানো কাল সারারাত জেগে আমি প্রার্থনা করেছি।"

আইরিনিকে দলে পাই নি, কিন্তু ওর মধ্যে যে একটা নির্মল 'ওরিজিন্যাল' মনের পরিচয় পেয়েছিলাম সেটা আজও ভুলি নি। নতুন নতুন মেয়ে অবিশ্যি কিছু কিছু দলে

আনতে পেরেছিলাম। কেউ কেউ ছিল বড়োলোকের মেয়ে—টাকার দরকার হলেই টাকা দিত। কেউ আবার টাকা দিতে পারত না—নিজেকেই ব্যাকুল আগ্রহে সমর্পণ করে দিত।

বড়োলোক বন্ধু ছাড়াও কী উপায়ে টাকা জোগাড় করা যায় তার ফিকির কেবলই মাথায় ঘুরত। একবার একটি বন্ধু আমাকে পরামর্শ দিল, "তুমি তো লেখো মন্দ না, ওই ভাবেও তো টাকা রোজগার করতে পার।" সেদিনই বাড়ি গিয়ে কাগজ কলম নিয়ে বসে গেলাম। লেখিকা হিসেবে নিজের নাম না দিয়ে। লেখাটি ভয়ে ভয়ে পাঠিয়ে দিলাম 'ভারতবর্ষে'র সম্পাদকের কাছে। মাসের প্রথমেই আমার পরামর্শদাতা বন্ধুটি আর আমি একখানা ভারতবর্ষ কিনে উলটে দেখি লেখাটা বেরিয়েছে! লেখা তো বেরুলো কিন্তু আসল জিনিস এখনও যে বাকি! টাকা কোথায়? তখন আবার দুজনে মিলে পরামর্শ করে আর-একটি লেখা পাঠালাম—আর সেইসঙ্গে পাঠালাম সম্পাদক মশায়ের কাছে আগের লেখার জন্য টাকা চেয়ে সসংকোচ একখানি চিঠি। চিঠির উত্তর এল : "এই ধরনের লেখার জন্য আমাদের পক্ষে টাকা দেওয়া সম্ভব নয়।" বলা বাহুল্য, দ্বিতীয় লেখাটি এবার আর কাগজে স্থান পেল না। কাজেই লেখা বিক্রি করে টাকা রোজগারের চেষ্টার ওইখানেই ইতি।

এ ছাড়া আরো একটা পাগলামি সে সময় করেছিলাম। কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে লটারির টিকিট বিক্রির একটা কাজ নিলাম। কলেজের ফাঁকে ফাঁকে বাড়ি বাড়ি গিয়ে টিকিট বিক্রি করতাম। সে সময় এ ধরনের কাজ কলেজের ছাত্রীরা বড়ো একটা কেউ করত না, লোকে তাই আমাকে দেখে বেশ-একটু অবাক হয়ে যেত। তবু ভালো এ যাত্রায় একেবারে নিরাশ হতে হয় নি। টিকিট "বিক্রির" উপর শতকরা কিছু কমিশন আমি পেলাম। কিন্তু সেটা এতই সামান্য যে পরিশ্রম বা সময়ের কোনোটারই দাম উঠল না।

তবু নিজের রোজগারের টাকা দলকে দেওয়ার বাতিক এর পরেও কমে নি। এবার নিলাম টিউশনি। মনে হল অপেক্ষাকৃত কম পরিশ্রমে নিশ্চিত টাকা রোজগারের এটাই শ্রেষ্ঠ পন্থা। কিন্তু এতেও প্রভুগৃহের সুমধুর 'মাসাটারনি' সম্বোধন, আর অতি মাত্রায় হিসেবী পরিণতাবয়স্কা গৃহিণী-ছাত্রীদের ঘড়ি সামনে রেখে পুরোমাত্রায় কাজ আদায় করার আগ্রহ, আর একমিনিট এদিক-ওদিক হলে বিরক্তি প্রকাশের অভিজ্ঞতাও নিজের কাছে কম তিক্ত ছিল না।

সে সময় অবিশ্যি আমার মতো এরকম পাগলামি দলের প্রায় সকলেরই ছিল। আমাদের জীবনগুলো আমরা দেখতাম দেশের পায়ে সম্পূর্ণভাবে বিলিয়ে দেওয়া সামগ্রীর মতো। ওর একটি মুহূর্তও আমাদের নিজের নয়। নিজেদের জন্য কিছু আমাদের চাইবার নেই। নেই কোনো বিলাসিতার অবকাশ, স্বাচ্ছন্দ্য বা আমোদ প্রমোদ। যত বেশি ক্লেশ স্বীকারের কাজ আসত, ততই বেশি তৃপ্তি পেতাম। "তোমরা হচ্ছ প্রফেশনাল রেভোলিউশানারি, এ কথাটা কখনও ভুলো না যেন।" ভুলিনিও আমরা। তাই কোথায়

গেল আমাদের ছাত্রীজীবনে ভালো করে পাশ করার আকাঙ্ক্ষা, কোথায় ভেসে গেল ছেলেবেলার ভবিষ্যতের সোনায় আঁকা স্বপ্নগুলো। দেশের স্বাধীনতা যতদিন না আসছে, দেশের মানুষের লাঞ্ছনা আর দুর্গতি যতদিন না ঘুচছে, ততদিন দেশের তরুণ-তরুণীর সুখী হবার কোনো অধিকারই নেই—ব্যক্তিগত জীবনযাপনের কোনো অবকাশ নেই। এ কথা সেদিন আমরা সত্যিই বিশ্বাস করতাম। সে-বিশ্বাসের মধ্যে কোনো ফাঁকি ছিল না। ১৯৪২-এর অনেক আগেই বাঙলার ছেলেমেয়েরা অন্তত "ডু অর ডাই"—"করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে"—এই মন্ত্রে পুরোপুরি দীক্ষাই নিয়েছিল।

আমাদের সময় কলেজে যারা পড়ত তাদের মধ্যে বোধ হয় বেশিরভাগ ছেলেমেয়েই কোনো-না-কোনো ভাবে সে-সময়কার বিপ্লবীদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল। কেউ সোজাসুজি প্রত্যক্ষভাবে নিজেকে জড়াত; কেউ কিছুটা পিছনে থেকে, কিছুটা সাবধানে, সাহায্য করে যেত।

বিপ্লবীদলও তখন একটা ছিল না। যুগান্তর, অনুশীলন, শ্রীসঙ্ঘ প্রভৃতি নামের প্রসিদ্ধ দলগুলো তো ছিলই—তা ছাড়া ছোটোখাটো দলও ছিল অনেক। এমনি একটি ছোট্ট দলের সঙ্গে প্রথমটায় আমি সংশ্লিষ্ট ছিলাম। তখন অবিশ্যি বুঝতামও না দলটি ছোটো না বড়ো। সমস্ত-কিছুই একটা গভীর গোপনতার রহস্যে আবৃত করে রাখা হত; কোনো প্রশ্ন করা চলত না, অবাস্তব প্রশ্ন একেবারে নিষিদ্ধ ছিল। যাঁদের সঙ্গে দেখা করতে, আলোচনা করতে সুহাসিনী নিয়ে যেত, তাঁদেরও নাম কখনও আমায় জানতে দিত না। একদিন দুজনে বাসে যাচ্ছি, সুহাসিনীর হাতে একটা খামে মোড়া চিঠি, খামটার দিকে আমার চোখ পড়তেই তাড়াতাড়ি ও খামটা সরিয়ে নিল। প্রথমটা অপমানের ধাক্কা লাগল মনে—তার পর সামলে নিলাম, ভাবলাম এমনি করেই তো নিজেকে শক্ত হতে হবে। এটা পরস্পরকে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন নয়, এটা ডিসিপ্লিন—কঠোর সংযমের শিক্ষা। যতটুকু প্রয়োজন তার এতটুকু বাইরে যাওয়া আমাদের অন্যায়।

গল্প শুনতাম—পুলিশের অত্যাচারের নানারকম বীভৎস কাহিনীর—ব্যাটারি চার্জ, বরফে শুইয়ে রাখা, নোখে আলপিন ফোটানো—আরও অনেক কিছু। মনের অসাধারণ জোর না থাকলে সে-সব সহ্য করা শক্ত ছিল, শুধু তাই নয়, শরীরের উপরও দরকার হত অমানুষিক কন্ট্রোলের। "সাইন-অব-দি-ক্রস"-এর সেই কথাটা মনে পড়ে—"আমার জিভই আমার আত্মার বিশ্বাসঘাতকতা করে।" তাই সে সময় পুলিশের কাছে কেউ যদি স্বীকারোক্তি করে ফেলত তার অর্থ সব সময় এই ছিল না যে সে বিশ্বাসঘাতক, কাপুরুষ। তখনকার আই. বি.-দের অত্যাচার মানুষের সাধারণ সহ্য-সীমাকে বহু পরিমাণে লঙ্ঘন করে যেত।

যাঁরা সে অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারতেন তাঁদের মহত্ত্ব আর সহজশক্তির কাছে মাথা নত হয়ে আসে। কিন্তু যে দুর্ভাগারা পারত না, পরাভূত হয়ে যেত শরীরের অসহ্য নিপীড়নের কাছে, তাদের জন্যও আমার অন্তত দুঃখ এমন কম ছিল না। মনে হত, আহা, ওদের চেয়ে দুঃখী সংসারে আর কে আছে! অন্তরে অনুশোচনার যে কাঁটা ওরা সারাজীবন বহন করে চলবে কেই বা তার খবর রাখে?

বলা বাহুল্য, আমার এ-সব কথা শুধু তাদেরই জন্য পুলিশের অত্যাচারে যারা স্বীকারোক্তি করেছে। যারা নিজেদের স্বার্থের জন্য, অর্থের লোভে 'উজ্জ্বল' ভবিষ্যতের প্রলোভনে দলের সর্বনাশ সাধন করে সঙ্গীদের অনায়াসে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে গেছে—তাদের কথা বলছি না। তাদের কথা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র—তাদের নিন্দা করবার মতো ভাষা নেই।

আগের অভিজ্ঞতা থেকে এ-হেন বিশ্বাসঘাতকতা বা স্বীকারোক্তিতে যাতে দলের অনিষ্ট না হয় সেজন্য দুটি উপায় অবলম্বন করা হয়েছিল। প্রথমত বাজে লোকের প্রবেশ একেবারে বন্ধ করবার জন্য দলে আনবার আগে প্রত্যেককে যতদূর সম্ভব যাচাই করে নেওয়া হত। "কোয়ানটিটি চাই না, চাই কোয়ালিটি"—এই সতর্কবাক্য আমাদের সে সময় শেখানো হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, দলের কথা দলের লোকদের যতদূর সম্ভব কম জানানো হত। কাজের জন্য যার যতটুকু প্রয়োজন তার বেশি কেউ জানতে পারত না। এ নিয়মে লাভের দিক যেমন, অসুবিধার দিকও ছিল তেমনি। নিজেদের দলের সম্বন্ধে পরিস্কার ধারণা না থাকায় অনেক কিছুই আকাশকুসুম আমাদের কল্পনা করে নিতে হত। সারা ভারতবর্ষে তখন আমাদের দলই সবচেয়ে শক্তিশালী—এমনি ধরনের কথাও আমরা অনায়াসে বিশ্বাস করে নিতাম। আরও কত রকম যে অসুবিধা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল, ক্রমে ক্রমে তা বুঝতে পারি।

তখন সবেমাত্র ডালহাউসিতে কলিকাতার পুলিশ কমিশনার চার্লস্ টেগার্টের উপর বোমার আক্রমণ শেষ হয়েছে। দু-তিন দিন পরে সুহাসিনী এসে বললে, "জানো বীণা, আমাদের দলের অনেকেই ধরা পড়েছেন, 'দাদা' নিজেও!"

স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। ডালহাউসির ঘটনার সঙ্গে আমরা যে কোনোভাবে জড়িত আছি—ঘুণাক্ষরেও তা জানতাম না। কিন্তু এর চেয়েও বড়ো বিস্ময় আমাদের জন্য অপেক্ষা করে ছিল। ক্রমে ক্রমে জানতে পারলাম ওই 'দাদা' ছাড়া সেরকম দায়িত্বশীল ব্যক্তি আমাদের দলে বড়ো কেউ নেই। আরও যে দু-তিনজন ছিলেন, তাঁরাও নানা কারণে তখন একটু একটু করে সরে দাঁড়ানোর পক্ষপাতী। অভ্যন্তরীণ নানা গণ্ডগোল প্রতিদিন প্রকাশ পেতে লাগল।

তখনই আমাদের মতো জনকয়েক ছেলেমেয়ের উপর অনেকখানি দায়িত্ব এসে পড়ে। জানা গেল—অনেকগুলি অ্যালুমিনিয়ামের বোমার খোল বন্ধুবান্ধবদের কাছে ছড়িয়ে আছে। সেগুলো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সরিয়ে ফেলতে হবে, নিরাপদ স্থানে রাখা অসম্ভব হলে যে করে হোক সেগুলোকে নষ্ট করে ফেলতে হবে। কারণ পুলিশের বেড়াজাল তখন সর্বগ্রাসী হয়ে উঠেছে, যে-কোনো মুহূর্তে বিশেষ বিপদের সম্ভাবনা। একখানা 'কোডে' লেখা খাতাও হাতে এল। 'কোড'টা জানা ছিল—তাই জানতে পারলাম এগুলো বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকা আমাদের দলের বন্ধুদের নাম—এদের সঙ্গে যোগাযোগ এখন আমাদেরই করতে হবে।

ক্রমে ক্রমে একটা নৈরাশ্য আর একটা অবসাদ আমাদের ছোট্ট দলটিকে গ্রাস করে

ফেলতে লাগল। আভ্যন্তরীণ কতগুলি গোলমালই এর প্রধান কারণ। তা ছাড়া দলের দায়িত্বশীল সভ্যরা দীর্ঘদিনের জন্য কারান্তরালে চলে গেলেন—সেটাও কম আঘাত নয়। কর্তব্য কাজ নিজেদেরই নির্ণয় করবার সময় এল। নিজেরাই ভাবতে লাগলাম কী এখন করা যায়।

এদিকে বাঙলার আকাশে তখন গাঢ় অন্ধকার থেকে থেকে গাঢ়তম হয়ে উঠেছে। একদিকে যেমন চলেছে বাঙলার কয়েকটি মুষ্টিমেয় ছেলেমেয়ের একটার পর একটা দুঃসাহসিক মৃত্যুপণ প্রচেষ্টা, অন্য দিকে তেমনি ক্রুদ্ধ আহত ব্রিটিশ সিংহেরও উন্মত্ত আক্রোশ। সে আক্রোশ সহস্র সহস্র নখর দন্ত মেলে দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছিল। সেই মুষ্টিমেয় তরুণ-তরুণীর দল সেদিন সেই রুষ্ট রাজশক্তির ভয়ে পিছিয়ে যায় নি, মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল—ঘোষণা করেছিল সংগ্রাম।

ব্রিটিশ রাজশক্তির ছিল বিরাট রণসম্ভার : বিপুল অস্ত্রশস্ত্র, আর ততোধিক বিপুল আর নিপুণ আই. বি., এস. বি., পুলিশ-মিলিটারির অক্ষৌহিণী-বাহিনী। আর, বাঙলার সেই তরুণ-তরুণীরা? তারা ছিল একা, নিঃসঙ্গ, নিরস্ত্র। গোপন পদক্ষেপে তারা পথ কেটে কেটে চলেছিল, ছিল না কোনো সহায়, সম্বল কিংবা সহানুভূতি।

দেশের কেউই সেদিন প্রকাশ্যে তাদের কোনোরকমই সাহায্য করতে সাহস পেত না, মুখ ফুটে তাদের সম্মান জানাবার দুঃসাহস রাখত অল্পই। তবে এটা তারা জানত যে দেশের অন্তরের অন্তরতম স্থান তাদেরই জন্য প্রসারিত রয়েছে। তাদের প্রতিটি মারণ আঘাতে, প্রতিটি মৃত্যুবরণে, দেশের মনের গ্রন্থিতেই একটির পর একটি ভাঙন ধরছে : ভীরুতার যে গ্রন্থি, অবসাদের যে গ্রন্থি, নীরবে অন্যায় সহ্য করে চলার যে আত্মাবমাননা—তার গ্রন্থি।

সেই সংগ্রামে শুধু চুপ করে বসে দেখা আমাদের পক্ষে অন্তত অসম্ভব ছিল—আমরা যারা বহুদিন ধরে এর জন্য সাধনা করে আসছি, যার জন্যে আমাদের এই দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষা।

একটি বন্ধুকে (আমাদের সেই ছোট্ট দলের নয়) অনেক বলে-কয়ে একটি রিভলভার জোগাড় করলাম। সামনেই [বিশ্ববিদ্যালয়ে] কনভোকেশান। বাঙলার গভর্ণর সেখানে আসবেন। বাঙলার রাজশক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার এর চেয়ে বড়ো সুযোগ আর কী হতে পারে!

মনে দ্বিধা হয় নি একটুও, পাঁচঘরা রিভলভারটা হাতে নিয়ে একবারও মনে হয় নি ওই ছোট্ট মারণ-অস্ত্রটি শুধু যে অপর একটি মানুষের ইহলীলা সাঙ্গ করে দিতে পারে তাই নয়, আমার জীবনেরও ঘোষণা করতে পারে অন্তিম পরিণাম। মনটা বাস্তবিকই তখন একেবারে নৈর্ব্যক্তিক হয়ে উঠেছিল, সমস্ত ব্যাপারটাকে বিরাট একটা ব্যাপারেরই ক্ষুদ্রতম অংশ ছাড়া আর কিছু মনে হচ্ছিল না।

তবে কতটা সফল হতে পারব যথেষ্ট আশঙ্কা ছিল। ব্যর্থতার লজ্জা যে অনেকখানি সেটা জানতাম। আমার অত্যন্ত আত্ম-সচেতন স্বভাবের জন্য নিজেকে এ ব্যাপারে

বেশ-কিছুটা সন্দেহও করতাম। তা ছাড়া আরেকটি মুশকিল ছিল এই যে আগে কখনো রিভলভার প্র্যাকটিস করবার সুযোগ পাই নি। আগ্নেয়াস্ত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা আমার প্রায় ছিল না বললেই চলে। একবার শুধু বন্ধুরা দল বেঁধে একটা বড়ো বন্দুক নিয়ে শিকারে গিয়েছিলাম। একজন বন্ধু একটি পাখি মেরেছিল। আমি টিপ্ করেছিলাম একটা গাছের পাতা। পাতাটায় গুলি লেগেছিল ঠিক, কিন্তু নিজেও যে প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেয়েছিলাম মনে পড়ে। কিন্তু রিভলবারটা তো এতটুকু জিনিস, এতে কী করলে কী হয় কী জানি! বন্ধুটিকে বারবার বললাম, "একবারটি প্র্যাকটিস্ করলে বড়ো ভালো হত।"

সময় কম, দূরে কোথাও যাবার সুবিধেও নেই। বন্ধুটি আশ্বাস দিয়ে বললেন, "তাতে কী, অনেকেই আগে প্র্যাকটিস্ করবার সুযোগ পায় না। বিনয় বসুও নাকি আগে প্র্যাকটিস্ করে নি।"

তখনকার মতো আশ্বস্ত হলাম বটে। কিন্তু তখন কি জানি "বিনয় বসু" আর "বীণা দাসে" তফাত কতখানি!

মনে আর-একটা দুর্বলতা ছিল : আমার মা-বাবাকে নিয়ে কেবলই মনে হচ্ছিল ওঁরা কী ভাববেন, কী করে সহ্য করবেন। গুপ্ত সমিতিতে নাম লেখানোর পর থেকেই আমার ধরন-ধারণে ওঁরা কিছুটা অবাক হয়ে যেতেন। কোথায় যাই, কী করি, কিছুই বলতে চাই না—আগেকার মতো সব-কিছুতে উৎসাহও নেই। গম্ভীর হয়ে থাকি। আমার রকমসকম ওঁদের ভালো লাগত না।

একদিন বিকেলে বেরিয়ে গিয়েছিলাম এক বন্ধুর বাড়ি যাব বলে। ফিরেছি অনেক রাতে। এসে দেখি মা মুখ গম্ভীর করে বসে আছেন, আর বাবা আমাকে খুঁজতে গেছেন সেই বন্ধুর বাড়ি। বাবা এসে বললেন, "ওখানে তো যাও নি? এত রাতে কোথায় গিয়েছিলে বলো?" বাবার মুখ এমন ভয়ংকর কঠোর হতে আগে কখনও দেখি নি। সে রাতটা কাটল ভীষণ বকুনি খেয়ে, বাড়িশুদ্ধ লোকের সারারাত আর ঘুমনো হল না।

পরের দিন বন্ধুদের কাছে খবরটা গেল, ওরা বলল, "এ-সব তো হবেই, এর জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকা দরকার।"

'কিন্তু এর পর আমি বাড়িতে আর থাকতে পারব না।"

"ছিঃ, এ-সব অভিমান কি আমাদের সাজে রে! কত কীই তো সহ্য করে নিতে হবে আমাদের।"

সহ্য অবিশ্যি আমায় কিছুই করতে হয় নি। দুদিন যেতে বাবা নিজেই এসে আমার পিঠে হাত বুলিয়ে, কাছে টেনে আদর করে সমস্ত ব্যথা ভুলিয়ে দিলেন। ছুটুদি বাবাকে কী বুঝিয়েছে জানি না তবে আমি অন্যায় যে কিছু করি নি, বরং আমার সম্বন্ধে অন্যায় সন্দেহ করে বাবাই যে অন্যায় করেছেন এটাই তিনি মেনে নিলেন। বকুনির সময় চোখে জল আসে নি, কিন্তু বাবার এই আদর আর আমার প্রতি এই বিশ্বাসে নিজেকে আর সামলাতে পারলাম না। দুচোখ বেয়ে অজস্র ধারায় জল নেমে এল। মা-বাবার

সঙ্গে লুকোচুরি করছি, তাঁদের কত বড়ো বিশ্বাসের সঙ্গে প্রতারণা করছি, এটা সহ্য করাই ছিল আমার পক্ষে সবচেয়ে শক্ত। এক-একবার ভাবতাম খুলে সব বলি যদি।

"কী? বলবে! পাগল নাকি? কোনো মা-বাবা নাকি এ-সবে মত দিতে পারেন? এতে শুধু তোমার বিপদ হবে না, আমরাও সব মারা পড়ব।"

এর পর তাঁদের আর বলা চলে না। কিন্তু যেদিন একটা প্রচণ্ড আঘাতের মধ্যে দিয়ে আমার জীবনের এই অধ্যায়টার সঙ্গে তাঁদের পরিচয় হল, সেদিনও তাঁরা ঠিক আগেরই মতো একান্ত ক্ষমার সঙ্গে আমাকে গ্রহণ করে নিলেন। অন্যায় আমি করি নি, দেশের জন্য মেয়ে যে তাঁদের সব-কিছুই করতে পারে সে কি তাঁরা জানেন না।

৬ ফেব্রুয়ারির কনভোকেশানের ঘটনার দুদিন পরে আই. বি. অফিসে মা-বাবাকে যখন নিয়ে আসা হল, তাঁদের চেহারা দেখে আমি চমকে উঠলাম! দুদিনের মধ্যে মানুষের চেহারা এমন বদলে যেতে পারে! আই. বি.-রা বাবাকে বললে, "ওকে শুধু রিভলভারের সিকরেট্‌টা বলে দিতে বলুন, তা হলেই ওকে ছেড়ে দেওয়া যাবে।"

ওদের ধমক দিয়ে বললাম, "আমার বাবাকে আপনারা চেনেন না, আমার বাবা মেয়েকে বিশ্বাসঘাতক হতে শেখান না।"

আই. বি.-রা চুপ করে গেল। বাবা শুধুই কাঁদতে লাগলেন। মা সামনে যাকে পেলেন তারই হাত ধরে ব্যাকুল প্রার্থনা করতে লাগলেন, "ওকে একটু দেখবেন, একটু দয়া করবেন, ও আমার বড়ো আদরের মেয়ে।" স্নেহের বেদনা যেন মানুষকে ভিখারীর চেয়েও দীনহীন করে তোলে। জেলে গিয়েই মা-বাবাকে এই চিঠিটা লিখে পাঠাই :

পরিপূর্ণ স্বর্গসুখে হানি তীব্র বাজ
অরক্ষিত ক্ষুদ্র নীড়টুকু দোলাইয়া প্রচণ্ড আঘাতে
সারি সর্ব কাজ
হেথা আজি দাঁড়ায়েছি আসি।
এখানেও কেন আসে ভাসি
চারিদিক হতে শত পরিচিত প্রিয় কণ্ঠস্বর?
পিতার উদ্যত বাহু, জননীর কাতর অন্তর
ঠেলি সর্ব বাধা কেন চাহে হরিবারে
বিশ্রব্ধ বক্ষের মাঝে গৃহছাড়া অশান্ত কন্যারে?

মোরে ডাকিয়ো না হেথা একা রব পড়ি
দুটি ক্ষীণ হস্তে মোর আঁকড়িয়া ধরি
সর্বোত্তম গর্ব মোর সর্বাধিক লাজ
মোর সারাজীবনের কাজ।
জানি তাহা লাগে নাই ভালো তোমাদের
আপনি স্বদেশমাতা ফিরান আনন
তবু হের তারও পরে সাধনার ব্যর্থ জনমের
প্রসন্ন স্নেহের হাসি হাসিছেন মোর নারায়ণ।

৬ ফেব্রুয়ারি কনভোকেশান হল থেকে আমাকে সোজা এনে পুরনো লালবাজারে দোতলার একটা ঘরের মধ্যে। সমস্ত দেহমনে তখন একটিমাত্র অনুভূতি ছিল—বিশ্ব-জোড়া ক্লান্তি। ঘরে দু-তিনটে কম্বল একপাশে গাদা করা ছিল—তারই একটা পাতলাম, অন্য দুটো গায়ে দিলাম। অপরিস্কার, দুর্গন্ধে ভরা, কত লোকের গায়ে দেওয়া কম্বল—তবু তার মধ্যে আশ্রয় পেয়ে সেই কনকনে শীতের রাতে মাতৃবক্ষের উত্তাপ অনুভব করেছিলাম—অমন গাঢ় ঘুম যেন বহুদিন ঘুমোই নি। ভোরবেলা উঠে দেখি সেই ঘরে আরও দুটি ফিরিঙ্গি মেয়ে শুয়ে রয়েছে, আর রয়েছে লালবাজারের আয়া। ঘরের সামনে সারারাত ধরে হল্লা করেছে একদল সার্জেন্ট, তাদের গ্রামোফোন আর চিৎকার তখনও বন্ধ হয় নি। ভোরবেলা ঘুম ভেঙে উঠতেই সার্জেন্টরা পালা করে বন্ধ দরজার সামনে এসে আমাকে উঁকি মেরে দেখতে লাগল আর হাত নেড়ে সহানুভূতি জানাতে লাগল : "গভর্ণরের জীবননাশের চেষ্টা? তোমার জীবন শেষ হয়ে গেল, কোনো ভুল নেই। শেষ হয়ে গেল। বেচারা! নিতান্ত ছেলেমানুষ!"

ওদের অযাচিত করুণা দেখে হাসি পাচ্ছিল, বললাম, "কিন্তু আমি একটু স্নান-টান করব, তার ব্যবস্থা করে দাও-না।"

দরজাটা খুলে দিল, কিন্তু স্নানের ঘরে সঙ্গে সেই ফিরিঙ্গি মেয়ে দুটিও ঢুকল—একা ছাড়া নিয়ম নেই। কাজেই স্নান আর হল না, মুখে চোখে জল দিয়ে চলে এলাম। খানিকটা পরে থানার হিন্দুস্থানী এক দারোগা এসে জিজ্ঞাসা করল—কী খাব? বললাম, "যা হোক দিন।" দুপুরের দিকে সযত্নে সাজানো ভাত, ডাল, তরকারি, চাটনি, দই, লেবু এনে দিল। ভাতের থালাটিকে ঘিরে ওর যত্ন আর সহানুভূতি ফুটে উঠেছিল, চুপি চুপি আমাকে বলল, "দোকান থেকে কিনে আনি নি, আপনার জন্য নিজেই রেঁধেছি।"

কাজেই সব মিলিয়ে লালবাজারের নরকবাস আমার কাছে তত অসহ্য লাগে নি। দিন পাঁচ-ছয় পরে নিয়ে গেল প্রেসিডেন্সি জেলে। ফিমেল ইয়ার্ডে ঢুকতেই দেখি চারদিকে অসম্ভব ভিড়। চোখটা ভিড়ের মধ্যে থৈ খুঁজে পাবার আগেই একটি মেয়ে কোথা থেকে ছুটে এসে আমায় জড়িয়ে ধরল—"মনু!" চেয়ে দেখি আমাদেরই ক্লাসের মেয়ে অমিতা। তার পর ক্রমে ক্রমে কাছে এগিয়ে এসে ভিড় করে দাঁড়ালেন নানা বয়সের কত পরিচিত, অপরিচিত মেয়েরা—সত্যাগ্রহ করে সকলে জেলে এসেছেন। অমিতা সবার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল, তার পর বলল, "এখন কথাবার্তা থাক্, ওকে আগে স্নানটান করিয়ে আনি। বাবাঃ, কী চেহারা হয়েছে মেয়ের, চেনাই যায় না!"

জেলে দেখি মহা আনন্দে রয়েছে এরা! সারাক্ষণ গল্প, গান, চিৎকার, খেলাধুলা। বাড়ি থেকে এক-একজনের ইন্টারভিউ আসছে আর আসছে নানারকম খাবার, তাই নিয়ে মহা কাড়কাড়ি। "বেশ আছ দেখি তোমরা, জেল যে এই রকম তা তো ভাই জানতাম না।"

ওরা বলল, "এখন এত বেশি লোক হয়ে গেছি বলে কর্তৃপক্ষ আর গোলমাল করতে সুবিধা পায় না। নইলে প্রথম যারা এসেছিল খুব কষ্ট পেয়ে গেছে। ডিভিশান

থ্রিতে রেখেছিল, ঘাঘরা পরিয়েছে, জাঁতা ঘুরিয়েছে।” তাদের মধ্যে আমার ছুটুদিও ছিল, সে-সব কথা জানতাম। এখন তাদের বহরমপুর জেলে নিয়ে গেছে।

পরের দিন বেলা দশটায় আমাকে কোর্টে নিয়ে গেল। যাবার আগে ওরা সবাই মিলে আমাকে সাজাতে বসল, বাড়ি থেকে খদ্দরের শাড়ি দিয়ে গিয়েছিল, সেটা পরিয়ে দিল। গুজরাটি মেয়েরা কেউ কুমকুমের টিপ পরিয়ে দেয়, কেউ হাত থেকে রাজ্যের রঙিন চুড়ি খুলে আমার খালি হাত দুটো ভরে দেয়। কার কী ভালো খাবার আছে নিয়ে এসে খাওয়ায়। হেসে বললাম, “তোমরা কি আজকেই আমায় যমের বাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছ নাকি—যে এত সাজগোজ আর আদর?”

“যাঃ কী যে বলে!” ওদের সবার চোখে-মুখেই কিন্তু একটা আশঙ্কা আর ব্যাকুলতা—কী জানি কী হয়!

কোর্টের ব্যাপার একদিনেই শেষ করে দিল। যা-কিছু বলবার ছিল শেষবারের মতো জানিয়ে দিয়ে এলাম আমার দেশবাসীকে—একটি জবানবন্দীর মধ্যে দিয়ে। জানতাম এর পরেই নেমে আসবে আমার আর দেশের মধ্যে বিচ্ছেদের যবনিকা—হয়তো সে যবনিকা মৃত্যুর কালো রঙে নির্মল—হয়তো বা নির্বাসনের ধূসরতায় ম্লান।

কোর্ট থেকে জেলে ফিরে আসতেই অফিসাররা বললেন, “এবার কিন্তু শিগ্‌গিরই আপনাকে কলকাতা থেকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। তা ক্ষতি নেই, সেখানেও সঙ্গী পাবেন, আপনার দলেরই আরও দুজন ওখানে রয়েছেন।” বুঝলাম কুমিল্লার ম্যাজিস্ট্রেট স্টিফেন্‌স-হত্যা মামলার শান্তি-সুনীতির কথা বলেছেন। ঠিক হলও তাই। পরদিনই স্লিপ এল মেদিনীপুর যেতে হবে। মনটা ছ্যাঁক করে উঠল। বাড়ির লোকেদের সঙ্গে আর-একটিবার দেখা হয় না! কোর্টে দূর থেকে একটিবার মাত্র তাঁদের মুখ দেখতে পেয়েছিলাম। স্টেশনে গিয়ে চার দিকে কেবলই তাকাই—যদি কোনও রকমে খবর পেয়ে মা-বাবারা এসে থাকেন! ট্রেন ছাড়ার ঠিক আগে একজন রেলকর্মচারী আমার কাছে এসে বললেন, “কাউকে খবর দিতে চান বুঝি? এই নিন, কাগজ পেনসিল—ঠিকানা লিখে দিলে আমি পৌঁছে দেব।”

কৃতজ্ঞতায় মনটা ভরে গেল। তখনকার দিনে আমাদের সঙ্গে কথা বলাও তো একটা অপরাধ! ছোট্ট একটা চিঠি ভদ্রলোকের হাতে দিয়ে দিলাম।

৫

মেদিনীপুরে এসে দেখি একই ব্যাপার। সেখানেও অসংখ্য মেয়েদের ভিড়ে জেল ভেঙে পড়েছে। তবে কলকাতার সঙ্গে তফাত এই যে এখানে বেশির ভাগই গ্রামের মেয়ে। সুদূর পল্লী থেকে ছোটো ছোটো বাচ্চাকাচ্চা বুকে নিয়ে কত যে মেয়ে চলে এসেছে—স্বাধীনতা-সংগ্রামের অংশ নিতে। কত জনের কপালে পিঠে লাঠির দাগ, আরও অন্যধরনের অত্যাচারের চিহ্নও রয়েছে শরীরে, দেশের জন্য সমস্ত লাঞ্ছনাই

একান্ত সহজভাবেই গ্রহণ করে নিয়েছে এরা। একেবারে অশিক্ষিত গ্রামের মেয়ে বউ। এমনিতে নিতান্তই সাধারণ ওরা, রাতদিন ঝগড়া করে, চেঁচামেচি করে। তবু ভারি শ্রদ্ধা করতাম ওদের—মনে হত ওদের জেলে আসা আমার চেয়ে কত শক্ত, কত দুঃখের।

অত ভিড়ের মধ্যেও শান্তি-সুনীতিকে চিনে নিতে কষ্ট হয় নি। প্রথমটা বেশি কাছে ঘেঁষে না। শুধু যখন স্নান করতে যাচ্ছি, দুজনে কাছে এসে বলল, "কাপড়গুলো রেখে দেবেন, আমরা সাবান দিয়ে ধুয়ে দেব।"

"কেন?"

এবার শান্তি এক মুখ দুষ্টু হাসি হেসে বলল, "আপনাকে দেখে মনে হয় আপনি ও-সব কিছু পারবেন না।"

"ইস্, সত্যি নাকি? আর তোমরা বুঝি খুব পার?"

মাত্র চোদ্দ-পনেরো বছরের মেয়ে! কিন্তু ওদের আত্মপ্রত্যয় আর সাহস মনোমুগ্ধকর। অদৃশ্য বিজয়-তিলক ওদের কপালে, চোখে বিদ্রোহের বহ্নি।

দুজনে মিলে আমায় প্রথম গান শোনালো :

চলে বন্ধুবিহীন একা,
মোছে রক্তে ললাট কলঙ্ক-লেখা;
কাঁপে মন্দিরে ভৈরবী একি বলিদান,
জাগে নিঃশঙ্ক শঙ্কর ত্যজিয়া শ্মশান।

গানটা শুনে সমস্ত গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছিল আজও মনে পড়ে।

প্রথম কয়েকমাস জেলটা ঠিক জেল বলে বুঝতে পারি নি। সঙ্গিনীদের কাউকে ডাকি দিদি, বৌদি; কেউ মাসিমা, কেউ ঠাকুমা। স্নেহে যত্নে আমাদের তিনজনকে সবাই ঢেকে রেখে দিতেন। সবচেয়ে ভালো খাওয়াটা আমাদের জন্য, ঘরের মধ্যে সবচেয়ে ভালো জায়গাটা আমাদের শোবার জন্য। এক গেলাস জলও ঢেলে নিতে দিতেন না আমাদের। কিন্তু এত সুখ বেশিদিন সইল না। কেউ কেউ ছাড়া পেয়ে চলে যেতে লাগলেন, কেউ বদলি হয়ে গেলেন বহরমপুর জেলে। বিদায় নেবার সময় সকলেরই চোখে জল। সুনীতি হাসি দিয়ে সকলের মন ভালো করে দিতে চায় : "এ রামঃ, আমাদের মতো লক্ষ্মীছাড়াদের জন্য কেউ নাকি আবার কাঁদে? দেখছ বীণাদি, দেখছ এদের সব মাথা খারাপ হয়ে গেছে।"

কিন্তু এর চেয়েও করুণ বিচ্ছেদ আমাদের জন্য অপেক্ষা করে ছিল। হঠাৎ একদিন সকালবেলা ডেপুটি জেলার এসে বললেন, "শান্তি ঘোষকে ঢাকায় নিয়ে যাওয়া হবে।" এ আবার কী কথা! একলা শান্তিকে কেন নিয়ে যাবে? কতদিন রাখবে? কতদিন পরে ফিরিয়ে আনবে? ফিরিয়ে আনবে তো? আমরা নিশ্চিন্ত ছিলাম, আমরা তিনজনে অন্তত একসঙ্গে থাকতে পারব। এ-সব প্রশ্নের উত্তর কেই বা দেবে—কাকেই বা করব? জেলখানায় ও-সব বালাই নেই। সেখানে হুকুম হচ্ছে হুকুম। যাবার সময়

পর্যন্ত প্রাণপণে কান্না চেপে, মুখে হাসি ছড়িয়ে শান্তি বলল, "সুনীতি, মন খারাপ করিস না যেন।"

সুনীতিও ঠিক ততখানি জোরে মাথা নেড়ে উত্তর দিল, "না, তুইও না।"

কর্তৃপক্ষের প্রতিহিংসার জেহাদ অবিশ্যি এখানেই শেষ হয় নি। কিছুদিন পরেই সেই ডেপুটি-জেলারই আবার এসে উপস্থিত, বললেন, "আজ অর্ডার এল : সুনীতি চৌধুরীকে ডিভিশান থ্রি করে দিয়েছে।" সজোরে প্রতিবাদ করে উঠলাম, "সে কী করে হয়?—একবার ক্লাস স্থির করে আবার নাকি বদলানো যায়? তাও এতদিন পরে?"

"সে আমরা কী করব বলুন! আমাদের তো অর্ডার মাফিক চলতে হবে, আপনারা বরং গভর্ণমেন্টকে লিখতে পারেন।"

কিন্তু ওঁরা যা পারেন সেটুকুও করলেন না। আমাকে ডিভিশান টু-র ঘরে একা রেখে সুনীতিকে নিয়ে গেলেন সাধারণ কয়েদীদের ঘরে। এবার সুর নরম করে বললাম, "দেখুন আর কিছু না হোক আমার সঙ্গী হিসেবেও তো ওকে আমার ঘরে রাখতে পারেন।"

"না, সে যদি আপনি চান অন্য কয়েদী আপনাকে দেওয়া হবে। মিস চৌধুরীকে আপনার সঙ্গে থাকতে দিতে পারি না।"

সুনীতির কাপড়জামাও কেড়ে নেওয়া হল, পরিবর্তে এল মোটা ঢলঢলে এক কুর্তা, আর জেলের মোটা ডোরাকাটা শাড়ি। সহজে হার মানতে চাই না। আমাদের সেলাইয়ের খাটুনি ছিল, তাই কাঁচি পেতাম। সেই কাঁচি দিয়ে কুর্তাটা কেটে একটা ব্লাউজের মতন বানিয়ে দিলাম। সন্ধ্যাবেলা জমাদারনী এসে বলল, "বাবুরা জামাটা চেয়েছে গো।"

"জামার কথা বাবুরা জানল কী করে?"

"সে জানি না বাপু, তুমি জামাটা দাও।"

বলা বাহুল্য, জামাটা আর ফিরে আসে নি।

ফাইলের দিন সুপারিনটেন্ডেন্টকে জিগগেস করলাম, "জামাটা একটু গায়ে দেবার মতো করে নেওয়া হয়েছিল, এতে ক্ষতি কী ছিল?"

"না, না, ও বড়ো বেশি ফ্যাশনেবল্ হয়ে গিয়েছে!"

ইচ্ছা হল জিজ্ঞাসা করি, "জামাটা কী ফ্যাশানের হবে তাও কি আপনাদের জেলকোডে আঁকা থাকে নাকি?"

কিন্তু এদের সঙ্গে তর্ক করে কী হবে? জেলে কাজ করে করে এরা যুক্তিরও ধার ধারে না, হৃদয়েরও বালাই রাখে না। এরা ব্রিটিশ সরকারের আমলাতন্ত্রের এক-একটি অংশমাত্র, অন্য কিছু নয়। এদের মানুষ বলে মনে করা ভুল।

এমনি অকারণ নিয়মের গুঁতো আমাদের প্রতিদিনই খেতে হত, চলতে ফিরতে কেবলই বাধা পাই, কেবলই ধাক্কা খাই। সেবার অসহ্য গরম, ডাক্তারবাবুকে বললাম, "ডাক্তারবাবু, হাতপাখা দিন-না একটা।"

কী যেন খানিকটা চুপ করে ভেবে নিয়ে ডাক্তারবাবু বললেন, 'আচ্ছা পাঠাব।"

তার পরদিন ফাইলে সবাহিনী সুপারিনটেণ্ডেন্ট ঘরে এসেছেন। ঘরে ঢুকেই জেলার চোখ জবাফুল করে বললেন, "একি! হাতপাখা যে এখানে?"

চোখেও এত পড়ে এদের! ডাক্তারবাবু মুখ কাঁচুমাচু করে তাকে চুপি চুপি কী বললেন। তখন আর সেখানে কিছু গোলমাল হল না বটে, কিন্তু খানিকটা পরে পাখাটা ঘর থেকে অদৃশ্য হল। মাত্র চার পয়সার একটা পাখা নিয়ে এই কাণ্ড। পরে ডাক্তারবাবুর কাছে শুনলাম জেল কোডে পাখা দেবার কথা লেখা নেই কিনা, তাই জেলারের অত চোটপাট!

আর-একদিন গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় উঠান থেকে একরাশ বেল আর রজনীগন্ধা এনে ঘরে রেখেছি। সন্ধ্যাবেলা দরজা বন্ধ করতে এসেই জেলারের গর্জন, "জমাদারনী, ঘরে এত ফুল কেন, ফেলে দাও শিগ্‌গির।" তার পর আমার দিকে তাকিয়ে : "আপনার বোঝা উচিত, এটা জেল, আর বিলাসিতার জায়গা জেল নয়।" ফুলের এমন অপমান আর এমন অপব্যাখ্যা আর কখন শুনেছি বলে মনে হয় না। এর পর অনেকদিন বেল আর রজনীগন্ধার দিকে চাইতেও পারতাম না।

এমনি করে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে জেলখানার রথচক্র তার মন্থর গতিতে সময় কাটিয়ে চলল। ক্রমে ক্রমে সম্পূর্ণ অন্য একটা জগতের মানুষ হয়ে উঠলাম আমরা। আশা নেই, উৎসাহ নেই, আনন্দ নেই, বৈচিত্র্য নেই। ভোরবেলা উঠেই মনে প্রথম কথা জাগে : "কেন ভোর হল? কী করব এই শিশিরসিক্ত সোনালী সকাল নিয়ে? কোনো প্রয়োজনই যদি আমাদের নেই, কেন ভোরের পাখি এসে আমাদের ঘুম ভাঙায়, কেন ভোরের হাওয়া কানে কানে শুনিয়ে যায় সুদূরের নিমন্ত্রণ?"

উঠতে ভালো লাগে না, তবু উঠতে হয়। উঠে স্তূপীকৃত ঝাড়ন নিয়ে সেলাইয়ের কলের সামনে অনিচ্ছুক শরীরটাকে টেনে নিয়ে ফেলি। তার পর সারাটা দিন ধরে চলে ওই ঝাড়ন কাটা, মোড়া, সেলাই করা। তাতেও হয় না, দু-চারখানা কম হলে অফিস থেকে বাবুরা বলে পাঠায়, "কাজ কম হচ্ছে কেন? ওদের বলবে খোরাকি পোষাচ্ছে না যে।" তার পর আসে বিকেল। তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধুয়ে থালায় ভাত নিয়ে বসি খেতে। তার পর বাসন ধুয়ে বাইরের উঠোনে কয়েক মিনিট বেড়াতে-না-বেড়াতেই শুনি জমাদারনীর সরস আহ্বান : "চলো গো, লক্‌-আপ্‌ হতে চলো।"

এই তো আমাদের দিন, এই আমাদের সন্ধ্যা, এই আমাদের রাত্রি। তবুও শুধু নিজেদের নিয়ে থাকলে হয়তো চলত একরকম। কিন্তু তা তো হয় না। গোটা জেলখানার সুখ-দুঃখের ভারই যেন আমাদের ঘাড়ে এসে পড়ে। ঘাড় পেতে না নিলেই চলে। কতবার ভাবিও তাই, কিছু দেখব না, কিছু শুনব না। অন্যায় অবিচার কোথায় নেই, বাইরেও কি তার মাত্রা কিছু কম? সেখানেও কি থামাতে পেরেছি কোনোদিন? সারাদেশটাই তো একটা বিরাট অন্যায়ের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমরা আমাদের সমস্ত জীবন দিয়ে সেখানে আঘাত করতে চেয়েছি, সে আঘাতে নিজেরাই ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছি, কিন্তু সে পাষাণ ইমারতের এতটুকু বালি খসে নি, একটি ইটও খসে নি।

আমি যে দেখেছি প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে
বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে
আমি যে দেখেছি তরুণ বালক উন্মাদ হয়ে ছুটে
কী যন্ত্রণায় মরিছে পাথরে নিষ্ফল মাথা কুটে।

কিন্তু সত্যি সত্যিই তো আর সব-কিছুই সহ্য করে থাকা যায় না। চোখের সামনে জমাদারনী একটা চিররুগ্ণ হাঁপানীর আসামীকে ধরে লাথি মারবে—কিছু বলব না? ১০২ ডিগ্রি জ্বরে ভুগছে বিশ বছরের মেহেরের মা—তাকে যে সেদিন জোর করে খাটুনি ঘরে জাঁতার সামনে নিয়ে বসানো হল—তাতেও চুপ করে থাকতে হবে? জেলে থেকে থেকে যতই অসাড় আর হৃদয়হীন হয়ে যাই-না কেন, তারও তো একটা সীমা আছে!

এর উপর আবার একটা নতুন উপসর্গ আরম্ভ হল। জেলের ভিতর ফিমেল ইয়ার্ডে ঢুকে জেলার নানারকম অনাচার আরম্ভ করল। ওর স্পর্ধা দেখে হতভম্ব হয়ে গেলাম। সুপারিন্টেন্ডেন্টকে জানালাম। উত্তর না দিয়ে চলে গেল। ম্যাজিস্ট্রেট একদিন জেল দেখতে এল, তাকে বললাম, "চোখের সামনে এ-সব আমরা সহ্য করতে পারছি না।"

ভাঙা ভাঙা বাঙলায় হাত নেড়ে ম্যাজিস্ট্রেট বলে গেল, "না দেখতে পার চোখ বন্ধ করে থাকবে।"

বুঝলাম এরা গোলমাল না করিয়ে ছাড়বে না। শান্তি ততদিন আমাদের কাছে ফিরে এসেছে, তিনজনে মিলে পরামর্শ করে স্থির করলাম, অনশন আরম্ভ করতে হবে। সাধারণ কয়েদীরা শুনে বলল, "ঠিকই তো, এ-সব তো থামানোই উচিত। কিন্তু তোরা 'পোলাপান'—তোরা যদি না খাস্ আমরাও খাব না।"

ওদের কথায় উৎসাহিত হয়ে উঠলাম। এরকম হলে তো জেলে একটা নতুন ব্যাপার হবে এবং তার ফলও পেতে পারি তাড়াতাড়ি। কিন্তু ওদের উপর পাছে বেশি অত্যাচার হয়, সেজন্য ঠিক হল ওরা খালি প্রতিবাদস্বরূপ একদিন খাবার নেবে না।

পরের দিন দুপুরে যখন সমস্ত ফিমেল ইয়ার্ডের ভাত ফিরে গেল, সারা জেলে হৈ-হৈ পড়ে গেল। অফিসাররা জনে জনে এসে আমাদের বোঝাতে লাগল। ভাগ্যক্রমে একজন নন-অফিসিয়াল ভিজিটারও এসে পড়লেন, আমাদের সমস্ত কথা তাঁকে জানাতে পারা গেল।

দুটো দিন এমনি করে কাটল, তিনদিনের দিন আর উঠতে পারি না, শক্তি নেই। ঘরের মেঝেতে শুয়ে ছটফট করছি। উৎকট গরম আর অসংখ্য মাছির সমবেত উৎপাত পাগল করে তুলছে। এক গেলাস জল খেতেও কলসির কাছে অতিকষ্টে গড়িয়ে গড়িয়ে যাচ্ছি, সোজা হয়ে উঠতে পারি না। সুপারিনটেণ্ডেন্ট এসে অবস্থা দেখে মুখটা গম্ভীর করে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পরেই অফিসঘরে আমার ডাক পড়ল। মোটরে তিনি আমাকে বাইরের হাসপাতালে পৌঁছে দিলেন।

জেল থেকে এই বাইরে বেরুলাম ঠিক এক বছর পর। উপোস সত্ত্বেও বাইরের আলো আর বাতাসের কোমল স্পর্শ যখন চোখেমুখে এসে লাগল—তিক্ত, অবসন্ন

মনটাও যেন কতকটা সজীব হয়ে উঠল। হাসপাতালে একটি মারাঠী নার্স আমাকে অভ্যর্থনা করে নিল। এখানে এসে দেখি সুপারিন্টেন্ডেন্ট একেবারে অন্য মানুষ! ঘোরাফেরা বেশ স্বাভাবিক, মুখে সহজ হাসি। নার্সকে বললেন, "ওর মাথায় একটু সুবুদ্ধি ঢোকাতে পার? ওই জিনিসটাই ওর সবচেয়ে প্রয়োজন।"

খানিকটা পরে আমার খাটের কাছে এসে নরম সুরে বললেন, "তুমি আমার উপর খুব চটে আছ, না? কী করি বলো, তোমাদের কথা কি আর আমি বুঝি না! কিন্তু আমার নীচে যে-সব কর্মচারী তাদের তো আমি ছোটো করতে পারি না।"

মনে হল এই হচ্ছে সাচ্চা ইংরেজ চরিত্র। এদের কাছে সবচেয়ে বড়ো গুণ হচ্ছে 'মুখ-রক্ষা'। সত্যের চেয়েও এরা সম্ভ্রমকেই বড়ো করে দেখতে শিখেছে। অন্যায়ের প্রতিবিধানের চেয়েও এদের কাছে বড়ো কথা প্রতিষ্ঠানের অখণ্ডতা বজায় রাখা। এইখানেই ওদের মস্ত বড়ো শক্তির উৎস—আবার ঠিক এইখানেই দুর্বলতার মস্ত ফাটল দেখা দিয়ে ওদের শক্তির স্তম্ভকে ধূলিসাৎ করে দেবে। অন্যায়কে অন্যায় বলে যতদিন না ওরা স্পষ্ট স্বীকার করতে শিখবে, ওদের এত শৃঙ্খলা, এত মর্যাদাবোধ, কঠোর আত্মসম্মানের জ্ঞান—কিছুই ওদের বাঁচাতে পারবে না। মুখে আর তর্ক করলাম না, বললাম, "আমাকে তো এখানে নিয়ে এলে, কিন্তু ওই দুটি মেয়ে তো সেখানে মারা পড়বে। ওদের কী করছ?"

পরের দিন সকালে ওদেরও এখানে আনা হল। তার পরের দুটো দিন কী করে কাটল জানি না।

ঠিক সাতদিনের দিন দুপুরের দিকে হঠাৎ হাসপাতালের মধ্যে বাড়ির সকলে এসে উপস্থিত। আমাদের দাবি স্বীকৃত হয়েছে, জেলারকে ওই জেল থেকে সরানো হবে। আমাদেরও আর ওখানে রাখবে না। তবে দু-চারদিন দেরি হতে পারে। কিন্তু আমাদের শরীরে আর একদিনের দেরিও হয়তো সইবে না, তাই ওঁরা নিজেরা এসেছেন আমাদের কমলালেবুর রস খাওয়াতে।

বাড়ির সকলকে কতদিন পরে কাছে পেলাম! জেলের ভিতর ইন্টারভিউ ঘড়িধরা—জমাদারনী, অফিসারের প্রখর দৃষ্টির নিচে। এখানে সে কড়াকড়ি নেই, বকুনি নেই, তর্কাতর্কি নেই। অনেকক্ষণ ধরে যা খুশি তাই গল্প করলাম। বৌদি গান শোনালেন, বাবা প্রার্থনা করলেন। মা চুল বেঁধে দিয়ে গেলেন। সব মিলিয়ে যেন একটি অতি সংক্ষিপ্ত সুখস্বপ্ন—যেন বাইরের পাগলা হাওয়া কী খেয়ালে অতীত-জীবনের একখানি পাতা ছিঁড়ে এনে বর্তমানের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে গেল! তার পরও কয়েকদিন হাসপাতালেই আমাদের রাখা স্থির হল, শরীরগুলো একটু ঠিক করে নেওয়া দরকার। অর্থাৎ কিছুদিনের জন্য জেলের বন্ধনের রজ্জুটা আমাদের হাত থেকে খোলাই রয়ে গেল। বন্দীজীবনের এই যে ক্ষণিক বিরতি—এর মাধুর্য বন্দী ছাড়া আর কাউকে বোঝানো শক্ত। নিজেরাও ঠিক জানতাম না ভিতরে ভিতরে কতখানি আমরা শুকিয়ে উঠেছি। দৈত্যের মতো জেলের প্রাচীর চোখগুলোকে কতখানি যে পীড়িত করে তুলেছে সেটা তখনি বুঝলাম যখন সেই প্রাচীর চোখের সামনে থেকে কিছুদিনের জন্য সরে দাঁড়াল।

মানুষের মনটা সত্যিই ভারি অদ্ভুত, কত অল্পতেই কতখানি ভরে ওঠে—আবার সামান্য ছোটোখাটো অভাব, শুনতে যা মনে হয় অতি তুচ্ছ—তাতেই আবার ভিতরটা হাঁপিয়ে ওঠে। হাসপাতালে এ ক'দিন আমরা একধরনের রাজত্ব করে নিলাম। যা চাই তাই পাচ্ছি। প্রতিদিন ভোরবেলা খবরের কাগজ আসছে—তাতে কালি লেপা নেই, প্রধান খবরগুলোর উপর নির্মমভাবে কাঁচিও চালানো নেই। নতুন দিদির (নার্স) বাড়ি থেকে গ্রামোফোন দিয়ে গেল; এল হারমনিয়াম— যত খুশি গলা ফাটিয়ে গান করো, জমাদারনী তেড়ে আসবে না। খাবার আমাদের অর্ডার মতো আসছে। নতুনদি নিজের বাড়ি থেকে নানারকম রান্না করে পাঠাচ্ছেন।

হাসপাতালের মেল ইয়ার্ডে জনতিনেক রাজবন্দী ছিলেন। আমাদের প্রায় খবর নিতেন, বিস্কিট ও খাবারের উপঢৌকন তো আসতই, একদিন পাঠিয়ে দিলেন ভালো তেল, সাবান, স্নো। কতদিন এ-সব চোখেও দেখি নি। সুগন্ধি তেলটা মাথায় দিতে দিতে সুনীতি চিৎকার করে আওড়াতে লাগল, "যা-কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে, গন্ধে, গানে..." ভালো সাবান দিয়ে স্নান করে এসে স্নো মাখতে বসলাম। সুনীতি পরামর্শ দিল, "দুদিন পরে তো জেলে ফিরে যাচ্ছি, তখন তো এটা সঙ্গে নেওয়া চলবে না—এসো আজই এটা শেষ করি।" হাতে খাবলা খাবলা স্নো নিয়ে মাখতে লাগলাম সমস্ত হাতে ঘাড়ে পিঠে!

শান্তি স্নান সেরে এসে দৃশ্য দেখে তো অবাক! "বীণাদির পিঠে অত করে স্নো মাখাচ্ছিস কেন? পিঠে কেউ কখনও স্নো মাখে? ছি ছি, শিশিটা একেবারে শেষ করে দিলি! আমি তো ভাবছিলাম নতুনদির বাড়ির ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েদের আজ সাজাব।'

"কিন্তু পিঠে স্নো মাখতেও যে কী আরাম তাও তো তুই জানিস না—আয় তোকেও মাখিয়ে দিই।"

উচ্চহাস্যের মধ্যে পাঁচমিনিটে স্নো'র শিশির নিঃশেষত্ব প্রাপ্তি ঘটল। বন্দীদের থেকে অভিজ্ঞানপত্র নেওয়ার রেওয়াজ নেই, নইলে সম্পূর্ণ নূতন ধরনের সচিত্র বিজ্ঞাপন মীরা স্নো কোম্পানি আমাদের কাছে পেতে পারতেন।

দেখতে দেখতে একদিন এই সুখের দিন ফুরিয়ে এল। আবার আমরা জেলে ফিরে গেলাম। তবে এবার আর মেদিনীপুরে নয়। হিজলীতে মহিলা রাজবন্দিনীদের কাছে নিয়ে যাওয়া হল আমাকে আর শান্তিকে। সুনীতিকে ঢাকায়।

৬

এরপর আরও বহু বিচিত্র ঘটনাপ্রবাহের মধ্য দিয়ে আমাদের বন্দীজীবনের স্রোতস্বিনী বয়ে চলল। একটি একটি করে দীর্ঘ সাতটি বছর আমরা জেলের প্রাচীরের মধ্যে কাটিয়ে দিলাম। সাতটি গ্রীষ্ম... সাতটি শীত... সাতটি বর্ষা... সাতটি বসন্ত...

সকলে যখন শোনে চমকে ওঠে : "সাত সাত বছর জেলে ছিলে?" নিজেরাও পিছনের দিকে তাকিয়ে ভাবি, সত্যিই তো, কী করে ছিলাম? কী করে বেঁচে রইলাম?

কিন্তু এ ভীতির সবটাই হয়তো সত্য নয়। সত্যিই কি বন্দীজীবনের সবটুকুই আমাদের লোকসান? আজ যখন জীবনের লাভ-ক্ষতির অঙ্ক মেলাতে বসি, তখন কি ওই বন্ধন-পীড়িত সাতটি বছরকে পুরোপুরি ক্ষতির ঘরেই ফেলে দেওয়া চলে। আত্মীয়বন্ধুরা দুঃখ করেন—জীবনের শ্রেষ্ঠ বছরগুলো আমরা জেলের মধ্যে নষ্ট করে এসেছি। যে সময়টা মানুষের সবচেয়ে পরিপূর্ণ, একবারে কানায় কানায় ভরা, যখন মানুষ দু'হাতে লুটে নিতে পারে, দু'হাতে ভরে ঢেলে দিতেও পারে—ঠিক সেই সময়টা আমাদের কাটল কিনা একটা বিরাট শূন্যতাভরা প্রবঞ্চনার মধ্যে। একদিক দিয়ে কথাটা হয়তো সত্যি। কিন্তু এর অন্য একটা দিকও আছে। প্রথমত জেলে শত আঘাত শত সংঘাতের মধ্যেও কোনোদিন আমরা মাথা হেঁট করি নি, বেদনায় অভিভূত হই নি। অন্তরের গভীরতম স্থান থেকে একটা গোপন শক্তির উৎস আমাদের প্রতি মুহূর্তে শক্তি জুগিয়েছে, প্রেরণা দিয়েছে। সে উৎস আমাদের আদর্শ। নিজেদের আমরা কোনোদিনও বিচ্ছিন্ন করে একক করে দেখতাম না। আমরা জানতাম, আমাদের জীবনের সেই অধ্যায়টুকু তার সমস্ত ভালোমন্দ, লাভ-ক্ষতি দিয়ে জড়িয়ে রয়েছে একটা বিরাট জাতির জীবন-মরণের ইতিহাসের সঙ্গে। সেইখানেই ছিল আমাদের পরম সান্ত্বনা, আর সার্থকতার নিবিড় উপলব্ধি।

অনেক সময় ভাবতাম—জেলে যদি না আসতাম, কী হতে পারতাম? হয়তো ভালো করে এম.এ. পাস করতাম, একটা স্কলারশিপ নিয়ে বিদেশে যাওয়াও অসম্ভব ছিল না; তার পর ফিরে এসে একটা মোটা মাইনের চাকরি। কিন্তু জীবনের এই সোজা রাস্তা ধরে, জীবনের দেওয়া ফার্স্ট প্রাইজ হাতে নিয়ে, সকলের করতালিকে অভিবাদন জানিয়ে—জীবনের গোপন অতৃপ্তি কি ঘুচত, গভীর আকুতি কি মিটত? একটা লুকানো বেদনার কাঁটা ভিতরে ভিতরে কি নিজেকে ক্ষতবিক্ষত করে তুলত না? তার চেয়ে এ কি শতগুণে ভালো নয়? এই যে দেশের জন্য, মানুষের জন্য, যারা লড়াই করে চলেছে—তাদের পাশে চিরদিনের জন্য নিজের একটুখানি স্থান করে নেওয়া। এমনি করে পরম বেদনার মধ্য দিয়ে দেশের স্তূপীকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে যাওয়া। অনেকে প্রশ্ন করেন, "কী লাভ হল তোমাদের এতখানি কষ্ট স্বীকারে।"

উত্তরে বলি, "লাভ-লোকসান ঠিক জানি না ভাই, কিন্তু জান তো বায়রনের কবিতা—ইট্ ইজ সামথিং টু ফিল এ পেট্রিয়টস্ শেম।"

জেলে নিজেদের মধ্যে এক-এক সময় আলোচনা হত, বাইরে গিয়ে আবার আমরা কী করব? কল্পনা রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করে উত্তর দিত :

পুনর্বার তুলিয়া লইতে হবে কর্তব্যের ভার
যে পথে চলিতেছিনু আবার সে পথে
যেতে হবে।

তা ছাড়া বন্দীজীবনের নিজস্ব ক্ষতিপূরণও অনেক কিছু আছে বৈকি। মানুষকে

অন্তর্মুখী করে তোলবার এমন উপযুক্ত স্থান বুঝি আর নেই। চিন্তা আর কল্পনা, স্মৃতি আর স্বপ্ন, সমালোচনা আর আত্ম-বিশেষণ—এ-সবের অবকাশ বাইরে থেকে মানুষ কতটুকুই বা পায়? অথচ এদের দিয়ে বন্দীজীবন বিধৃত হয়ে থাকে। কাজেই বন্দীর মন সহজেই অনেকখানি গভীরতা লাভ করে—জীবনটা নিজের অজ্ঞাতসারেই অনেকখানি রসঘন হয়ে উঠতে চায়। বাইরের জগতের কার্পণ্য যত বেড়ে চলে, নিজের দাবি-দাওয়া-সব-কিছু নিজের কাছেই করতে হয়, আর তা মেটাতে নিজের মন সব সময় নিরাশও করে না। মনের গহনে কত মধু, কত অমৃত, কত নব নব অনুভূতির বিচিত্র সুর লুকানো থাকে—মনে হয় জেলে না গেলে বুঝি কোনোদিনও জানতে পেতাম না, বাইরের কোলাহলে সেগুলি আবৃত হয়ে থেকে যেত।

মানুষকে চেনারও এমন প্রকৃষ্ট স্থান বুঝি আর নেই। ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে, সীমাবদ্ধ আবেষ্টনীর মধ্যে মানুষের সব-কিছু নিঃশেষে ধরা পড়ে যায়। সেখানে সবাই সবার এত বেশি কাছে এসে পড়ি যে ভব্যতার ব্যবধান, সামজিকতার পর্দা সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর হয়ে এসে কিছুই গোপন করার আর উপায় থাকে না। সবটাই অবিশ্যি যে খুব বাঞ্ছনীয় বা প্রীতিকর তা বলছি না, অনেক সময়েই পরস্পরের উপর শ্রদ্ধা রক্ষা করা বেশ কঠিন হয়ে ওঠে। একটি বন্ধু যেমন একদিন বলছিলেন, "কাউকে যদি খুব ভালোবাসো, তার সঙ্গে জেলে এসে থাকতে চেয়ো না।"

কিন্তু আমার তো তা মানতে ইচ্ছা হয় না। ইচ্ছা হয় সব-কিছু নিয়েই মানুষকে গ্রহণ করতে শিখি, ফাঁকির আবরণের মধ্য দিয়ে যাকে পাই সে তো অসম্পূর্ণ মানুষ। সম্পূর্ণ মানুষকে শ্রদ্ধা করতে শেখা বা পারা—সেটুকুই তো আসল শ্রদ্ধা!

শুধু কি অন্যদের নিয়েই এত মুশকিল। নিজেকে নিয়েই যেন তার চেয়ে বেশি বিপদে পড়তে হয়। 'নিজেকে জানা'র চরম পরীক্ষা হয় জেলের ভিতর। নিজের সম্বন্ধে মানুষমাত্রেরই অতিরিক্ত মোহ থাকে। নিজেকে যা ভাবি তার মধ্যে বেশির ভাগই থাকে কল্পনারঞ্জিত। কিন্তু জেলে ও-সব মায়া বা মোহের স্থান নেই। সেখানে অন্যকেও যেমন ফাঁকি দেওয়া চলে না, নিজেকেও তেমনি আরো বেশি করে ফাঁকি দেওয়া চলে না। সমস্ত দুর্বলতা এখানে ধরা পড়ে যায়—নিজেকেও নতুন করে নতুন পরিচয়ে স্বীকার করে নেবার প্রয়োজন হয়।

তাই জেল থেকে যখন বেরুলাম, ঠিক যে-মানুষ ঢুকেছিলাম তার সঙ্গে আমাদের অনেক প্রভেদ রয়ে গেল। শুধু যে দুঃখের আগুনে পুড়ে, জেলের পাথরে ঘষা খেয়ে শক্ত হয়ে বেরুলাম তাই নয়—সুস্পষ্ট আত্মপরিচয়ের প্রবল সংঘাতও আমাদের অনেকখানি রূপান্তর ঘটিয়ে দিয়েছিল।

হিজলীর তিন বছর সাধারণ জেলজীবনের চেয়ে অন্যরকম ছিল। এখানে নিয়মের কড়াকড়ি অনেকখানি কম। তা ছাড়া অন্য রাজবন্দিনীদের সঙ্গও ছিল আমাদের কাছে পরম লোভনীয়। মাত্র দু-তিনজন একসঙ্গে থেকে থেকে আমরা কেমন যেন খাপছাড়া হয়ে পড়েছিলাম। এখানে এতগুলি জীবন্ত বুদ্ধিদীপ্ত মনের সংস্পর্শে এসে আমাদের

মনের অনেকগুলো মরচে-পড়া তারে সুর বেজে উঠল। আবার পূর্ণোদমে পড়াশুনা আরম্ভ করলাম। বাড়ি থেকে অনেক বই সব সময়ই আসত—বড়দার বহু যত্নের লাইব্রেরির প্রত্যেকটি বই-ই প্রায় জেলের মোটা মোটা স্ট্যাম্পের ছাপ আর অফিসারদের নানারকম হস্তাক্ষরে কলঙ্কিত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু মেদিনীপুরে বই পড়ার অবকাশ খুব বেশি হত না—সারাদিনের খাটুনিতেই সময় কেটে যেত। একসঙ্গে পাঁচখানার বেশি বই রাখার নিয়ম ছিল না—তাও অভিধানখানা বাদ না দিয়ে। এ নিয়ে প্রায়ই ঝগড়া হত। নানান ঝঞ্ঝাট। হিজলীতে কিন্তু এ-সব কড়াকড়ি ছিল না। বই এখানে ছিল অপর্যাপ্ত—বাড়ির বই তো রয়েছেই। তা ছাড়া ডেটিন্যুদের নিজেদের কেনা বইও ছিল, ইম্‌পিরিয়াল লাইব্রেরি থেকেও নিয়মিত বই আনানো হত। এতগুলো মনের মতো বই একসঙ্গে দেখে, অনেকদিনের উপবাসী মন যেন বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধায় চঞ্চল হয়ে উঠল। এক-একদিন সারাক্ষণই প্রায় বইয়ের মধ্যে ডুবে থাকতাম।

একদিন সন্ধ্যার পর ঘরে ঢুকতে গিয়ে দেখি শান্তি শ্রান্ত হয়ে হাত-পা ছড়িয়ে বসে রয়েছে। জিজ্ঞাসা করলাম, "কী হল তোমার?"

"কী আবার হবে? তোমার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পড়তে গিয়েছিলাম আর-কি! কিন্তু ও আর আমার পোষাবে না বলে দিচ্ছি বাপু!"

শুধু পড়াশুনাই নয়। নানারকম খেলাধুলা, গান, অভিনয়, প্রতিযোগিতা, তর্ক-আলোচনা—সব মিলিয়ে হিজলীটাকে আমরা ছোটোখাটো একটি 'শান্তিনিকেতন' করে তুলেছিলাম। প্রায়ই উৎসব লেগে রয়েছে—কখনো বর্ষামঙ্গল, কখনো রবীন্দ্রজয়ন্তী, কখনো বা বিজয়া-সম্মিলনী।

কিন্তু সেও কতদিন?

আবার আসতে থাকে ক্লান্তি, ধীরে ধীরে অবসাদের মেঘ মনের মধ্যে জমে ওঠে। এত আরামও যেন ভালো লাগে না। বলাবলি করে : "হলেও সোনার খাঁচা ভালো নাহি বাসি।" ক্রমে ক্রমে মনের উৎসাহ ম্লান হয়ে আসতে লাগল। পরস্পরকেও আর যেন ভালো লাগে না। কথা যেন সব ফুরিয়ে এল :

> স্মৃতি যাদুঘরে যতগুলো ছিল দ্বার
> উঘাড়ি উঘাড়ি দেখিনু বারম্বার
> ভালো নাহি লাগে আর।

বাইরের মাঠের চেয়ে ঘরের বিছানাটাই যেন অধিকতর প্রিয় হয়ে উঠল। যে বাইরে একটু বেশিক্ষণ থাকার জন্য—একটু দেরি করে দরজা বন্ধ করার জন্য জমাদারনী আর জেলারদের সঙ্গে কলহ লেগেই থাকত, সেই বাইরে যেতেই আর ভালো লাগে না! ঘরের দরজা খুলে দিয়ে গেলেও ঘরেই শুয়ে বসে দিন কাটাই—দেওয়ালের গায়ে মনের কথাটা লিখে রাখি :

> শুধু বড়ো ক্লান্ত লাগে,
> আলো বড়ো রূঢ় লাগে চোখে।

ডেটিন্যুদের অবস্থা আমাদের চেয়েও করুণ। আমরা জানি আমাদের জেলে থাকবার একটা নির্দিষ্ট সময় আছে। ওদের সব-কিছুই অনিশ্চিত। প্রতি মুহূর্তে ওরা আশা করছে—এই বুঝি ছাড়া পাবার খবর এল। সরকারের শনৈঃ পন্থার নীতি অনুসারে এক-একজন করে ওরা ছাড়াও পেতে লাগল। কিন্তু এ যেন সেই মস্ত বড়ো গাছের মস্ত বড়ো জালের মধ্যে একটিমাত্র ফুটো থেকে একটি একটি করে পাখি বেরুনোর ব্যাপার। ধৈর্য ধরে থাকা সহজ নয়।

আমাদের মধ্যেও কেউ কেউ অধৈর্য হয়ে পড়ছিল। দলের মধ্যে কল্পনা আর সুনীতিই সবচেয়ে আশাবাদী। কল্পনা তো প্রথম থেকেই হাত-মুখ নেড়ে কেবলই আমার কাছে প্রমাণ করে দিত, "পাঁচ বছরের বেশি আমরা কেউই জেলে থাকছি না, দেখে নিয়ো তুমি।"

বিশ বছরের বন্দিনীর মুখে কথাটা শুনে হাসি পেত, বলতাম, "কী করে বেরুবে?"

"নিশ্চয় কিছু একটা হবে, আর কিছুদিন দেখোই-না তুমি।"

শেষে সত্যিই তাই হল, কল্পনার 'কিছু-একটা'র আভাস কাগজেপত্রে একটু-একটু করে দেখা যেতে লাগল। মহাত্মাজী রাজবন্দীদের মুক্তির জন্য চেষ্টা করছেন এবং তার সঙ্গে রাজনৈতিক দণ্ডিত বন্দীদের কথাও বাদ দেন নি। সে সময় আমি আর উজ্জ্বল দিনাজপুর জেলে রয়েছি। হঠাৎ একদিন খবর এল কলকাতায় যেতে হবে।

"কী কারণ?"

"বলা হবে না।"

কিন্তু না বললেও বুঝতে আমাদের দেরি হয় না। তার আগের দিনও গান্ধীজী আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের বন্দীদের সঙ্গে দেখা করেছেন কাগজে দেখেছি। বোঝা গেল আমরাও শেষ অবধি বাদ পড়ছি না। এলাম কলকাতায়। খুব যে খুশি লাগছিল তা কিন্তু নয়। গান্ধীজী যে আমাদের উপর বিশেষ সন্তুষ্ট নন জানতাম। একেবারে তাঁর মুখোমুখি পড়ে যাব, কী জিজ্ঞাসা করবেন তিনি, কী আমরা বলব এইসব ভেবে মনটা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠছিল। আবার সেইসঙ্গে উত্তেজনাও কিছু কম অনুভব করছিলাম না। গান্ধীজী নিজে আসছেন আমাদের কাছে—মহাত্মা গান্ধী—কতদূরের মানুষ তিনি, কত উঁচুতে, কত বড়ো। কলকাতায় আসার পরদিন বিকেলে আমরা চা খাচ্ছি—এমন সময় শুনতে পেলাম জমাদারনীর কাংস্যনিন্দিত গলা : "ও বীণাদিদি শিগ্‌গির নেমে এসো গান্ধী এয়েছে।"

এ কী কাণ্ড। এমনিভাবে, এমন অতর্কিতে তিনি এলেন।

এমন অনাড়ম্বর নিঃশব্দ আগমন, এ কি গান্ধীজীকে মানায়। তিনি যেখানে যান, তার দুধারে কাতারে কাতারে লোক দাঁড়িয়ে যায়, তাদের হর্ষোদ্বেল কণ্ঠের জয়ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখর হয়ে ওঠে, তেমনি পারিপার্শ্বিকে বরাবর তাঁকে দেখে এসেছি। আর আজ তিনি নিজে স্বেচ্ছায় আমাদের অতিথি হয়ে এসেছেন। কোথায় তাঁকে বসাব আমরা, কোথায় তাঁর যোগ্য আতিথ্যসম্ভার।

ত্রস্তপদে দুজনে নিচে নেমে এলাম। এসে দেখি আমরা না করলেও, আমরাও যাঁর

অতিথি সেই সরকার থেকে যথোচিত ব্যবস্থার ত্রুটি হয় নি। নিচের হাসপাতালের ঘরটি ধোওয়া-মোছা পরিষ্কার, সমস্ত আসবাব-মুক্ত—কেবল একটিমাত্র আস্তরণ বিছানো। আর তারই ওপর বসে গান্ধীজী ও আর একজন সৌম্যমূর্তি পুরুষ। আমরা গিয়ে প্রণাম করলাম আগেই গান্ধীজী নিজেই দু'হাত জোড় করে হাসিমুখে আমাদের ডেকে নিলেন, মহাদেব দেশাই-এর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তার পর ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করতে আরম্ভ করলেন, কী আমরা ভাবছি, বাইরে গিয়ে আমরা কী করব, নিজেদের পথ ভুল মনে করি কি না, ইত্যাদি।

সংক্ষেপে নিজেদের বক্তব্য বলবার চেষ্টা করলাম। বললাম, "বাইরে গিয়ে কী করব, এখনই কী করে বলি? দেশের অবস্থা বুঝে, নিজেদের পথ ঠিক করে নিতে হবে তো। আর হিংসা-অহিংসা আমাদের কাছে চিরদিনই তো যুক্তি-উপযোগিতার প্রশ্ন, আপনার মতো ধর্ম হিসেবে তো নিতে পারি নি। সেও নির্ভর করবে দেশের প্রয়োজনেরই উপর।" মনে মনে আশঙ্কা ছিল গান্ধীজী রাগ করবেন, করলেন না। স্নিগ্ধ প্রসন্নতায় মুখখানি উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, বললেন, "এমন খোলাখুলিভাবে কথা বলায় বড় সুখী হলাম। কিন্তু তর্কের সময় তো এটা নয়। তোমরা বাইরে চলো, বাইরে গিয়ে আবার আমার সঙ্গে দেখা হবে—তখন আলোচনা করব।"

মহাদেব দেশাইজী বললেন, "সেই-ই ভালো, বাইরে গিয়ে তোমরা গান্ধীজীর মতবদল করতে চেষ্টা করবে এবং গান্ধীজী তোমাদের।" আমরা হেসে উঠে বললাম, "কিন্তু গান্ধীজীর মতবদল করবার আশা তো আমরা একেবারেই রাখি না। মহাত্মাজী, আপনিও কি আশা করেন আমাদের বদলাতে পারবেন?"

গান্ধীজী হাসলেন, বললেন, "জান না বুঝি? আমি কখনও নিরাশ হই না।"

অল্প কিছুক্ষণ পরেই তাঁরা চলে গেলেন।

বিকেলে মেট্রন এলে আমরা গল্প শুনলাম : অফিসে আজ সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। গান্ধীজী ভিতরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে সুপারিনটেণ্ডেন্ট থেকে আরম্ভ করে অফিসশুদ্ধ প্রত্যেকটি লোক উঠে দাঁড়াল।

জিজ্ঞাসা করলাম, "কিছু কথাবার্তা হল কি?"

"না, সেটাই আরো আশ্চর্য। সমস্ত অফিসে একেবারে নিস্তব্ধ নীরবতা!"

মনে মনে ছবিটা ভাবতে অবাক লাগল। জেলের অফিসের একই মূর্তি দেখে এসেছি—কর্কশ, কোলাহলময় ব্যস্ততা, যন্ত্রচালিত ব্যবহার। তার মধ্যে কোথায় লুকিয়ে ছিল এত শ্রদ্ধা, এত সম্ভ্রম, এতখানি নিস্তব্ধতা?

গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা হবার ঠিক এক বছর পরেই আমরা সকলেই মুক্তি পেলাম।

ভিকি বাউমের 'গ্র্যাণ্ড হোটেল' উপন্যাসে একটা ঘুরন্ত ফটকের বর্ণনা আছে। সকালবেলা সেই দরজা দিয়ে যারা ঢুকল, পরের দিন ঠিক সেই মানুষ একটিও আর সে দরজা দিয়ে বেরুল না। একটি দিন একটি রাত্রির মধ্যে প্রত্যেকটি মানুষের জীবন সম্পূর্ণ তোলপাড় হয়ে গেল, ঘটে গেল অভাবনীয় পরিবর্তন। একটি দিন, একটি রাত্রি অবিশ্যি নয়—তবু জেলের দরজার দিকে তাকিয়ে ঐ ঘুরন্ত ফটকের কথাই মনে পড়ত। মনে হত : যে মানুষগুলো একের পর এক ঐ দরজা অতিক্রম করে প্রাচীরের অভ্যন্তরে ঢুকেছিল, একদিন ঐ দরজাই আবার তাদের এক-এক করে বার করে দিচ্ছে। কিন্তু যাদের বার করে দিল, তারা কি সেই একই মানুষ? জন্মান্তর কি ঘটে নি তাদের জীবনে? ভিতরে-বাইরে সমস্ত দেহমনে ঘটে নি কি প্রকাণ্ড রূপান্তর? প্রিয়-পরিজন যে বুকের ধনকে আচমকা হারিয়ে ফেলেছিলেন, ঠিক তাকে তেমনি করে কি আর ফিরে পেলেন? বন্ধুরা বিজয়-তিলক পরিয়ে 'দুঃসাহসী-ভ্রমণের পথে' যাকে সসম্মানে এগিয়ে দিয়ে গিয়েছিল, জয়-যাত্রার শেষে সে যখন ফিরে এল তখন কি আর তাকে চেনা যায়? শ্রান্তির ম্লানিমায় কপালের জয়তিলক মুছে যায় নি কি? রঙিন উত্তরীয় কি তার আজ শতছিন্ন হয়ে পড়ে নেই?

জেলে প্রথম যখন আমরা ঢুকি, অন্য ব্যাপারে যত অমিলই থাক্ একটা জিনিস প্রায় সকলেরই ছিল—সেটা হচ্ছে প্রচুর স্বাস্থ্যের ঐশ্বর্য। অথচ বেরিয়ে যখন এলাম, আমাদের মধ্যে বেশিরভাগই জীবনের ঐ পরম সম্পদটুকুই হারিয়ে এসেছি।

এক-এক সময় মনে হত আমাদের কর্তৃপক্ষ যেন এরইজন্যে পথ চেয়ে থাকতেন। শুধু জেলখানার চিকিৎসা-বিভ্রাটের কথা বলছি না। অসুখের প্রথমস্তরে ছেড়ে দিলে যেখানে জীবনটা রক্ষা পেয়ে যায় সেখানে তাঁরা প্রতীক্ষা করে থাকতেন, কখন ব্যাধি একেবারে দুরারোগ্য হয়ে পড়বে। ঠিক সেটাই ছিল তাঁদের পক্ষে মুক্তি দেবার সুবর্ণ সময়। জেলের মধ্যে মৃত্যু হবার দায়িত্বও তাঁরা এড়িয়ে গেলেন, অথচ বেঁচেও সে আর বেশিদিন থাকছে না—এটাও নিশ্চিত জেনে নিলেন। তবু এও আমাদের কাছে ছিল মন্দের ভালো। অন্তত শেষ নিশ্বাসটুকু খোলা আকাশের নিচে, প্রিয়-পরিজনদের স্নেহের বেষ্টনীর মধ্যে পড়ুক—এটুকু আমাদের কম কাম্য ছিল না।

জেলে একদিন যে-সব মেয়ে ঢুকেছিল, অপর্যাপ্ত স্বাস্থ্যে ঝলমল দেহ, বুদ্ধিতে উদ্দীপনায় উজ্জ্বল মুখ নিয়ে—তারাই এক-এক করে বেরুল কেউ স্ট্রেচারে শুয়ে মরণাপন্ন অবস্থায়, কেউ বা জমাদারনীর হাত ধরে টলতে টলতে। বাইরে গিয়ে তারা কেউ বা পৃথিবী থেকে শেষ বিদায় নিয়ে চলে গেল; কেউ বা বেঁচে রইল পঙ্গু দেহের দুর্বিষহ ভার টেনে টেনে। জেলের মধ্যেই রয়ে গেল তাদের বিকাশোন্মুখ জীবনের সমস্ত সম্পূর্ণ আশা, স্বপ্ন আর কামনা।

এ-ছাড়াও—স্বাস্থ্যহানি ছাড়াও—জেলের ভিতর সমস্ত জীবনকে ওলট-পালট করে দেয় এমন কত কীই ঘটত। জেলের ভিতর বসে বসে আমাদের মধ্যে কেউ শুনেছে

মা'র মৃত্যুসংবাদ; কেউ বা পেয়েছে জীবনের চিরসঙ্গী একটিমাত্র ছোটোবোন বা ভাইকে হারানোর খবর। আমাদের মধ্যে একজন ছিলেন বয়সে আমাদের চেয়ে অনেক বড়ো। বাইরে থেকে তাঁর স্নায়ুর দৃঢ়তাই আমাদের চোখে পড়ত, কোনোদিন কোনো অবস্থাতেই তাঁকে বিচলিত বা দুর্বল হতে দেখি নি। জেলের মধ্যে একদিন তাঁর মা'র মৃত্যুসংবাদ এল। কাছে গিয়ে দেখি কী আকুল তাঁর কান্না, ছোটোমেয়ের মতো কেবলই বলছেন, "মা, মাগো, কোনো কথাই কোনোদিন যে তোমার শুনি নি। রাগ করেই কি চলে গেলে?" সাধারণ লোকের চোখের জল তত বিচলিত করে না, কিন্তু এমন শক্ত মানুষের এমন করে ভেঙে পড়া সহ্য করা যায় না যেন!

এইসব আধি-ব্যাধি-মৃত্যুর অভিশাপ ছাড়াও অনেক কারণ ছিল যার জন্য মুক্তি পাবার কল্পনাটা আমাদের সব সময় অনাবিল আনন্দমেশানো ছিল না। আশঙ্কা হত : কী জানি কিসের মধ্যে গিয়ে পড়ব! এতদিনের ব্যবধান, পিছিয়ে পড়েছি হয়তো সবদিক দিয়েই। সব-কিছুই হয়তো বদলে গিয়েছে। খাপ খাওয়াতে পারব কি না কে জানে! তার চেয়ে এই তো বেশ আছি, এই তো বেশ বিষাদে-বেদনায় জড়ানো আমাদের নিজস্ব জগৎ!

আমাদের এই মনোভাব যেন খাঁচার পাখির অসীম আকাশে ডানা মেলে দেওয়ার ভীতি! খাঁচার লোহার শিকে মাথা খুঁড়ে খুঁড়ে মরবে তবু খাঁচা খোলা পেয়েও বেরিয়ে যেতে চায় না! শেষ পর্যন্ত অবিশ্যি আমাদের জীবনে আশঙ্কার আর অন্ধকারেরই জয় হয় নি। জীবনদেবতার অভয় শঙ্খ আবার আমাদের আলোর মাঝে, মুক্তির মাঝে, টেনে নিয়ে এল। সামনে অন্তহীন পথ উন্মুক্ত করে বলল এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো, চলা আজও তোমাদের শেষ হয় নি। পথের শেষে আজও পৌঁছও নি। তোমাদের অসমাপ্ত কাজ সম্পূর্ণ করো। যারা জীবনের ব্রত অসম্পূর্ণ রেখে মরণের পরপারে চলে গিয়েছে তাদের—তোমাদের সেই হারানো সঙ্গীদের—ধুলায় লুটানো নিশান আবার তোমরা হাতে তুলে নাও। 'অনওয়ার্ড। ওভার দি গ্রেভ্‌স্ অব ইওর কমরেডস্।'

আমি অবিশ্যি বাইরের সঙ্গে সবচেয়ে সহজ যোগসূত্র খুঁজে পেলাম বাড়ির মধ্যে। আমাদের পরিবারে তখনও মৃত্যুর দূত এসে ঢোকে নি। তখনো সমস্ত বাড়িটি স্নেহে মাধুর্যে আনন্দে পূর্ণ হয়ে রয়েছে—যেটুকু ফাঁক ছিল আমি ফিরে আসায় পূর্ণ হল। বাবা-মা'র মুখে আবার হাসি ফুটে উঠল, চলল আবার আগের মতোই সহজ জীবনযাত্রা। এক-একসময় মনে হত কোনোদিনই বুঝি কোথাও ছেদ পড়ে নি, মাঝের ক'টা বছর নিশ্চয় একটা দুঃস্বপ্ন।

মা কেবলই জেলখানার খুঁটিনাটি প্রশ্ন করতেন—কী খেতাম, রুটিগুলো কত মোটা হত, দুধ দিত কতটুকু, মাথার সব চুল এমন করে উঠে গেল কেন, বড্ড খারাপ তেল দিত বুঝি? বাবা কিন্তু কিছু শুনতে চাইতেন না, বলতেন, 'থাক্‌গে বাপু ও-সব গল্প—জেলের নাম শুনতেও আমার ভালো লাগে না।"

বাড়িতে কিন্তু পরিবর্তন হয়েছে অনেক : ছোটোরা তাদের স্বভাব-ধর্মে বড়ো হয়েছে,

নতুন জামাই এসেছে, নতুন শিশুর আবির্ভাব হয়েছে। সবচেয়ে ছোটো যে ভাইটি—যার সঙ্গে ক্ষেপানোর আর ঝগড়া করার সম্পর্কই ছিল আগে, সে এখন বুদ্ধিদীপ্ত পরিণত মন নিয়ে বন্ধুত্বের দাবি নিয়ে পাশে এসে দাঁড়াতে চায়, আমার জীবনের সুখদুঃখের অংশ নিতে চায়, আমাকেও পেতে চায় নিজের সঙ্গী হিসেবে, পরামর্শদাতা হিসেবে।

একদিন বড়ো মজা হয়েছিল। বারান্দায় বাবার সঙ্গে বসে গল্প করছি, এমন সময় হঠাৎ সিঁড়ি দিয়ে সুন্দর-সুন্দর শাড়ি-জামা-পরা ফুট্‌ফুটে কয়েকটি মেয়ে উঠে আমার কাছে এসে দাঁড়াল, প্রণাম করবে কি না ইতস্তত করছে। থতমত খেয়ে ভাবছি কারা এরা—বাবা পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন না কেন! একটু পরে নিজেরাই ওরা পরিচয় দিল, "ছোটোমাসি, চিনতে পারছ না আমাদের?"

সম্বোধনের মধ্য দিয়ে পরিচয় পেলাম। সাত বছর আগে পাঁচ-ছ'বছরের ফ্রকপরা ছোট্ট খুকী ছিল যারা, কেবলই যারা 'ছোটোমাসি কোলে করো' বলে আবদার ধরত—কেমন করে জানব তারাই এমন 'ইয়ং লেডি' হয়ে উঠেছে! বাবা বললেন, "কল্পনাশক্তি নেই কেন তোর? বুঝে নেয়া উচিত ছিল।"

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ভাবলাম, "তা হয়তো ছিল, কিন্তু আমি যে ছাই মনে মনে সেই ছোট্ট খুকীদেরই আবার ফিরে পাবার প্রতীক্ষা করে ছিলাম।"

আস্তে আস্তে পুরোনো বন্ধুদেরও সন্ধান আরম্ভ করলাম। খুব বেশি ভাব ছিল যাদের সঙ্গে, ভবিষ্যৎটা যাদের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলেছিলাম, কাউকেই তাদের আর খুঁজে পাই না। শান্তি (দাশগুপ্ত) তখন বিলেতে। কে যেন বলল, "ও শিগগিরই ফিরবে, তোর ভাবনা নেই।"

মুখে বললাম, "আহা ভেবে তো আমি অস্থির হচ্ছি!" কিন্তু বিলেত থেকে শান্তি যখন ফিরে এল, মনে মনে কেবলই ভাবি—এখনও দেখা করতে আসে না কেন? চাইতাম খোঁজ নিতে—কিন্তু জিগ্‌গেস করে পাঠাতে লজ্জা হয়। শেষে নিজেই সে একদিন খবর দিল, সিকিউরিটি হিসেবে কিছু টাকা পুলিশে তার জমা দিতে হয়েছিল, সেটা ফিরে না পাওয়া পর্যন্ত দেখা করতে পারছে না।

টাকাটা ফিরে পাবার পর দেখা যেদিন হল চেনাই যায় না ওকে। আগের চেয়ে অনেক উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। উচ্ছল! স্মার্ট্! এত অনর্গল কথা বলতেও শুনি নি আগে! তবু ভারি ভালো লাগল ওকে। অনেকদিন পরে দুজনে মিলে মন খুলে হাসলাম, গল্প করলাম। যাবার সময় বলে গেল, রাজনৈতিক কাজ বিশেষ সে আর করবে না, শিক্ষার কাজটাই ভালো করে করবে। কথাটা কানের মধ্যে ছ্যাঁক করে গিয়ে লাগল। মনে পড়ল, কলেজে যখন ও পড়ত, সবাই বলত ওর মধ্যে লুকনো আছে চাপা আগুন। সেই মেয়ে আজ অনায়াসে বলে গেল কিনা রাজনৈতিক কাজ বিশেষ আর সে করবে না! শুনতে কেমন অদ্ভুত লাগল। মনের মধ্যে ঢুকতে ইচ্ছে করল ওর। সুহাসিনীর রাজনৈতিক কাজ ছাড়াও এইরকম একটা অদ্ভুত ব্যাপার। তার চেয়েও আশ্চর্য ওর জেলে না-যাওয়াটা। পুলিশের জাল যখন নির্বিচারে সবাইকে ছেঁকে তুলে নিচ্ছিল, ও

কী করে সেটা এড়িয়েছিল, ভাবতে আশ্চর্য লাগে। জেলে যাওয়াই ওর বোধ হয় ভালো ছিল। গেলে দেশের কাজে হয়তো আস্থা হারাত না। এখন সুহাসিনী বিয়ে করে সংসারী হয়েছে। বেশ সুখে আছে ও। কিন্তু শুধু সংসারেই যেন ওকে মানায় না। সুহাসিনী দেশের জন্য অনেক কিছু করতে পারত, বেশ সম্ভাবনা ছিল ওর। মনে পড়ে পুরোনো দিনের কথা—কী তীব্র ছিল ওর আগ্রহ আর অনুভূতি। মাঝে মাঝে কিছু কাজ হচ্ছে না, কিছু করতে পারছি না বলে যখন নিরাশ হয়ে পড়তাম, ও-ই আমাদের উৎসাহ জোগাতো।

পুরোনো আর-একটি বন্ধুর খবর পেলাম, তার আর আমার ভালো নাম আর ডাক নাম দুটোই ছিল এক। স্কুলে একসঙ্গে পড়েছি, বি. এ. পড়ার সময় শরীর খারাপ হওয়ায় কলেজ ছেড়ে দেয়। সহকর্মী হিসেবে কোনোদিনই সে যোগ দেয় নি; কিন্তু মন দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে, সহানুভূতি দিয়ে সব সময় আমায় ঘিরে রাখত। আমাকে নিয়ে তার ভাবনারও শেষ ছিল না—কখন কী করে বসি! বাবার কাছে শুনলাম, জেলে যাবার পর প্রায়ই সে আমার খোঁজ নিত, কবে বেরুবে জানতে চাইত। কিন্তু দেখা তার সঙ্গে আর হয় নি। জেল থেকে বেরিয়ে আসার মাস তিনেক আগেই সে মারা গেছে।

রুনুর খবর পেলাম। রুনুর বাবা হঠাৎ মারা গেছেন, সমস্ত সংসারের দায়িত্ব তার মাথায় এসে পড়েছে। এম. এ. আর পড়তে পারে নি, চাকরিতে ঢুকে ছোটো-ভাইবোনদের মানুষ করে তুলছে, মাকে শান্তি দিয়েছে। কর্তব্যে অচল, উচ্ছ্বাসহীন, ধীর, সংযত রুনু—মনে মনে চিরকালই ওকে শ্রদ্ধা করে এসেছি, এখন সে-শ্রদ্ধা আরো দৃঢ় হল। চিঠি লিখে জানাল : "জীবনটা এভাবে আর ক'দিন কাটবে জানি না। স্বেচ্ছাবৃত জীবন, ক্ষোভ করবার কিছুই নেই—ব্যস্তও হই না। জানি একদিন এর শেষ হবে, ভাই-বোনেরা মানুষ হয়ে উঠবে। সেদিন ইচ্ছা রইল আমার তোমাদের পাশে গিয়ে দাঁড়াব।"

সবশেষে দেখা করতে এল : 'চোখের জল'। এত দেরি! অভিমানে দুঃখে মনটা ভেঙে পড়েছিল প্রায়। কিন্তু যেদিন এল সমস্ত অভিমান নিঃশেষে মুছে দিয়ে মনটাকে কানায় কানায় ভরে দিয়ে গেল। এ শুধু 'চোখের জল'ই পারে! একটু বদলায় নি ও, মনে মনে অন্তত একটুও সংসারী হয় নি। তেমনি স্নিগ্ধ আছে, তেমনি মাধুর্যে ভরা। পারিপার্শ্বিকের বহু পরিবর্তন ওর মনে একটিও দাগ কাটে নি। স্বামী, মেয়ে, শ্বশুর, শাশুড়ি, সংসার—সব নিয়ে ও ব্যস্ত, খবরও নেয় না বেশি। তবু ওর কথা মনে পড়লেই মনে হয় একান্ত আপন, একান্ত মধুর একটা জায়গা সংসারে আজও আমার জন্য রয়ে গিয়েছে।

বাইরে এসে একটি বন্ধুকৃত্য তখনও বাকি ছিল। প্রিয়বন্ধু—পথের সাথী—পথের মাঝেই হারিয়ে গেছে, তার মা'র সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া। কী মুখ নিয়ে নীনার মা'র সামনে গিয়ে দাঁড়াব ভেবে পেতাম না। নীনা আমার কিছুদিন পরে জেলে গিয়ে ঢুকেছিল—অটুট স্বাস্থ্য, আনন্দ আর উৎসাহভরা মন নিয়ে। আনন্দ পাবার আর আনন্দ

দেবার ক্ষমতা ওর ছিল অসাধারণ। নীনা কাছে থাকাতে জেলখানাও আমার কাছে একান্ত আনন্দের জায়গা হয়ে উঠেছিল। কিন্তু বছর খানেক যেতে-না-যেতেই ওর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে। জেল থেকে কিছুতেই বেরুতে চাইত না, আর তার কারণ ছিলাম আমি। নীনা ছিল ডেটিন্যু, অসুস্থ শরীরের নজির দিয়ে ভালো করে লেখালেখি করলে ওর পক্ষে বাড়িতে বন্দী থাকা অসম্ভব ছিল না। কিন্তু কিছুতেও ওকে দিয়ে দরখাস্ত করানো যেত না, বলত, "একবার চলে গেলে তোর সঙ্গে আর তো সহজে দেখা হবে না!" এমনি জেদ করে করে যখন বেরুলো—ব্যাধি ততদিনে সাংঘাতিক হয়ে উঠেছে। মার কাছে যখন ফিরল, কোনো স্নেহবন্ধন দিয়েই ওকে আর বেঁধে রাখা গেল না। ওকে হারানোর জন্য বিঁধে রইল কটা অনুশোচনার কাঁটা। আর, সেজন্যই ওর মার কাছে যাওয়া আমার পক্ষে এত কঠিন ছিল।

তবু শেষ অবধি গেলাম। কন্যাহারা মায়ের বুকে মাথা রেখে নিজের বুকের বোঝা লাঘব করে এলাম খানিকটা। তিনিও বললেন, "আবার এসো বীণা, তোমার মধ্যে আমার নীনাকেই আমি খুঁজে পাই।"

আমারও যেন তাইই মনে হয়। নীনার মৃত্যুর পর ওকে হারানোর প্রচণ্ড ক্ষতিটাই সমস্ত জীবনকে কালো করে তুলেছিল। আজ কিন্তু সেই হারানোর ব্যথাকে ছাপিয়ে জেগে রয়েছে ওকে পাওয়ার অমলিন আনন্দের রেখা। আজও মনে হয় ও হারায় নি, ও মরে যায় নি। ও আজও বেঁচে আছে, শুধু আমার স্মৃতির মধ্যে নয়, আমার ভালোবাসার মধ্যে—আমার জীবনের প্রবাহিত ধারায়।

৮

বাইরে আসার প্রথম উত্তেজনার ধাক্কাটা কেটে যাওয়ার পর সমস্যা দাঁড়াল—কী এবার করব। বাবা দু-একবার মৃদু ইচ্ছা জানালেন, "এম. এ.-টা দিয়ে দিবি নাকি?"

এই ব্যাপারে বাবার বড়ো দুর্বলতা ছিল। জানতাম আমাকে ঘিরে তাঁর প্রকাণ্ড আশা ছিল, দোকানে ভালো বই দেখলেই আমার জন্য কিনে আনতেন, ছোট্টবেলা থেকে নিজের হাতে আমাকে সব-কিছু শিখিয়েছেন। আজও আঘাতের পরও মনের মধ্যে একটু ক্ষীণ আশা তাঁর রয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এম. এ. পড়তে আর আমার ইচ্ছা ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে আমার সম্বন্ধটা একটু নতুন ধরনের! সেখানে ছাত্রী হিসাবে আর ঢুকতে ইচ্ছা হয় না। কোথায় যেন মনে হয় ভারি একটা ছন্দপতন হবে, ইংরাজিতে যাকে বলে 'বেথস্'।

বাড়িতে কারো কারো ইচ্ছে বিদেশে ঘুরে আসি। কয়েকজন চেষ্টাও করেছিলেন। এই সময় একান্ত অপ্রত্যাশিত জায়গা থেকে একখানি চিঠি এল। লিখেছেন মহামতি এণ্ড্রুজ সাহেব : 'আমি বাইরে এসেছি খবর পেয়ে জিজ্ঞেস করেছেন, কেমন আছি, কী আমি করব, বাইরে কোথাও পড়তে যেতে চাই কি না।

নিতান্ত আশাতীত জায়গা থেকে এই স্নেহের স্পর্শ পেয়ে মনটা অভিভূত হয়ে উঠল। এটা ঠিক আশা করতে পারি নি। পরে বাবার কাছে শুনলাম, যখন আমাদের আন্দামান যাবার কথা হয়, মা-বাবা অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়েন। সে-সময় যাঁদের চেষ্টায় আমাদের (মেয়েদের) আন্দামান যাওয়া বন্ধ করা হয়—তাঁদের একজন রবীন্দ্রনাথ, আর-একজন এন্ড্রুজ।

চিঠির উত্তরে লিখলাম, "বাইরে যাওয়ার ইচ্ছা একেবারে যে নেই তা নয়। যদি সুবিধা হয় নিশ্চয়ই যাব। এ বিষয়ে আপনার সাহায্য পেলে ধন্য হব।" সুবিধা অবিশ্যি আর হয় নি। ১৯৩৯ সালের এপ্রিল মাসে এ-সব আলোচনা চলে। সেই বছরই সেপ্টেম্বরে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আরম্ভ।

কোনো কিছুই যখন ঠিক হচ্ছিল না, তখন আপাতত ঠিক হল, এই অবসরে শরীরটা একটু সারিয়ে তোলা উচিত। মেজদি তখন মুসুরিতে চেঞ্জে গেছেন, সাদর নিমন্ত্রণ পাঠালেন। অতএব সেখানেই যাওয়া স্থির হল।

সম্পূর্ণ এক নতুন ধরনের আবহাওয়ায় এসে পড়লাম। মেজদি তো আমারই মেজদি, ওদের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু মুসুরি পাহাড়ের সেই হোটেলে যে-সব মহলের মধ্যে আমাদের থাকতে হচ্ছিল তারা সম্পূর্ণ অন্য জগতের মানুষ। এই ধরনের জীবনের সঙ্গে পরিচয় ছিল না। দূর থেকে এদের দেখে বিদ্রূপ করেছি, তাচ্ছিল্য করেছি, অশ্রদ্ধা করেছি। কাছে গিয়ে যে অভিজ্ঞতা লাভ হল তা আর মর্মান্তিক। কাল্‌চারাল্ কন্‌কোয়েস্ট যে কত শোচনীয় হতে পারে, আগে এতটা বুঝি নি। এদের এই পরের অনুকরণ—চুলচেরা অনুকরণের মধ্যে আমার চোখে পড়ত খালি পরাধীনতার গ্লানি। এরা বিলাতী ধরনে হাসে, বিলাতী ধরনে কাশে; বিলাতী ধরনে খায়, বিলাতী ধরনে শোয়, বিলাতী ধরনে ভাবে। যা-কিছু দেশী সবতাতেই তাদের দারুণ লজ্জা আর অপমান। বুদ্ধি এমনই ঘোলাটে যাদের, সুন্দর-অসুন্দর মানান-বেমানান জ্ঞানই বা তাদের থাকবে কী করে? উৎকট ওদের সাজসজ্জা, উৎকট ওদের আমোদ-প্রমোদ, আরো উৎকট ওদের মর্যাদাবোধ! শুনলাম এদের মধ্যে যাদের মেম স্ত্রী, তাদের স্ত্রীরা রোজ রাতে ইওরোপিয়ন ক্লাবে যায়, স্বামীরা বাইরে দাঁড়িয়ে দরোয়ানের কাজ করে, কারণ ভারতীয়দের সেখানে প্রবেশ নিষেধ। পত্নীভক্তির চরম পরাকাষ্ঠা আর কি!

আশ্চর্য লাগত ভাবতে, দেশের এরাই হচ্ছে সবচেয়ে উচ্চ-শিক্ষিত শ্রেণী। বিদ্যাবুদ্ধি আর অর্থের জোরে সমাজের সবচেয়ে উচ্চশিখরে নিজেদের স্থান করে নিয়েছে। কত সুযোগ এদের, সংগতি আর সময়। অথচ জীবনে কিছুই এরা গভীরভাবে দেখল না। শুধুই পার্টি আর ডিনর, ফ্যান্সি ড্রেস অর বল-ডান্স, স্কেটিং, ব্রিজ আর টেনিস্। নিজেদের সমাজের বাইরে ভুলেও তাকাবার সময় নেই। যত সব অশিক্ষিত আন্‌কালচার্ড গোরু-ছাগলের দল! এ-সব লোকের বাঁচা-মরায় কী এসে যায় ওদের?

ভবিষ্যৎ? ভবিষ্যতের কি খবর রাখে ওরা? এই বর্তমানই ওদের অনন্ত। এর বদল এরা ভাবতেও পারে না—চাওয়া তো দূরের কথা। একাধিক শতাব্দীর ইংরাজ-শাসনের

ধারা কোনোদিন শুকিয়ে যাবে এ ওদের কল্পনারও অতীত। ইংরেজ চিরদিনই থাকবে—থাকবে তাদের আই. সি. এস্., জজিয়তি, স্টক এক্স্চেঞ্জ।

ইতিহাস? ভাগ্যের নির্মম গতিচক্র? কে ও-সব নিয়ে মাথা ঘামায়! ও-সব পড়াশুনা ভাবনা-চিন্তা গরীব লোকেদের জন্য। আর ওই-সব পড়েই তো মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে একদল দায়িত্বজ্ঞানহীন ছেলের দলের। যা খুশি তাই করছে। কতগুলো মেয়েও আবার আজকাল ওদের দলে জুটেছে। দেশটা রসাতলে যাবার আর বাকি রইল কী! বলা বাহুল্য, আমি ওদের মধ্যে ছিলাম অজ্ঞাত। স্বপ্নেও ওরা ভাবতে পারত না, ওদের খাবার টেবিলের একধারে চুপচাপ বসে যে মেয়েটি কাঁটাচামচ আর টেবল-ম্যানার্স নিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছে, অথবা সময় সময় ওদেরই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ব্রিচেস্ পরে ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে বেরুচ্চে, মাত্র কিছুদিন আগেও এই মেয়েটিই ছিল ইংরেজ বন্দীশালার একজন প্রধান অতিথি, মাত্র কয়েক বছর আগে এরই কথা কাগজে পড়ে নিন্দের আর সমালোচনার বান ডেকে গিয়েছিল এদের খাবার টেবিলে-টেবিলে আর টেনিসের লনে-লনে। এক-একসময় ভাবতাম যদি ওদের কাছে নিজের পরিচয় দিই, কী হবে? কী করবে ওরা? হয় আমাকে তৎক্ষণাৎ সরাবার ব্যবস্থা করবে, নয় নিজেরাই পালাবে হোটেল ছেড়ে! বেচারারা! এক-একসময় মায়াও লাগত। নিজেদের এত ঐশ্বর্য গড়ে তুলেছে শুধু বিদেশীর অনুগ্রহের উপর। মুখে যত আস্ফালনই করুক, মনে মনে সে কথা ভোলে কী করে? তাই তো এত ভয়, এত আতঙ্ক, তাই-ই কিছুই তলিয়ে ভেবে দেখতে চায় না! এদের ছেলেরা—শিবু, নীলমণি, চিনু, সবাই এক-একটি ছোটোখাটো সাহেব। তবু ওর মধ্যে কমলকে (আসল নামটা একটু বদলে নিলাম) একটু ভালো লাগত। তার সাহেবিয়ানাটা অত উৎকট নয় যেন। যেন বাইরের বেশটা ওর শুধুই একটা আবরণ। ভিতরে কিছু আছে মনে হয়—একটু অনুমতি, একটু নির্ভেজাল চিন্তার ক্ষীণস্রোত। মাঝে মাঝে আমার ঘরে আসত, এ-বইটা সে-বইটা টানত, বলত, "জীবনটা ভারি বোরিং, নয়? আমি তো এরই মধ্যে ফেড-আপ্ হয়ে গেছি।"

এই আবহাওয়া থেকে ওকে বার করে আনতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু পারা যাবে কি? ওর ভবিষ্যৎ তো ছক কাটা : আসছে বছর বি.এস্‌সি. পাস করবে, তার পর যাবে বিলেত। সেখানে গিয়ে হয় আই.সি.এস্. নয়তো ব্যারিস্টারি।

বছর খানেক পরে আরএকবার ওর খবর পাই। কোন্ একটি মেয়ের সঙ্গে বিয়ে প্রায় ঠিকঠাক করে শেষে ভেঙে দিয়ে চলে গেছে। বন্ধুদের বলে বেড়াচ্ছে : "আমাকে ও স্রেফ্ জোঁকের মতো আঁকড়ে ধরেছিল।" কথাটা শুনে মনে হল এ তো সেদিনের সেই কমলের কথা নয়। এরই মধ্যে এতখানি বদলে গেছে!

কিন্তু এ তো গেল মুসুরি পাহাড়ের একটা দিক : চিরশুভ্র হিমালয়ের পাদদেশে ক্ষুদ্রতা আর হীনতার কথা। হিমালয়ের যে শিখর আকাশ স্পর্শ করেছে সে শিখরে কিন্তু নিত্য নব-নব সৌন্দর্যের লীলা, অন্তহীন বৈচিত্র্যের বিপুল আয়োজন। সুযোগ পেলেই চলে যেতাম কোনো একটি ছায়ায় ঘেরা জনমানবহীন জায়গায়। চারদিকে

প্রগাঢ় নির্জনতায় সবুজ পাহাড়ের উত্তাল তরঙ্গ স্তব্ধ হয়ে রয়েছে। আশেপাশে দুরন্ত মেঘের দল, আকাশ স্নেহভরে মাথা নত করে এসেছে। বড়ো বেশি কাছে মনে হয়—মনে হয় যেন মুঠো করলেই ধরতে পারব আকাশের কোমল নীলাঞ্চল!

প্রকৃতির শুশ্রূষার জন্যেই হোক, বা মেজদির অফুরন্ত যত্নের জন্যেই হোক—যখন ফিরে এলাম হৃতস্বাস্থ্য অনেকখানি ফিরে পেয়েছি, মনটাও অনেক পরিমাণে প্রকৃতিস্থ। কিন্তু বেশিদিন রেহাই পেলাম না। রাজনীতির কর্মজাল অক্টোপাসের মতো ধীরে ধীরে আবার আমাকে জড়িয়ে ফেলল।

৯

কিন্তু ১৯৩২ সালের রাজনীতি আর ১৯৪০ সালের রাজনীতি এক নয়। দেশের অবস্থা আগাগোড়া বদলে গেছে। স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ছড়িয়ে পড়েছে জনসাধারণের মধ্যে। চার দিকে দেখা দিয়েছে কিষাণ আন্দোলন, মজদুর আন্দোলন। রাস্তায় ঘাটে প্রায়ই চোখে পড়ে লাল ঝাণ্ডার শোভাযাত্রা। কম্যুনিস্ট পার্টির প্রভাব তখন যুব সমাজে খুব বেশি। একটা নতুন আদর্শ, নতুন সমাজব্যবস্থার ছবি সামনে রেখে দেশের বিপ্লবী মনকে তা আকৃষ্ট করে নিচ্ছে।

তা ছাড়া থার্ড ইন্টরন্যাশনলের অঙ্গ তারা, একটা আন্তর্জাতিক মর্যাদা তাদের রয়েছে—এটাও তাদের দলের একটা কম আকর্ষণ নয়। কিন্তু আবার ঠিক ওই কারণেই অনেকের মন ওদের প্রতি বিরূপ হয়ে পড়ল। সোজা রাশিয়ার সঙ্গে ওদের যোগ নেই, গ্রেট ব্রিটেনের কম্যুনিস্ট পার্টির মধ্যস্থতায় ওদের রাশিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ। তা ছাড়া ভারতবর্ষে গণ-বিপ্লব আনতে হবে—এতে যদিও কারো দ্বিমত নেই, তবে এত বিরাট একটা দেশের সমস্যাবহুল আন্দোলনের দায়িত্ব সাত সমুদ্রের পরপারে কোনো নেতৃত্বের হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকাটা অনেকেই মূর্খতা বলে আশঙ্কা করলেন। দেশের নেতৃত্ব পুরোপুরি দেশের মাটিতেই গড়ে ওঠা উচিত। অন্য কোনো দেশের হাতে নিজেদের মস্তিষ্ক বন্ধক রাখা বর্তমান অবস্থায় কোনোমতেই চলে না—সে দেশ রাশিয়া হলেও না। অথচ কম্যুনিস্ট পার্টি প্রতিটি কাজে রাশিয়ার নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করে থাকে বলে অনেকের মনে তখন ঘোরতর সন্দেহ ছিল, এবং সে সন্দেহ প্রমাণিত হয়ে গেল ১৯৪১ সালের শেষের দিকে—যুদ্ধের সম্বন্ধে তাদের মনোভাবের রাতারাতি পরিবর্তনের নমুনা দেখে। প্রথম তারা যুদ্ধের সময় দেশে সংগ্রাম আরম্ভ করার জন্য অস্থির হয়ে উঠল। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তখন অভিযোগের অন্ত নেই—কেন সংগ্রাম শুরু করছে না? তখনও ফ্যাসিজ্‌ম-এর ভীতিটা ওদের মনে বিশেষ জেগেছিল বলে মনে হয় না। তার পর জার্মানির রাশিয়া-আক্রমণের পরও কয়েকমাস ওদের নীতির কোনো বদল হল না। কিন্তু যেমনি বিলেতের কম্যুনিস্ট পার্টির 'পলিটব্যুরো' থেকে এক দীর্ঘ নির্দেশ এল, তখনই অকস্মাৎ জার্মান-জাপানের ভীতি অতি উৎকটভাবে

ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টিকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। 'সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ' তখন রাতারাতি 'জনযুদ্ধ' হয়ে উঠল।

যে কথা বলছিলাম—কম্যুনিস্ট পার্টিকে বাদ দিয়েও কম্যুনিজমকে গ্রহণ করা যায় কি না; ভারতের জলমাটির সঙ্গে মিশিয়ে, এখানকার সমস্যার সঙ্গে খাপ খাইয়ে কম্যুনিজমকে এদেশের মাটিতে রোপণ করা যায় কি না—অনেকেই এ প্রশ্ন নিয়ে ভাবতে লাগলেন। মার্কসের নীতিকে লেনিন দেশ-কাল-পাত্রের সঙ্গে খাপ খাইয়ে রাশিয়ায় রূপদান করেছিলেন। ভারতবর্ষের নেতৃত্বের সামনেও সেই কর্তব্যই সেদিন এসে দেখা দিল, এখানে রাশিয়ার 'মাছিমারা অনুকরণ' করতে গেলে সমস্যার যে সমাধান হবে না—স্থানীয় অবস্থার উপযোগী করে নতুন করে যে মার্কসিজমের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা দরকার—এ কথা অনেকেরই মনে হতে লাগল। "মার্কসিজম্ ইজ নট এ ডেড্ ডগ্‌মা—ইট ইজ অ্যান এভর-ইভলভিং প্রিনসিপল্।"

সে সময় এ ব্যাপারে মানবেন্দ্র রায়ের কিছুটা সত্যিকারের অবদান ছিল। পরে যদিও তাঁর মত অদ্ভুতভাবে বদলে গিয়েছিল, কিন্তু সে-সময় দেশকে তিনি যে-একটা নতুন পথের নির্দেশ দিতে পেরেছিলেন—এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তিনি বললেন: "এখন আমাদের ক্ষমতা কেড়ে নেবার সময় এসেছে, সে ক্ষমতা যাতে গণ-প্রতিষ্ঠানের হাতে যায় তাই আমাদের দেখতে হবে। রাশিয়ায় ওদের শ্লোগান ছিল—'অল পাওআর টু সোভিয়েটস্।' আমাদের দেশে সোভিয়েট নেই, কিন্তু অনুরূপ গণ-প্রতিষ্ঠান হয়েছে—গ্রামে গ্রামে প্রাইমারি কংগ্রেসগুলি। সেই কংগ্রেসগুলিকেই আমাদের প্রাণবন্ত করতে হবে। 'অ্যাকটিভাইজ দি প্রাইমারি কংগ্রেস কমিটিজ'—এই হওয়া উচিত আমাদের শ্লোগান।"

তাঁর এই বিশ্লেষণ আমাদের অনেককেই কংগ্রেসের প্রতি আকৃষ্ট করে টেনে নিয়ে এল। আজ মনে হয়, যদি সত্যিই সেদিন দলে দলে কর্মী গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ত, গ্রামের কংগ্রেসগুলিকে শক্তিশালী করে তুলত—তা হলে দেশের সমস্ত চেহারাই হয়তো অন্যরকম হয়ে যেত, সাম্প্রদায়িকতার বিষ হয়তো এত তীব্র হয়ে ছড়িয়ে পড়ত না, আজ ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় দেশের সাত লক্ষ গ্রামও এমন নিস্তেজ হয়ে পড়ে থাকত না। কিন্তু যা হয় নি তা ভেবে আর লাভ কী! আমাদের কৃতকর্মের ফল আজ আমরা ভোগ করছি। এর জের আরও কত বংশপরম্পরা ধরে টেনে চলতে হবে তাই বা কে জানে! শুধু এম. এন. রায়ের জন্যই নয়, আরও নানা কারণে কংগ্রেসের ধীরে ধীরে গণ-প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়ে ওঠার আভাস ফুটে উঠতে লাগল।

১৯৩৪ সালে প্রথম প্রকাশ্য অধিবেশনে পণ্ডিত জওহরলাল কংগ্রেসের মধ্যে সমাজতান্ত্রিকতার স্থান দেবার ইঙ্গিত দিলেন। ক্রমে ক্রমে কংগ্রেসের বিভিন্ন প্রস্তাবে, বিভিন্ন নেতাদের উক্তিতেও এই একই সুরে ফুটে উঠতে লাগল। সেই সময় স্থির হল বাঙলাদেশে আমরা নতুন কোনো দল গঠন না করে কংগ্রেসকেই বর্তমানের সবচেয়ে জনপ্রিয় ও শক্তিশালী গণ-প্রতিষ্ঠান বলে স্বীকার করে নিয়ে, কংগ্রেসকে অধিকতর

দ্রুতলয়ে সমাজতান্ত্রিকতার মধ্যে টেনে আনবার চেষ্টা করব। এবং এই কংগ্রেসের মধ্যেই দেশের গণশক্তিকে সংহত করে গণ-বিপ্লবের মধ্য দিয়ে দেশকে স্বাধীন করব ও স্বাধীন দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করব। নিশ্চয়তা না থাকলেও আশা ছিল—যদি কংগ্রেসের মধ্যে গণশক্তি সত্যিই সংহত করা যায়, আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম একই সঙ্গে সংঘটিত হবে—দুটোর মধ্যে খুব বেশি সময়ের ব্যবধান থাকবে না।

এই নতুন পরিকল্পনা নিয়ে পূর্ণোদ্যমে কাজ আরম্ভ করার পথে প্রথম বাধা হল বাঙলার কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ কলহ। কলহের প্রথম সূত্রপাত ত্রিপুরী কংগ্রেস থেকে। কংগ্রেসের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নানা ব্যাপারে সুভাষচন্দ্রের মতভেদ হয়। এর পরিণতি হয় সুভাষচন্দ্রের উপর নিয়মানুবর্তিতা ভঙ্গের জন্য কংগ্রেস থেকে 'ব্যান্'। সুভাষবাবু সে-সময় ফরওয়ার্ড ব্লক গঠন করলেন। দ্বন্দ্ব আরও জটিল হয়ে উঠল। সুভাষচন্দ্র ও তাঁর দলের সভ্যরা 'ব্যান্' সত্ত্বেও বাঙলার কংগ্রেস কমিটিগুলির অধিকার ত্যাগ করলেন না। তখন ওয়ার্কিং কমিটি একটি অ্যাড হক্ কমিটি গঠন করে তার উপর ভার দিলেন বাঙলার কংগ্রেস কমিটিগুলির নতুন করে নির্বাচন পরিচালনা করবার।

বাঙলা দেশের সামনে তখন প্রশ্ন দাঁড়াল : নিখিল-ভারত-কংগ্রেসের সঙ্গে যোগ রেখে চলে যে বাঙলা-কংগ্রেস তাকেই সমর্থন করা—না, ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন, বাঙলার জনপ্রিয় নেতার পরিচালনায় যে কংগ্রেস কমিটি তাকেই সমর্থন করা? আগেই বলেছি অনেকখানি আশা এবং নির্ভরতা নিয়ে আমরা তখন কংগ্রেসকে গ্রহণ করেছি। সেখানে নিখিল-ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র যে প্রান্তীয় কংগ্রেস কমিটি, তাতে থেকে কাজ করার আমাদের পক্ষে কোনো অর্থই হয় না। তাকে ঠিক কংগ্রেস বলা চলে কি না সে বিষয়েই আমাদের সন্দেহ ছিল। অন্য ভুল-ত্রুটি, ন্যায়-অন্যায়ের বিচার ছেড়ে দিয়ে, অ্যাড হক্ কমিটির পরিচালনায় নব-নির্বাচিত কংগ্রেসে যোগ দেবার এটাই ছিল আমাদের পক্ষে পর্যাপ্ত কারণ। অবশ্য এর জন্যে প্রবল জনমতের বিরুদ্ধে সেদিন আমাদের দাঁড়াতে হয়েছিল; সেদিন আমাদের বাঙলা দেশে কংগ্রেসের কাজ করা সহজ হয় নি।

ব্যক্তিগত কারণে আমার নিজের পক্ষে এ-কাজটা ছিল আরও কঠিন। আমাদের বাড়ির সঙ্গে বরাবরই সুভাষবাবুর অতি নিকট সম্বন্ধ, সেখানে আমার এভাবে তাঁর বিপক্ষ দলে যোগ দেওয়া আমাদের বাড়ির কারো ভালো লাগে নি। আমার নিজেরও সময় সময় নিজের কাছেই নিজেকে কেমন অপরাধী লাগত : বিশেষ করে যখন আমাদের 'ফরওয়ার্ড'এ অত্যন্ত কঠোরভাবে সুভাষবাবুর সমালোচনা করা হত। রাজনীতিতে বোধ হয় নিজেদের নীতির জন্য, বিশ্বাসের জন্য, এতখানি কঠোরতাই প্রয়োজন—আমার কিন্তু কেবলই মনে হত—এত বেশি তীব্রভাবে না লিখলে এমন কী ক্ষতি হয়?

এর কিছুদিন পরে সুভাষবাবুর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। সেটা ১৯৪১ সালের জানুয়ারি মাস। সুভাষবাবু তখন অসুস্থ অবস্থায় বাড়িতে রয়েছেন। একদিন খবর পাঠালেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাবার জন্য। জেল থেকে বেরুনোর পর একদিনও তাঁর সঙ্গে দেখা হয় নি। তবু আমার রাজনৈতিক গতিবিধির খবর তিনি রাখতেন বলেই আমার বিশ্বাস। সেজন্য হঠাৎ এভাবে ডেকে পাঠানোয় বিস্মিত হলাম। বাড়িতে গিয়ে সোজা দোতলায় তাঁর ঘরে উঠে গেলাম। খাটের উপর শুয়ে ছিলেন, মুখে দাড়িগোঁফ, আর সেজন্যই বোধ হয় বড়ো বেশি রোগা দেখাচ্ছিল। তা ছাড়া দেখছিও কতদিন পরে, সব মিলিয়ে চেনাই যায় না যেন!

সুভাষবাবুও আমাকে দেখে হেসে বললেন, 'বড়ো রোগা দেখছি যেন?" তারপর জানতে চাইলেন কী আমি করছি, কী ভাবছি ইত্যাদি। প্রায় একঘণ্টা ধরে ওঁর সঙ্গে কথাবার্তা হল। তর্ক করলাম অনেক। উনিও ওঁর দিক থেকে যা-কিছু বলবার ছিল বললেন।

কোনো মীমাংসাই কিন্তু হল না। এত সহজে মীমাংসার আশাই বা করেছিলাম কেন! আশা করি নি সত্যি, কিন্তু মনের গোপন কোণে একটা ইচ্ছা ছিল যেন, আর ইচ্ছার তো কোনো যুক্তি নেই—সীমা পরিসীমাও আছে নাকি? এবার উঠতে হয়, ওঁর অন্য কাজ রয়েছে। সুভাষবাবু হেসে বললেন, "বড়ো আনন্দ পেলাম, কতদিন পরে দেখা!" উত্তরে বলে এলাম, "কিন্তু সারাক্ষণ তো ঝগড়াই করে গেলাম আপনার সঙ্গে।"

এর বোধ হয় চার-পাঁচদিন পরেই কাগজে দেখলাম সুভাষচন্দ্রের আকস্মিক অন্তর্ধানের খবর। আজ অনেক সময় ভাবি, কী মনে করে সেদিন তিনি আমায় ডেকে পাঠিয়েছিলেন কে জানে! তখন তো তাঁর দেশ ছেড়ে চলে যাবার সব আয়োজনই তৈরি। তারই কিছু আভাস আমাকে দিয়ে যেতে চেয়েছিলেন কি! ইচ্ছা করেছিলেন কি কোনো ভাবে আমাকে তাঁর কাজে লাগাবার? এমনি কত অনুক্ত প্রশ্ন তো আজ মনের মধ্যে তোলপাড় করে—উত্তর তার কোনোখানেই নেই। 'মহা-অজানার' অন্ধকারে সমস্ত উত্তরই চিরদিনের জন্য মৌন হয়ে রইল।

১০

'ম্যাস ওআর্ক' কথাটা শুনতে যত সহজ, কাজে ঠিক ততটা নয়। ওর জন্য সম্পূর্ণ একটা আলাদা শিক্ষার দরকার, আলদা কৃচ্ছ্রসাধনের, আলাদা মনোভাবের।

এত কঠিন বলেই আজ এত বছর ধরে আমরা দেশের প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল ওই কথাটা নিয়ে এত চেঁচামেচি করেও সত্যিকারের গণ-সংযোগ কেউই করে উঠতে পারি নি। আজও তাই আমাদের আর দেশের বিপুল জনতার মাঝে দুস্তর ব্যবধান। ওদের বেদনার ভাষা আমরা বুঝি না, ওরাও বোঝে না আমাদের পুঁথিগত বুলির

কচকাটি। অনেকদিন আগে কে যেন বলেছিলেন, দেশের মধ্যে হিন্দু-মুসলমানের ভেদ বড়ো কথা নয়, ধনী-দরিদ্রের ভেদও তত ভাববার জিনিস নয়—আসল প্রভেদ শিক্ষিত-অশিক্ষিতের। এই পার্থক্যের সমুদ্রের উপর যারা সেতু বাঁধতে পারবে, তাঁরাই করবে দেশের সত্যিকারের উদ্ধারসাধন। কংগ্রেসের হয়ে জনগণের মধ্যে কাজ করতে গিয়ে এ কথাটার মূল্য মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলাম।

অবিশ্যি এ-ব্যাপারে আমাদের মনের জমি কিছুটা প্রস্তুত ছিল। সেটা হয়েছিল জেলের ভিতরে। বাস্তবিকই 'প্রিজন ইজ এ গ্রেট লেভেলর।' সেখানে সমস্ত আভিজাত্যের গর্ব, সব-কিছু সংস্কৃতির আদিম ও চিরন্তন বেদনা আর অনুভূতি। সেখানকার লাঞ্ছনা-গঞ্জনার মধ্যে শিক্ষিত-অশিক্ষিত, গরীব-বড়োলোকের ভেদ কমই থাকে। জেলখানার কয়েদীরা জেলের নাম দিয়েছিল, 'দুঃখের ঘর'।

বড়ো উপযুক্ত নাম, সেই দুঃখের ঘরে বসে দেশের দুঃখীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় আমাদের হয়েছিল। সেখানে প্রচারক হিসাবে তাদের মধ্যে যাই নি, ভালো করবার মহৎ উদ্দেশ্য নিয়েও তাদের সঙ্গে থাকি নি। ছিলাম তাদেরই একজন হয়ে। দিনের পর দিন তাদের সঙ্গে এক জায়গায় থেকেছি, হেসেছি, গল্প করেছি, পরামর্শ করেছি, সুখদুঃখের আলোচনা করেছি—অত্যন্ত অনায়াসে, অতি সহজভাবে। কোথাও এতটুকু আটকায় নি। আর সেই ঘনিষ্ঠতার ফলে শুধু যে ওদের চিনতে শিখেছিলাম সেইটাই বড়ো কথা নয়, শ্রদ্ধাও করতে পেরেছি। ওদের মধ্যে এক-একজনকে এমন চালাক আর প্রখর বুদ্ধিমতী দেখেছি যে, স্কুলকলেজে যদি খানিকটা পড়তে পেত—দস্তুরমতো চোখে-পড়া মেয়ে হতে পারত ওরা, প্রয়োজন হলে নেত্রী।

ভাগ্যের বিড়ম্বিত জীবন ওদের, নইলে জেলেই বা গিয়েছে কেন? কিন্তু এও ঠিক, ভাগ্যকে চুপচাপ মেনে নেয় নি ওরা, যেভাবেই হোক বিদ্রোহ তো করেছে—সমাজের বিরুদ্ধে, সংসারের উৎপীড়নের বিরুদ্ধে। ঠিকপথে চালাতে বা চলতে পারলে এদের কতই না সম্ভাবনা ছিল।

জেলের বাইরে শ্রমিকদের কাজে আমার হাতেঘড়ি হল টালিগঞ্জে চাল কলে। মেয়েশ্রমিকদের অবস্থা ওখানে খুবই খারাপ, ভোর থেকে সন্ধ্যা অবধি খাটে, মাঝে ভাত খাবার জন্য অল্পক্ষণের বিরতি। দিনে পাঁচ আনা, সাড়ে পাঁচ আনা রোজগার। আমি ওদের কাছে গিয়ে পড়েছিলাম একটা খারাপ সময়ে। কিছুদিন আগেই ওদের মধ্যে একটা ধর্মঘটের চেষ্টা হয়, দু-চারদিন কাজ বন্ধও রেখেছিল। তারপর ওদের 'লিডর'-দের কেউ বোধ হয় কোনোরকম বিশ্বাসঘাতকতা করে। ওদের 'গুলবাহার' বলে কে একজন মেয়ে-লিডার ছিল, সে ওদের অনেকখানি এগিয়ে দিয়ে বুঝি শেষ মুহূর্তে 'টাকা খায়'। তারপর থেকে এ-সব য়ুনিয়ন বা ধর্মঘটের উপর ওদের দারুণ অনাস্থা। ওই ধরনের কোনো কথাই ওদের কাছে তোলবার উপায় ছিল না। আমাকে দেখলেই অনেকে চোখমুখ কুঁচকে চলে যেত, বলাবলি করত, 'কী করতে এসেছে ও?"

"ওই মিটিং-এর কথা বলছে আর কী?"

"আবার মিটিং, রক্ষা কর।" বলে হনহন করে চলে যেত।

বুঝলাম ওভাবে আপাতত কিছু হবে না, তবু এমনিই ওদের সঙ্গে মেলামেশা করতে লাগলাম। সময় পেলেই ওদের কাছে চলে যেতাম। জীবনযাত্রা ওদের নিতান্ত অনাড়ম্বর, দরিদ্র, মলিন। দেখতাম কোনো মা টেনে টেনে মেয়ের চুল বেঁধে দিচ্ছে, তেলের বাটি পাশে রেখে। কেউ ছেলেকে ভাত বেড়ে দিচ্ছে—মাছের চচ্চড়ি আর ভাত। সন্ধ্যাবেলা কাজের শেষে সবাই মিলে দাওয়ায় এসে বসেছে, ছেলেরা তামাক খাচ্ছে, মেয়েরা কাঁথা সেলাই করছে। ওরই মধ্যে সঙ্গে সঙ্গে চলছে কতরকম হাসি-গল্প। ওদের দেখে কে তখন বলবে সারাদিন ওরা বারোঘণ্টা খেটে এসেছে, সারাদিনে পাঁচ আনার বেশি ওদের পয়সা জোটে না, চাল না কিনতে পারলে খুদ খেয়ে দিন কাটাতে হয়। শিক্ষা ওদের নেই, শ্লীলতা-জ্ঞান ওদের কম, অভাবে ওরা অস্থির। তবু ওদের মধ্যেও কত সামাজিক রীতিনীতি, কত আচার-বিচার!

আমাকে প্রথম যে-কটি মেয়ে সমাদরে অভ্যর্থনা করে নিল, তার মধ্যে রতনবালা একজন। চালাক-চতুর মেয়েটি, স্বাস্থ্যবতী, ওদের মধ্যে সুন্দরীও। জিজ্ঞাসা করতে-না-করতেই নিজের সব পরিচয় দিয়ে গেল—মা-বাবা নেই, এখানে মাসির কাছে থাকে, এই নতুন কাজে ঢুকেছে, বাবুরা বলেছে ওকে শিগ্‌গিরই সর্দারনী করে দেবে। মেয়েটির সঙ্গে কথা বলে সুখ আছে, কিছু একটা বললে মন দিয়ে শোনে, আরও জানতে চাই।

জিজ্ঞাসা করলাম, "আমি তোমাকে পড়াব—পড়বে তুমি।"

"হ্যাঁ, পড়ব না কেন? কবে আসবে তুমি?"

এর দিন-চারের পরে যাওয়ামাত্র আমাকে সবাই ঘিরে ধরল—"রতন নেই, রতন চলে গিয়েছে?"

"কোথায় গিয়েছে?"

"কে জানে, তুমি জান না?"

আমি তো অবাক, আমি জানব কী করে? কিন্তু ওদের মুখ দেখে স্পষ্ট বোঝা গেল ওরা আমাকে বিশ্বাস করছে না। ওদের কথাবার্তা সেদিন ভালো লাগল না, সন্দিগ্ধ দৃষ্টি আর সন্দিগ্ধ ব্যবহারে বেশিক্ষণ সেদিন আর থাকা গেল না।

এরপর আবার যেদিন গেলাম, ততদিন রতনের কথা ভুলে গিয়েছে সবাই। রতনের মাসিও পালিয়েছে। কে আর এ-সব নিয়ে মাথা ঘামায়! অত সময়ও নেই। তা ছাড়া শিশুদের মতো তাদের মন, বেশিক্ষণ একটা জিনিস নিয়ে থাকতে পারে না। কিন্তু একদিনের দেখা সেই মেয়েটির কথা আমি আজও ভুলতে পারি নি, ভারি বুদ্ধিমতী ছিল ও, আর ভারি সুন্দর স্বাস্থ্য। কোথায় গেল কে জানে। কল্পনায় অনেক ছবিই ভেসে ওঠে, কোনোটা সুখের, কোনোটা দুঃখের। জানতে ইচ্ছা হয় রতনের কথা।

তরুর ব্যাপার নিয়েও ভারি মজা হয়েছিল। তার মা বললে, "আমি তো বুড়ো হয়ে গেছি, আমাকে দিয়ে আর কী হবে, আমার মেয়েকে তুমি পড়াও।" আমি তাতে রাজী।

যেদিনই যাই, আমাকে দেখলেই ছ'বছরের মেয়ে তরু বইপত্র নিয়ে বেরিয়ে আসে, শ্লেট ভরে ভরে 'কর' 'খল' লেখে। বেশ পড়ায় মন। দুষ্টু ছেলেমেয়েরা কাছে দাঁড়িয়ে চোখ বড়ো-বড়ো করে দেখে তরুর কাণ্ড-কারখানা। বলি, "তরু, আমি তোমায় পড়াচ্ছি, তুমি আবার এদের পড়াবে।"

বিজ্ঞের মতো ঘাড় নেড়ে তরু বলে, "আচ্ছা।"

এরপর একদিন যেমনি গিয়েছি সেই ছেলেমেয়ের দল আমায় ছেঁকে ধরল, সমস্বরে চিৎকার করতে লাগল—"তরুর বিয়ে হয়ে গেছে জানো? তরুর বিয়ে!"

আমি তো হেসে অস্থির : ছ'বছরের মেয়ে, এখনও আধো আধো কথা, ওর আবার বিয়ে। ঘরে ঢুকে দেখি কথাটা সত্যি। লালশাড়ি পরে একমুখ হেসে তরু এসে দাঁড়াল সামনে—মাথায় চওড়া সিঁদুর। ভরি খুশি ও। কষ্টে হাসি চেপে তরুর মাকে বকাবকি করতে লাগলাম, সর্দা-আইনের ভয় দেখালাম। তরুর মা পা চেপে ধরতে চায়—"অমন কথা বোলো না দিদি তুমি, তোমার তরুকে তুমি আশীর্বাদ করো।" এরপরে মুখ বন্ধ না করে উপায় নেই।

দুঃখীদের জীবনে যে কোনো রকমই আনন্দ নেই—একথা বলি না। তবু বাবা যখন অনেক সময় বলতেন, "দেশের দুঃখ, দেশের দুঃখ করে তোরা যে পাগল, তার অনেকটাই তোদের কাল্পনিক, মন-গড়া। আমরাও তো গ্রামে জন্মেছি, গরীব ঘরেরই তো ছেলে।" তখন সে কথার উত্তর কথায় না দিয়ে, বাবাকে নিয়ে যেতে ইচ্ছা করত টালিগঞ্জের ওই বস্তিগুলোর মধ্যে। ওখানে সবচেয়ে অসহ্য লাগত যখন দেখতাম ছেলেমেয়েগুলি বন্য পশুর মতো কিভাবে বড়ো হয়ে উঠছে। পরনে কাপড় নেই, সারা গায়ে ধুলো, লেখাপড়ার কোনো ধার ধারে না, সারাদিন কী করে বেড়ায় কে জানে! কেউ কেউ বলে ওদের সাত-আট বছরের ছেলেরাও নাকি জুয়ো খেলতে শেখে। পাঁচ-ছ'বছরের ছেলেকে বিড়ি খেতে তো নিজের চোখেই দেখেছি। ভবিষ্যতে কী যে হবে এরা। অথচ মনুষ্যত্বের সমস্ত সম্ভাবনা নিয়েই এরা জন্মেছিল।

দুরূহ ব্যাধির চিকিৎসার অভাব প্রতিদিনই চোখে পড়ত। অনেকগুলো 'কেস' ভুলে গিয়েছি, তবে একটি ছোটো ছেলের কথা কেবলই মনে পড়ে। বছর বারো-তোরো বয়স হবে, রোগা রক্তহীন চেহারা। ঘরের দাওয়ায় বসে থাকত, আর চোখ দিয়ে টপ্‌টপ্ করে জল পড়ত। শুনতাম চোখের কী দোষ আছে, ডাক্তার নাকি বলেছে লিভর খারাপ, তাই।

জিজ্ঞাসা করলাম, "ডাক্তার ওষুধ দেয় নি?"

সলজ্জভাবে উত্তর দিত, "না, সে অনেকদিন আগে দেখিয়াছিলাম, সে পুরোনো ওষুধ আর বোধ হয় চলবে না। আবার দেখাতে যাব।"

কিন্তু দেখাতে যেতে একদিনও দেখি নি। একজন হোমিওপ্যাথ ডাক্তার আমার সঙ্গে যাবেন কথা দিয়েছিলেন। তাঁকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু আমাদের সেই ধীর মন্থরগতি চেষ্টার অপেক্ষায় ওর লিভর আর বসে রইল না। একদিন গিয়ে

দেখলাম দাওয়ায় ওর জায়গাটা খালি। ছেলেটি মারা গেছে। ওর খালি করে দেওয়া জায়গাটায় খানিকক্ষণ বসে রইলাম। এখানে বসে বসে ও কত চোখের জল ফেলেছে, মাটির দাওয়া শুধু ভিজেছে—ক্ষয়ে যায় নি।

সময় সময় মাথা গরম হয়ে উঠত। মানুষকে মানুষের অধিকার থেকে বঞ্চিত করার চেয়ে বড়ো পাপ যদি না থাকে, শুধু ভারতবর্ষকে কেন্দ্র করে যে পাপের স্তূপ জমে উঠেছে, তারই ভারে সমস্ত পৃথিবীর রসাতলে যাওয়া উচিত ছিল। যায় না কেন?

১১

শ্রমিকদের কাজ ছাড়া তখন কিছুটা সাহিত্য-চর্চা করবারও সুযোগ আমার এসেছিল : 'মন্দিরা' মাসিক পত্রিকা মারফত। 'মন্দিরা' মহিলাদের পরিচালিত, উদ্দেশ্য : সাহিত্যের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক মতবাদ ও আদর্শ প্রচার।

অনেকদিন পরে সাহিত্যচর্চার সুযোগ পাচ্ছি ভেবে মনটা খুশি হয়ে উঠল। ছেলেবেলা থেকে সাহিত্যের প্রতি ঝোঁক আমাদের বাড়িতে প্রায় সকলেরই ছিল। ছোটোবেলায় বোনেরা মিলে একখানা হাতের-লেখা মাসিক বার করতাম। ছোটো বলে উৎসাহ দেবার জন্য দিদিরা আমাকেই সম্পাদিকা করে দিয়েছিলেন। নিজেদের লেখা গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা, নিজেদেরই হাতে আঁকা ছবি ছিল কাগজখানির উপাদান। মা-বাবা সব সময়েই সাহায্য করতেন। এ ছাড়া আর-একজনের স্নেহদৃষ্টি আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার উপর পড়ে তাকে ধন্য করে তুলেছিল। তিনি পিতৃবন্ধু প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও সমালোচক বাঁকুড়ার শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়। তিনি নিয়মিত আমাদের লেখা পড়ে সংশোধন করে দিতেন, উৎসাহ দিতেন, কাগজ সম্পাদনায় পরামর্শ দিতেন। পরম বিজ্ঞের মতো তাঁর সঙ্গে নানা বিষয় নিয়ে তর্ক করতাম। তিনিও স্নেহহাস্যে অপার সহিষ্ণুতার সঙ্গে আমাদের সমস্ত বালসুলভ বাচালতা সহ্য করে যেতেন। তখন থেকে তিনিই আমার নাম রেখেছিলেন : 'সম্পাদিকা'। আজও এই নামেই তাঁর কাছে আমার পরিচয়। তাঁর দেওয়া এই স্নেহের উপাধি আমার জীবনের একটা পরম সম্পদ হয়ে রয়েছে। 'মন্দিরা'কে কেন্দ্র করে সাহিত্যিক মহলে আমাদের ঘোরাফেরা করতে হত। কোথাও সহানুভূতি বা সাড়া পেতাম, কোথাও ঔদাসীন্য। কেউ কেউ দস্তুরমতো বিরক্তি প্রকাশ করতেন, তাঁদের মতে আমাদের পক্ষে কাগজ চালানো একটা রীতিমতো অনধিকারচর্চা বা স্পর্ধার ব্যাপার। এঁদের বিরক্তির খানিকটা কারণ যে ছিল না তা নয়। বাস্তবিকই, আমাদের জীবনে সে সময় রাজনৈতিক কোলাহল আর হৈ চৈ এত বেশি ছিল যে তার মাঝে সাহিত্যচর্চার যোগ্য শান্ত আবহাওয়া খুঁজে পাওয়া শক্ত হত। একখানা ভালো কাগজ চালাতে হলে অনেক পড়াশুনা করতে হয়, চিন্তা করতে হয়। কিন্তু আমাদের দিনগুলো ছিল অসংখ্য ও নানাবিধ কাজের ভিড়ে ঠাসা। বাড়ি বাড়ি গিয়ে কংগ্রেসের সভ্য করবার চেষ্টা করছি; খালি পার্কে লোক জমিয়ে কংগ্রেসের নামে সভা করছি; কংগ্রেসের

মহিলা সাবকমিটি গঠন করবার জন্য জেলায় জেলায় ঘুরছি। আবার 'মন্দিরা'র বিজ্ঞাপন জোগাড়ের জন্য ডালহৌসি, ক্লাইভ স্ট্রীটের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত প্রতিটি অফিসে ব্যাকুলভাবে ছুটোছুটি করছি। এদিকে নিজের রুটির জন্য কারো আছে স্কুলমাস্টারির ছ'ঘণ্টা ধরে চিৎকার, কারো বা বাড়ি বাড়ি গিয়ে ট্যুশনি করার ক্লান্তি। আজ পিছন ফিরে সে দিনগুলোর দিকে তাকালে নিজেদের উপর বেশ খানিকটা মায়া হয়।

এমন নিষ্ফলা দিনরাত্রি আমাদের জীবনেও কম এসেছে। সকাল থেকে রাত্রি অবধি বিরামহীন খেটে চলেছি, কিন্তু তাতে তো কোনো ক্ষোভ ছিল না। দুঃখ হত যখন কোনো জায়গায় কোনো রকম সাড়া পেতাম না, মিলতো খালি উপেক্ষা আর অপমান। বাঙলায় কংগ্রেস তখন ভয়ংকর অপ্রিয়। 'অ্যাড হক'-এর নামে লোকে মুখ ফেরায়।

আমাদের নিজেদেরও অবিশ্যি অনেকগুলো ত্রুটি ছিল, যার জন্য আমাদের কোনো কাজই দানা বেঁধে উঠছিল না। প্রথমত অনেকদিন পরে বাইরের কাজের ক্ষেত্রে এসে দাঁড়িয়েছি। বাইরে নতুন একটা 'জেনারেশন' গড়ে উঠেছে, তাদের সঙ্গে আমাদের কোনো সম্বন্ধই নেই—কি বাইরের, কি মনের! স্কুল-কলেজে গিয়ে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে আলাপ জমাবার সুবিধেও ঠিকমতো করে উঠতে পারতাম না। যদিও বা কারুর সঙ্গে আলাপ হত, তারা আমাদের দিকে তাকাত যেন মিউজিয়মের কোনো একটা আজব জিনিস দেখছে! কৌতূহলভরা চোখ নিয়ে জিজ্ঞাসা করত, "আপনাদের সে-সব সময়কার গল্প করুন না।" অনিচ্ছাসত্ত্বেও মন পাবার জন্য গল্প-বলা 'দিদিমা' সেজে খানিকক্ষণ বসতাম, তারপর বলতাম, "কিন্তু এ তো গেল পুরোনো দিনের কথা, এখন বর্তমানে ফিরে আসা যাক। এখনো তো অনেক কাজ রয়ে গেছে।" এতে আর ওদের উৎসাহ নেই—উঠে পড়তে চায়, গানের মাস্টার আসবে, কিংবা সিনেমায় যাবার কথা। যাদের বা একটু রাজনৈতিক ঝোঁক আছে তারাও আমরা কংগ্রেসের কাজ করি শুনে আর কাছে ঘেঁষতে চায় না। কংগ্রেসটা ওদের মনে হত বড়ো বেশি সেকেলে, একেবারে রোমাঞ্চহীন ব্যাপার। ও শুধু বুড়োদের জন্যই। তার চেয়ে ফরওঅর্ড ব্লক কিংবা কম্যুনিস্ট পার্টিতে অথবা ফোর্থ ইন্টরন্যাশনলে যোগ দেওয়া হাজারগুণে ভালো, অনেক উত্তেজনাপূর্ণ। বামপন্থী, দক্ষিণপন্থী—এই কথাগুলো তখন বাঙলার রাজনীতিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। অথচ কোনটা যে বামপন্থা, সে কথা জিজ্ঞাসা করলে ভালো উত্তর কেউই দিতে পারত না। বুঝতাম খুব গরম গরম কথা : "এক্ষুনি সংগ্রাম আরম্ভ করো—এক্ষুনি সংগ্রাম আরম্ভ" বলে চিৎকার করাকেই ওরা বামপন্থা বলে মনে করে।

আমাদের আরো দোষ ছিল—নিজেদের বক্তব্য ভালো করে বলতে পারতাম না। ছেলেবেলা থেকে গুপ্তসমিতিতে কাজ করে এসেছি, ফিস্‌ফিস্ করে কথা বলাই আমাদের অভ্যাস। অথচ এখন গণআন্দোলনের যুগ। এখন দরকার সভায়-সভায় কথার আগুনের ফুলকি ছড়িয়ে দেওয়া—'ডেমাগগি'র পরকাষ্ঠা দেখানো। দু-চারদিন তখনকার জনসভায় গিয়ে দেখে এলাম, শুনে এলাম বহু তৎকালীন কর্মীর জ্বালাময়ী বক্তৃতা। একদিকে যেমন মুগ্ধও হতাম, অন্যদিকে তেমনি নিজেদের বোবা ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে মনটা

নিরাশায় ভরে উঠতো। মনে হত আর নয়, এবার আমাদের সরে দাঁড়ানোই ভালো। করুণ পরিহাসের সঙ্গে বলাবলি করতাম :

মোদের সভা হল ভঙ্গ
এখন আসিয়াছে নতুন লোক
ধরায় নব নব রঙ্গ।

কিন্তু সভা ভেঙেও তো ভাঙতে চায় না! সরে দাঁড়ানো কি এতই সহজ? নিজেদের জীবন দেশের সমষ্টিগত জীবনের সঙ্গে মজ্জায় মজ্জায় জড়িয়ে গিয়েছে—চল্লিশ কোটি মানুষের সুখদুঃখের সঙ্গে। সরে দাঁড়াতে গেলে কত জায়গায় যে টান পড়ে! দেশের প্রয়োজনের চেয়ে নিজেদের প্রয়োজনই বোধ হয় বেশি। তাই রয়ে গেলাম দেশের কর্মক্ষেত্রের মাঝখানে।

১২

মাঝে মাঝে অবিশ্যি বিশ্রামের অবকাশও আসত। আমাদের সেজদি তখন থাকতেন লাহোরে। এবার নিমন্ত্রণ এল সেখান থেকে। ঠিক হল পথে দেখে যাব দিল্লী, আগ্রা, জয়পুর। সেই পুরাকাল থেকে দিল্লীতে একে একে সাতটি রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, আবার কালের স্রোতে বিলীন হয়ে গেছে বুদ্‌বুদের মতো। যুধিষ্ঠিরের ইন্দ্রপ্রস্ত থেকে পঞ্চম জর্জের দিল্লী—কী বিরাট ব্যবধান মাঝখানে, কত যুগ, কত অব্দ, কত যুদ্ধ-বিগ্রহ, শান্তি স্তব্ধ হয়ে রয়েছে। ছোটোবেলা থেকে মুখস্থ করা সমস্ত ইতিহাস দিল্লীর প্রান্তরে গিয়ে দাঁড়াল একসঙ্গে কথা কয়ে ওঠে। একটার পর একটা দৃশ্য চোখের সামনে দিয়ে ভেসে যায়। স্পষ্ট কানে শোনা যায় অপমানিত পাঞ্চালীর আর্তনাদ, দুঃশাসনের খলখল হাসি, পাণ্ডবদের অশ্বমেধযজ্ঞের অশ্বের হ্রেষাধ্বনি। স্পষ্ট চোখে দেখতে পাই বীর কুতুবের অশ্বারোহী মূর্তি;; রাজদণ্ড হাতে দৃপ্ত মহিমময়ী সিংহাসনারূঢ়া রিজিয়া বেগমের চিত্র; মহামতি সম্রাট আকবরের হিন্দু মুসলমান দুই ধর্মকে মিলিয়ে নতুন ধর্ম সৃষ্টি করার দুঃসাধ্য সাধনায় নিমগ্ন ধ্যানস্থ মূর্তি; বন্দী সাজাহানের প্রসাদের শ্বেতচত্বরে বসে সামনের তাজমহলের দিকে নিষ্পলক চেয়ে থাকার করুণ ছবি। আর চোখে ভেসে ওঠে দেওয়ান-ই-আমের বিরাট রাজদরবারে সম্রাজ্ঞী নূরজাহান আর সম্রাট জাহাঙ্গীর সপারিষদ বসে রয়েছেন : সামনে এসে দাঁড়িয়েছে সমুদ্রপারের মুষ্টিমেয় কয়েকটি শ্বেতাঙ্গ বণিক—সম্রাজ্ঞী আর সম্রাটের কাছে করজোড়ে ভিক্ষা জানাচ্ছে একটুখানি বাণিজ্যের সুবিধের জন্য—আর কিছু নয়। তারপর দ্রুত পটপরিবর্তন—এত দ্রুত যে সবগুলি চোখ দিয়ে ধরতেও পারা যায় না। সব শেষের দৃশ্য : সিপাই-বিদ্রোহের রোষ-বহ্নি নিভে গিয়েছে, দিল্লীর পথে পথে তখনো কিন্তু রক্তের দাগ। এবারও রাজসভায় নতুন পরিবেশ, ভারতবর্ষের ভাগ্যদণ্ড হাতে নিয়ে সেখানে সদম্ভে বসে রয়েছেন কয়েকজন অভারতীয় শ্বেতাঙ্গ পুরুষপুঙ্গব, আর তাদের সামনে নতমস্তকে

দাঁড়িয়ে ভারতবর্ষের শেষ স্বাধীন সম্রাট বাহাদুর শা—হাত তাঁর শৃঙ্খলিত, পায়ে লৌহদণ্ড। সে তো শুধু বাহাদুর শা'র মূর্তি নয়, এই মূর্তির মধ্যে সেদিন ফুটে উঠেছিল ভারতবর্ষের কোটি মানুষের ভবিষ্যতের ছবি। সবাই হয়তো দেখতে পেত না, সবাই শুনতে পেত না, কিন্তু অনুভূতি যার একটু তীক্ষ্ণ, দৃষ্টি যার একটু স্বচ্ছ, সে-ই জানত সেদিন থেকে আজ অবধি প্রতিটি ভারতবাসীর হাতে পরানো ছিল অদৃশ্য শৃঙ্খলাভরণ—প্রতি পদক্ষেপে বেজেছে শিকলের ঝনঝন্।

পুরানো দিল্লী দেখার পরে ওরা আমায় নিয়ে যেতে চাইল নয়াদিল্লীর পরিষদসভার ভিতরে, গভর্ণমেন্ট হাউসের সামনে, কনট সারকস্, কনট প্লেসের চারদিকে বেড়াতে। রাজী হলাম না। দরকার নেই আমার। আজীবন কলকাতায় বাস। তাতেও কি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ও-সব জাঁকজমক, ঝুটা চাকচিক্য যথেষ্ট দেখা হয় নি যে আবার এখানে এসে ওই-সব দেখে সময় নষ্ট করতে হবে? এখানে এসেছি অতীতের শক্তি আর ঐশ্বর্য, সম্ভোগ আর সৌন্দর্য—নিজের চোখে দেখে যেতে, বিচার করে নিতে কী আমাদের ছিল, কেনই বা আমরা সব-কিছু হারিয়েছি। সেদিনের শক্তির উৎসই বা ছিল কোথায়, কোথা দিয়েই বা অভিশাপের কালকূট প্রবেশ করে সমস্ত জাতিটাকে এমন মৃত্যুবিষে জর্জরিত করে তুলেছে? এরপরে ওরা আবার আমায় নিয়ে গেল কুতুবমিনারে, জুম্মা মসজিদে, হুমায়ুনের লাইব্রেরিতে, আকবরের ফতেপুর সিক্রিতে, জাহানারার কবরে।

আগ্রায় গিয়ে তাজমহল একটিবার মাত্র দেখবার সুবিধে হয়েছিল। হোটেলে ভাত খেয়ে উঠেই ছ'খানি রিক্শা নিয়ে বেরিয়ে পড়া গেল। পৌঁছলাম যখন বেলা তিনটে হবে। প্রখর সূর্যের সহস্র-দীপ্তি সর্বাঙ্গে জড়িয়ে আলোয় ঝলমল করছে চিরসুন্দরী তাজ। এত শুভ্র, আর রৌদ্রের তেজে এত দীপ্ত যে তাকাতে পারছিলাম না ভালো করে। তবু নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম ঘণ্টার পর ঘণ্টা। সন্ধ্যা পর্যন্ত যমুনার ধারে খোলা চত্বরে আমরা বসে ছিলাম। কারুর মুখে কোনো কথা নেই, বিস্ময়ের অতিশয়োক্তি করতেও ভালো লাগছিল না। সৌন্দর্য—পরিপূর্ণ, নিখুঁত সৌন্দর্যের মধ্যে সব সময়েই যেন কিসের একটা বেদনা লুকানো থাকে। তা ছাড়া তাজের সৃষ্টিই তো বেদনার মধ্য দিয়ে। অনন্ত বিরহের বাণী বুকে নিয়ে যুগযুগ ধরে নির্বাক বেদনায় স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে :

> এক বিন্দু নয়নের জল
> কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল
> এ তাজমহল।

এর উপর সে সময় আমরাও এসেছিলাম বেদনার মৃত্যুশেল বুকে নিয়ে : মাত্র কয়েকমাস আগে আমাদের স্নেহময়ী মা আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। কেন জানি না তাজমহলে বসে কেবলই মনে হচ্ছিল মা খুব কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন। যমুনার ধারে ঠাণ্ডা পাথরে মাথা রেখে বারেবারে অনুভব করছিলাম : মাতৃহীন ছেলেমেয়েদের কপালে সস্নেহে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিতে মা এসেছেন।

সব শেষে পৌঁছলাম লাহোরে। গুরুগোবিন্দের পাঞ্জাব, ভগৎ সিং-এর পাঞ্জাব,

লালা লাজপত রায়ের পাঞ্জাব—জালিয়ানওয়ালাবাগের পাঞ্জাব। মনে কৌতূহল ছিল অনেকখানি। পাঞ্জাবীদের লম্বা-চওড়া চেহারা, গৌরবর্ণ, সুঠাম গঠন সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু ওই পর্যন্তই। আর কিছুই খুঁজে পাই না ওদের ভিতর। সেজদিরাও তাই বললেন : বললেন, এরা বাঙালিদের চেয়েও অনেক বেশি সাহেবীভাবাপন্ন। এখানকার ছাত্ররা স্যুট ছাড়া অন্য কিছু বড়ো একটা পরে না, ছাত্রছাত্রীরা বেশিরভাগই কথা বলে ইংরিজিতে। পাঞ্জাবী মেয়েদের দেখলাম খুব সপ্রতিভ, সহজ গতিবিধি; কিন্তু রাজনৈতিক কার্যকলাপ প্রায় নেই বললেই চলে।

লাহোরের একটি পরিবারকে দেখে বেশ ভালো লেগেছিল মনে পড়ে। সেজদিদের মডেল টাউনেই একটি ছোটো মাটির কুঁড়ে ঘর বানিয়ে রয়েছেন—মিস্টার বেদী ও তাঁর ইয়োরোপিয়ন স্ত্রী। কুঁড়ে ঘরে হলে কি হবে—ছবির মতো সাজানো, বইয়ে ঠাসা। মিস্টার বেদী কাগজে লেখেন, বই লিখে সোশ্যালিজ্‌ম প্রচার করেন; মিসেস বেদী স্থায়ীয় মেয়ে-কলেজের প্রোফেসর। ওঁদের এভাবে মাটির ঘরে থাকার মধ্যে যে নতুনত্ব ছিল তাতে সকলেই আকৃষ্ট হত, মুখে বলার চেয়ে এ ধরনের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মধ্য দিয়ে সোশ্যালিজ্‌ম প্রচার লোকের মন স্পর্শ করে বেশি।

এ ছাড়া ভালো লাগল লাহোরের বাগানগুলি—বাগানভরা বসরাই গোলাপের মেলা। ভালো লাগল সেখানকার শুকনো ঝরঝরে আবহাওয়া। আর সব শেষে—কিন্তু কিছুর চেয়ে কম নয়—ভালো লাগল সেজদির বাড়ির আদরযত্ন আর নিত্যনতুন খাওয়া-দাওয়া।

মাস দুই পরে আবার কলকাতায় ফিরে এলাম।

১৩

কলকাতায় ফিরে এসে দেখি দেশের রাজনীতি কেমন ক্রমেই ঘুলিয়ে উঠছে। ১৯৪১ সালের ডিসেম্বরে, একদিন প্রত্যূষের খবরের কাগজ হঠাৎ ঘরে-ঘরে খবর বহন করে আনল যে জাপান প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধে অবতরণ করেছে। ঘাড়ের এত কাছে যুদ্ধ, মাথার উপর ঘন ঘন বম্বার ঘুরছে, আকাশ বিদীর্ণ করে বেজে উঠছে সাইরেন। কলকাতার রাস্তায় স্লিট্‌ট্রেঞ্চ আর ব্যাফ্‌ল্ ওঅল, আর গাছ দিয়ে সাজানো কামানের ক্যামুফ্লাজ।

জীবনে কোনো দিন যুদ্ধ-না-দেখা বাঙালির পক্ষে এ একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। দলে দলে লোক কলকাতা ছেড়ে পালাতে লাগল, বাঙালির চিরদিনের যা স্বভাবধর্ম এ ক্ষেত্রেও তাই আত্মপ্রকাশ করল! তা ছাড়া বাঙালি মরতে যাবেই বা কিসের জন্য? ইংলণ্ডে ওরা যে অত কিছু সহ্য করছে তার পিছনে রয়েছে ওদের দেশকে বাঁচাবার, নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষা করবার অদম্য স্পৃহা। আমাদের বাঙলা দেশের অধিকাংশ লোকেরই তখনকার মনোভাব ছিল : আছি তো একটা বিদেশী জাতের পায়ের নীচে, তার বদলে না হয় আবার আসবে আর-একটি বিদেশী জাতি—প্রভুবদলের ব্যাপার বইতো নয়, এতে আমাদের ক্ষতিবৃদ্ধি কী আর এমন? বরং যতদিন রাজায় রাজায় যুদ্ধ হচ্ছে ততদিন আমরা উলুখড়েরা যদি কোনোরকমে প্রাণটা বাঁচিয়ে মাথা লুকিয়ে থাকতে

পারি, তা হলে অকারণে বোমার ঘায়ে আহত হবার যন্ত্রণাটা অন্তত এড়িয়ে যেতে পারি।

এদের এই পলায়ন-বৃত্তি আরো দৃঢ় হল যখন বর্মা-প্রত্যাগত লোকদের অবস্থা নিজের চোখে দেখতে লাগল। দলে দলে, কাতারে কাতারে মানুষ জাহাজ নৌকো বোঝাই করে অথবা মাইলের পর মাইল পাহাড়-জঙ্গলের মধ্য দিয়ে পায়ে হেঁটে আধমরা শরীরটাকে কোনোরকমে এনে ফেলতে লাগল কলকাতায়। তাদের মুখে শোনা গেল ওখানকার কর্তৃপক্ষের ব্যবহারের কাহিনী : কেবল শ্বেতাঙ্গদের জন্যেই কেমন করে সমস্ত এয়ার প্যাসেজ রাতারাতি বুক হয়ে গিয়েছিল এবং একটি শ্বেতাঙ্গও যতদিন ওখানে ছিল কর্তৃপক্ষের কেমন ব্যস্ততার অন্ত ছিল না। আর কালা-আদমীদের ভাগ্যে জুটেছিল খালি অমানুষিক অপমান আর অবহেলা। কী ভাবে 'শাদা রাস্তা' আর 'কালা রাস্তা'র সৃষ্টি হল, কেমন করে বাঙালি কর্মচারী ও তাদের পরিবারদের দ্বিধামাত্র না করে ফেলে রেখে তেলকলের সাহেবরা অফিসের সব টাকা, মেমসাহেব আর পালিতকুকুর নিয়ে মোটরে করে শাদা রাস্তা দিয়ে ভারতের দিকে চলল।

এই সময়ে আমাদেরও কিছুদিন হৈ চৈ করে কাটল এইসব ইভ্যাকুইদের নিয়ে। ওদের জাহাজ থেকে নামিয়ে নেওয়া, থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা, হাসপাতালে ভর্তি করা, সেখানে তত্ত্বাবধান করা। এ-সব কাজে বাঙলা সরকারও বর্মা সরকারেরই অনুকরণ করাটা বুদ্ধিমানের কাজ মনে করলেন। ফলে সমস্ত দায়িত্ব এলে পড়ল কংগ্রেস, মারোয়াড়ী রিলিফ সোসাইটি ও অন্যান্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের উপর।

এরই কিছুদিন আগের উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনা জার্মানির রাশিয়া আক্রমণ। রাজনীতিজ্ঞ বা বিশেষজ্ঞ মহলে এর জন্য কিছুটা প্রস্তুতি থাকলেও সাধারণ লোক এতে বেশ চমকে উঠল। সাধারণ মানুষের রাজ্য রাশিয়া—নিপীড়িতদের দুর্দশা-মোচনকারী রাশিয়া। ভারতবর্ষের জনগণের মধ্যে রাশিয়ার প্রতি দরদ খুবই স্বাভাবিক—সেজন্য নাৎসি নেকড়েবাঘের এভাবে অতর্কিতে তার ঘাড়ে গিয়ে পড়ায় সকলেই আতঙ্কিত হয়ে উঠল। কী জানি কি হবে, এতদিনের সাধনায় গড়ে-তোলা সোভিয়েট রাষ্ট্র, এবার হয়তো আর তার রক্ষা নেই। প্রতিদিনকার খবরের কাগজে গভীর উত্তেজনা দিয়ে দেশের লোক পড়ত নাৎসিবাহিনী রাশিয়ার অভ্যন্তরে কতখানি এগুলো।

এতেও কিন্তু ভারতবাসীর যুদ্ধ সম্বন্ধে মোটামুটি মনোভাব বদলাবার কোনো সংগত কারণ সেদিন খুঁজে পাওয়া যায় নি। যুদ্ধের গোড়া থেকে কংগ্রেস—তথা দেশবাসী যা বলে এসেছিল সে কথাই আজও ঠিক রইল : ফ্যাশিজম্ আমরা চাই না, ইংরাজের হাত থেকে জাপানের হাতে গিয়ে পড়ার আকাঙ্ক্ষা আমাদের মোটেই নেই। কিন্তু এ যুদ্ধে আমরা ইংরেজের বেতনভোগী সৈন্য হিসেবে লড়তেও রাজী নই। দাসজাতির পক্ষে দাসত্বের বোঝা যতদিন কাঁধে চাপানো থাকে, ততদিন একটিমাত্র লড়াই সম্ভব—সে লড়াই সেই দাসত্ব যে কাঁধে চাপিয়ে দিয়েছে তার বিরুদ্ধে। কাজেই এই তথাকথিত 'ফ্যাশিজম্ বিরোধী' যুদ্ধে ইংরেজ তথা পৃথিবীও যদি চল্লিশ কোটি ভারতবাসীর সহায়তা

চায় তাকে সর্বপ্রথম ভারতবাসীকে স্বাধীনতা দিতে হবে। দিতে হবে নিজেদের ধনপ্রাণ রক্ষার ভার নিজেদের হাতে তুলে নেবার অধিকার। ভারতবর্ষের এই অত্যন্ত ন্যায্য দাবির উত্তরে কারোরই কিছু বলবার ছিল না। গোটা পৃথিবীর একটা নীরব সহানুভূতি ভারতবর্ষের উপর এসে পড়েছিল। চীনের অধিনায়ক চিয়াংকাইশেক প্রকাশ্যেই ভারতবর্ষের দাবি সমর্থন করার সৎসাহস দেখিয়ে এদেশের কৃতজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। ইংরেজের মুখের দিকে তাকিয়ে ইংরেজ-মিত্র মার্কিন খোলাখুলিভাবে কিছু বলতে সাহস পান নি, কিন্তু মার্কিনের একজন বিশিষ্ট সাংবাদিক লুই ফিশার ভারতবর্ষের দাবির সুস্পষ্ট সমর্থন সেদিন অতি প্রাঞ্জল ভাষায় জানিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু পরাধীন দেশের যা চিরদিনের দুর্ভাগ্য—গোলমাল বা বেসুরো আওয়াজ উঠল ভারতবর্ষের ভিতর থেকেই।

এখানকার কম্যুনিস্ট পার্টি জনযুদ্ধের আওয়াজ তুলে দেশের আবহাওয়া বেশ খানিকটা ঘুলিয়ে তুলতে চেষ্টা করলেন। তর্ক করলে তাঁরা বলতেন, "জনযুদ্ধ আজও ভারতবর্ষে হয়ে ওঠে নি বটে, কিন্তু আমরা করে তুলব।"

"কি ভাবে করবেন?"

"জনতার চাপ দিয়ে!"

জনতার চাপের নিদর্শন তাঁদের দেখলাম শুধু রাস্তায়-রাস্তায় কতকগুলি স্কুল-কলেজের ছাত্রের মুখে :

ইংরেজ মার্কিন হাত ধরে চলো যাই
জাপানী দস্যুর সাথে করিব লড়াই।

এই ধরনের গান। অথবা, হোমগার্ডের হাতে অস্ত্র দেওয়া হলে ভালো হয়—খবরের কাগজে বা পার্টি মিটিং-এ এই ধরনের প্রস্তাব গ্রহণ।

এদিকে ক্রিপস্ মিশন ব্যর্থ হওয়ার পর থেকে দেশের আবহাওয়া ক্রমেই উত্তপ্ত হয়ে উঠছিল। 'হরিজন'এ মহাত্মাজীর সে-সময়কার লেখাগুলো দিনে দিনে সুস্পষ্ট ইঙ্গিতে দেশকে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করে তুলছিল। বাঙলার বাইরের নেতাদের—সর্দার প্যাটেল, রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রভৃতির বক্তৃতাতেও স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল—বাতাস কোন্ দিকে বইছে।

বাঙলা দেশ কিন্তু সেই আসন্ন সংগ্রামের মুখেও নড়েচড়ে উঠে বসল না, পড়ে রইল একেবারে নিস্তেজ প্রাণহীন। তার কারণ অনেকগুলো। প্রথমত, কিছু করুক না করুক, বাঙলা দেশের যা ঐতিহ্য আছে তা দেশের লোকে ভুললেও কর্তৃপক্ষ ভোলেন না! তাই যুদ্ধ ঘনিয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই বিশেষ করে জাপান যুদ্ধে নামার পরই বাঙলা সরকার 'সাবধানের মার নেই' এই নীতি অনুসরণ করে বাঙলার প্রায় সমস্ত বিপ্লবী নেতা ও কর্মীদের প্রাচীরের অন্তরালে পাঠিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। সুভাষবাবুর দলের তো প্রায় প্রত্যেকেই সরকারের দেওয়া 'পঞ্চমবাহিনী' এই উপাধি কপালে এঁকে যুদ্ধের শুরুতেই কারান্তরালে অন্তর্নিহিত হলেন। এ ছাড়াও যাঁরা সুভাষবাবুর পথ বা মত কোনোভাবেই সমর্থন করছিলেন না, তাঁদের মধ্যে যাঁরা সত্যিকারের কর্মী বা কিছু গড়ে তোলার ক্ষমতা রাখতেন তাঁরাও, সেই 'অ্যাড হক্' কংগ্রেসের পরিচালকেরাও

বাদ পড়লেন না। সত্যিকারের জনযুদ্ধই বটে। বাঙলার কংগ্রেস তখনো ঘরোয়া কলহে, দুই বি. বি. সি. সি.-র ঝগড়ায়, দুর্বল প্রাণহীন অবস্থায় পড়ে রয়েছে।

দেশের তো এমনি অবস্থা, তার উপর নিদারুণ একটা আঘাতের ধাক্কা তার গায়ে এসে লাগল। ১৯৪১ সালের ৭ আগস্ট রবীন্দ্রনাথ মারা গেলেন। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু—সমস্ত জগতের পক্ষে ক্ষতিকর—সারা ভারতের পক্ষে একান্ত শোকাবহ ঘটনা। কিন্তু তবু বাঙালির যে তিনি কতখানি ছিলেন, তাঁর মৃত্যুতে বাঙালি যে সেদিন কত নিঃসম্বল, অসহায় হয়ে পড়ল সে শুধু বাঙালিই জানে। সমস্ত জাতিটা যেন একদিনে অন্ধ হয়ে গেল, চোখের সামনে কোনো আলো নেই, আশা নেই, আনন্দ নেই।

এমনি অবস্থায়, বাঙলার এমনি অন্ধকারাচ্ছন্ন মুহূর্তে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে হঠাৎ বেজে উঠল আগস্ট বিপ্লবের বিষাণ—আর এ বিষাণ বাজাল দেশের জনগণ নিজে। ৮ আগস্ট—নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে প্রসিদ্ধ আগস্ট প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত সর্বভারতীয় ও প্রাদেশিক নেতাদের এক রাতের মধ্যেই কারারুদ্ধ করে ফেলা হল। দেশবাসীর হাতে এসে পৌছল শুধু তাঁদের আগস্ট প্রস্তাবের মধ্যেকার সংগ্রামের ইঙ্গিত। সংগ্রাম আরম্ভ করবার সুযোগ নেতারা পেলেন না, কিন্তু তাঁদের অনারব্ধ কাজের ভার তুলে নিতে তাঁদের অগণিত দেশবাসীর এক মুহূর্তও দ্বিধা হল না। প্রতিষ্ঠানগতভাবে কংগ্রেস বেআইনী হয়ে গেল, কিন্তু সমস্ত ভারতবাসীর অন্তরে অন্তরে যে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা, সেই কংগ্রেস সেদিন আসমুদ্রহিমাচল কম্পিত করে নিজের অস্তিত্ব জ্ঞাপন করে উঠল। এর চেয়ে গৌরবময়, এর চেয়ে সার্থকতাময় মুহূর্ত কংগ্রেসের কোন দিন আসে নি।

দেশের নেতারা জেলে যাবার আগে সমস্ত দেশ-জোড়া অসংখ্য নেতা সৃষ্টি করে যেতে পেরেছিলেন—গ্রামে গ্রামে কারখানায় কারখানায় তারা ছড়িয়ে রইল, সারা দেশে তারা বিপ্লবের আগুন জ্বালিয়ে তুলল, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্ তলা অবধি কেঁপে উঠল। কংগ্রেসের নেতৃত্বের এর চেয়ে বড়ো কাম্য বড়ো সার্থকতা আর কী হতে পারে?

এত সহজ, স্বাভাবিক এবং বিপ্লবের পক্ষে একান্ত কাম্য পরিস্থিতি—তবুও তার্কিকের তর্কের শেষ নেই। কে সংগ্রাম আরম্ভ করল? কংগ্রেস তো করে নি? তা হলে এটা সত্যিকারের স্বাধীনতার সংগ্রাম, না কয়েকজন দুষ্টলোকের গুণ্ডামি? কংগ্রেস নেতাদের বাদ দিয়ে কংগ্রেসের সংগ্রাম কী করে হতে পারে? যাঁরা গণবিপ্লব, গণবিপ্লব করে অস্থির হন, তাঁদের মুখেও এমনি অবৈপ্লবিক কথা সেদিন শুনে যেতে হল, যেন কাগজে কলমে নাম না লেখা থাকলে কেউ কোনো অবস্থাতেই নেতৃত্বের ভার তুলে নিতে পারে না—যেন গণসংগ্রাম চিরদিনই এমনি করে সংগ্রামের মাঝখানে ইচ্ছেমতো নেতা সৃষ্টি করে নেয় না।

বাঙলা দেশে, কলকাতা শহরে বসে বসে আমরা শুনতে লাগলাম : বোম্বাই, বিহার, যুক্তপ্রদেশে কেমন করে গণসংগ্রামের আগুন ছড়িয়ে পড়ছে। আমেদাবাদে সমস্ত

কল বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সারা দেশের রেলের লাইন বহু জায়গায় বিনষ্ট, টেলিগ্রাফের তার কাটা, নিরস্ত্র জনতার আক্রমণের সামনে সশস্ত্র পুলিশের থানা বিনা প্রতিবাদে আত্মসমর্পণ করছে। কলকাতা বা বাঙলায় তখনো কিছুই হয় নি। কোথাও কোনো প্রেরণা নাই, উত্তেজনা নেই। কেন এমন হল? এ কী অস্বাভাবিক অধঃপতন? মনে পড়ছিল ১৯৩৯ সালে নিখিল-ভারত কংগ্রেসের সঙ্গে বাঙলা কংগ্রেসের গোলমালের সময়ে রাজেন্দ্রপ্রসাদ বলেছিলেন : 'দেন বেঙ্গল উইল বি আউট অব দি পিকচার।' কথাটা এ সময়ে যেন অক্ষরে অক্ষরে ফলে যেতে বসেছিল।

কিন্তু তবু আমরা হাল ছাড়তে রাজী নই। ঠিক হল কোথাও কোনো একটা জায়গায় কিছু একটা আরম্ভ করতে হবে, কোনোরকমে বাঙালির ঘুম ভাঙানো চাই। প্রথমে ঠিক হল ওয়েলিংটন স্কোয়ারে একটা বড়ো সভা ডেকে আগস্ট প্রস্তাব পড়া হবে আর সবাইকে শোনানো হবে জেলে যাবার আগে মহাত্মাজীর শেষ আদেশ—"ডু অর ডাই"।

সেদিনের সভায় লোকসমাগম কম হয় নি। বিশেষ করে যাদবপুর কলেজের ছাত্রদের সাত-আট মাইল হেঁটে-আসা-শোভাযাত্রা আর সভায় বিরাট সমাবেশ দেখে মনটা আশান্বিত হয়ে উঠেছিল। যে সভায় আমরা আশঙ্কা অথবা এক হিসেবে আশা করেছিলাম পুলিশের হস্তক্ষেপ হবে এবং তার ফলে বাঙলা দেশে খানিকটা আলোড়ন ঘটবে। কিন্তু তা যখন হল না তখন কংগ্রেসকর্মীরা ঠিক করলেন কলকাতা শহরের উপরে কিছু করা শক্ত, তাঁদের জেলার জেলায় ছড়িয়ে পড়তে হবে এবং কিছু কর্মীকে যেতে হবে কারখানায় কারখানায়। খবরের কাগজের সাহায্য পাওয়া যাবে না। সাইক্লোস্টাইল মেশিনে ছেপে প্রচারপত্র ছড়াতে হবে। এইভাবে কাজটাকে খানিকটা শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে চালিয়ে যাবার আয়োজন চলতে লাগল।

আমার ভাগ্য কিন্তু তখন আমাকে অন্য পথে টেনে নিল। আমি তখন দক্ষিণ কলিকাতা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদিকা। সম্পাদিকা হিসেবে দক্ষিণ কলকাতায় আগস্ট প্রস্তাবের প্রচারের জন্য একটি জনসভা ডাকার দায়িত্ব আমার উপর পড়েছিল। অথচ সভা করতে গেলে ধরা পড়ব নিশ্চয়ই। বন্ধুরা কেউ কেউ আপত্তি করলেন। কিন্তু সভা নিজে ডেকেছি, সভায় না গিয়েই বা কী করে থাকি ভেবে পেলাম না। মিটিং-এর কিছু আগে ছোটো ভাইয়ের কাছে ঘড়ি, ফাউন্টেন পেন দিয়ে, খানিকটা প্রস্তুত হয়ে নিয়েই আমি আর জন পাঁচ-ছয় কংগ্রেসকর্মী হাজরা পার্কে সভাস্থানের দিকে এগিয়ে চললাম। পার্কের কাছাকাছি গিয়ে দেখি মেশিনগানের সারি দিয়ে পার্কের দরজা বন্ধ। আশেপাশে জনমনুষ্য নেই। খালি পুলিশের ভ্যান তৈরি হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। পার্কে গিয়ে পৌঁছবার আগেই আমাদের ভ্যান-এ তুলে নেয়া হল। অমূল্যবাবু তাঁর স্বভাবসিদ্ধ গলায় গর্জন করে উঠলেন : "ডু অর ডাই! বন্ধুগণ, যা বলতে এসেছিলাম তা বলা হল না।"

কাকেই বা সম্বোধন করে বলা! কেই বা শোনে! দূরে উল্টো দিকের ফুটপাতে অল্প কয়েকজন পথচারী খালি থমকে দাঁড়াল। ভ্যান-এর সামনে চার-পাঁচজন পুলিশের লাঠি একসঙ্গে উদ্যত হয়ে উঠল অমূল্যবাবু ও তাঁর সঙ্গীদের মাথার উপর। একজন

সার্জেন্ট ব্যাটন দিয়ে প্রাণপণে গুঁতো মারতে লাগল অমূল্যবাবুর পেটে। সমস্ত শক্তি দিয়ে তাড়াতাড়ি সার্জেন্টের ব্যাটনসমেত হাতটা চেপে ধরলাম।

বেশ-কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তি চলল। ঠিক সেই অবস্থায় আমার কয়েকজন পরিচিত ভদ্রলোক আমাকে দেখেছিলেন, তাঁরা মনে করেছিলেন আমার দুটো হাতই বুঝি ভেঙে গিয়েছে। কিন্তু ইংরেজ সার্জেন্টের চেয়ে বাঙালি মেয়ের হাতই শক্ত—একথা প্রমাণ করে অক্ষত শরীর নিয়েই আবার গিয়ে ঢুকলাম সেই চিরপরিচিত প্রেসিডেন্সি জেলের সাতটা তালাচাবির মধ্যে।

১৪

জেলে প্রথম কয়েকটা দিন আমার কী ভাবে যে কেটেছে সে আমিই জানি। বাইরে অত কোলাহল, অত উত্তেজনা, অত নব নব অভিযানের দুঃসাধ্য প্রচেষ্টা। আর আমি কিনা সামান্য একটা মিটিং করতে গিয়ে স্বেচ্ছায় ধরা দিয়ে চলে এলাম। দক্ষিণ কলিকাতা কংগ্রেসের সম্পাদিকা হওয়ার দায়িত্বকে অত বড়ো করে দেখার কোনো দরকার ছিল না, কোনো মানেই হয় নি ওই রকম অবস্থায় একটা সভা ডেকে বসবার। তার চেয়ে অন্যভাবে কাজ চালানো অনেক বেশি উচিত ছিল। কিন্তু এ ধরনের আত্মভর্ৎসনা আর কতক্ষণ ভালো লাগে? শেষটা নিজেই মুখ বন্ধ করে দিলাম। কিন্তু কিছুই ভালো লাগত না। জেলের ভিতর এসেই আবার গতবারের সেই সমস্ত বিতৃষ্ণা আর অরুচি মনের মধ্যে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। একজন মানষের একটা জীবনে একবার জেলে আসাই যথেষ্ট খারাপ, দু'বার করে আসার দুঃখের আর কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। রাগের মাথায় এক-একবার ভাবতাম বাঙলার বাইরে গিয়ে মিটিং করলেই ছিল ভালো, তা হলে অন্তত নতুন একটা জেলে ঢুকতে পারতাম। এখানকার প্রায় প্রত্যেকটা জেলই যে আমাদের অতি-পরিচয়ে পচে-যাওয়া।

প্রথম কিছুদিন বাইরের কোনো খবর পেতাম না। খবরের কাগজ যদিও বা দিত, তার সর্বাঙ্গে কালিলেপা। শত লেবু ঘসে, শত আলোর সামনে ধরেও তার একটি বর্ণেরও পাঠোদ্ধার করা যেত না। কিন্তু খবর পাওয়ার ভালোরকম উপায় শিগ্‌গিরই পাওয়া গেল। সাত-আট দিনের ব্যবধানে জেলে এক-এক করে এসে ঢুকতে লাগলেন আগস্ট-বিদ্রোহিণীর দল। তার মধ্যে কিছু পুরোনো মুখ, কিছু বা নতুন। ওদের কাছে বেশ-একটা ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া গেল। প্রথম যে সঙ্গিনীটি এলেন তাঁর মুখে-চোখে তখনো উৎসাহের পূর্ণ দীপ্তি। তখনো বাইরে সংগ্রাম পুরোদমে চলছে। "টাটা অবধি সমস্ত কারখানা বন্ধ! এর চেয়ে বেশি আর চাও কী?"

"তা হলে এবার স্বাধীন আমরা হচ্ছিই?"

"নিশ্চয়ই, দেখো, ছ'মাসের মধ্যে আমরা বেরুচ্ছি—একেবারে স্বাধীন ভারতে। খুব বেশি হলে ছ'মাস—তার বেশি একটা দিনও না।" যিনি বললেন, অতিশয়োক্তি করা

তাঁর অভ্যাস নয়। সে-সময়ে লোকের মনে আশা যে কত গভীর হয়ে দেখা দিয়েছিল এটা তারই প্রমাণ।

সবশেষে যাঁরা এলেন—নভেম্বরে-ডিসেম্বরে—মুখগুলো তাঁদের ম্লান। জেলে এসে যেন তাঁরা বেঁচে গেলেন, এমনি ভাব। আন্দোলনে তখন ভাঁটা পড়ে গেছে, আর জের টেনে চলা যাচ্ছিল না। অবিশ্যি মেদিনীপুর, বালিয়া, সাতারা তখনো বাকি ছিল। কিন্তু ওই তিনটে জায়গায় সংগ্রাম একেবারে স্বতন্ত্রভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। ওই জায়গাগুলির প্রত্যেকটির ইতিহাস এক-একটি আলাদা স্বয়ংসম্পূর্ণ কাহিনী। সমস্ত দেশ-জোড়া যে বিক্ষোভ দেখা দিয়েছিল, সেটা ১৯৪২ সালের ডিসেম্বরের মধ্যেই অনেকটা স্তিমিত হয়ে আসে।

ক্রমে ক্রমে আমরাও বাইরের কথা ভুললাম। জেলের চারটি দেওয়ালের মধ্যে আবার সংসার পেতে বসতে হল। আবার শুরু হল সেই :

কর্মবিহীন বিজন সাধনা
দিবানিশি শুধু বসে বসে শোনা
আপন মর্মবাণী।

কর্তৃপক্ষের অশেষ অনুগ্রহ যে এবার আর আমাদের মফঃস্বলের জেলে জেলে ঘোরালেন না, কলকাতার জেলেই রেখে দিলেন। অবিশ্যি থাকার জায়গা হিসেবে কলকাতার প্রেসিডেন্সি জেলের ফিমেল ওঅর্ড অন্য সব জেলের চেয়ে অনেক নিকৃষ্ট। মোটে জায়গা নেই, ছোট্ট একটুখানি উঠোন, ঘরগুলোর তিন দিক বন্ধ, একদিক খোলা। সেই খোলা দিকের সামনে আবার ব্যাফল্ ওঅল তোলা। তবু শুধু কলকাতায় থাকতে পাবার আনন্দের জন্য আমরা সমস্ত কষ্টই সহ্য করতে রাজী ছিলাম।

কলকাতার এ আকর্ষণ কেন, তা ঠিক বুঝতাম না। পনেরো দিন পরপর বাড়ির ইন্টারভিউ পেতাম, একঘন্টার জন্য বাড়ির লোকেদের খুব কাছাকাছি পাওয়া যেত; সেটা একটা মস্ত সুখ ছিল বৈকি। কিন্তু তাতেও সবটা বলা হয় না। আমাদের মধ্যে অনেকে ছিল যাদের আত্মীয়স্বজন বিদেশে, কলকাতায় থেকে তাদের ইন্টারভিউ পাবার কোনো সুবিধে ছিল না। তারাও দেখেছি কলকাতা ছাড়তে একটুও রাজী নয়। কোথায় যেন পড়েছিলাম—কলকাতাটা সমস্ত দেশের হৃৎপিণ্ড। কথাটা বড়ো সত্যি। দেশের হৃৎপিণ্ডের অত কাছে থাকতে পেয়েছিলাম বলেই এবারকার নির্বাসনটা আমাদের তেমন ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারে নি।

আমাদের দোতলার দু-একটা 'সেল' থেকে কলকাতা শহরের রাস্তাঘাট গাড়ি-মোটর দেখা যেত। সময়ে অসময়ে সেখানে গিয়ে বসাটা আমাদের একটা বিলাসিতা ছিল। একদিন অবিশ্যি এর জন্য কম বিব্রত হতে হয় নি। ব্যাপারটা এই : আমাদের একটি সঙ্গিনী ছাড়া পেয়ে বাইরের ওই জায়গায় এসেছিল আমাদের দেখতে। পুটুদি জানলা থেকে তাকে দেখতে পেয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওর জেল-ফাটানো গলায় চিৎকার আরম্ভ করে দিল, "ওমা, করুণ এসেছে—কোথায় তোমরা। শিগ্‌গির এসো, করুণ আমাদের দেখতে এসেছে।" চিৎকার শুনে আমরাও অনুরূপ চিৎকার আর হুড়মুড় করতে করতে

সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেলাম। কিন্তু জেলের ভিতর এমন হৈ-হৈ ব্যাপার—সঙ্গে সঙ্গে জমাদারনীরা কি আর না এসে পারে? জানলা থেকে আমাদের হাত ধরে টেনে নামায় আর কি। খানিকটা বচসা হয়ে গেল ওদের সঙ্গে। পরের দিন অফিসে আমাদের জন-চারেকের ডাক পড়ল। অফিসে খানিকক্ষণ বসিয়ে আমাদের টিকেটসমেত যথারীতি বড়োসাহেবের ঘরে হাজির করল। সুপারিণ্টেন্ডেন্ট মুখ খুব গম্ভীর করে জিজ্ঞাসা করল, "তোমরা বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চেষ্টা করেছিলে?"

আমরা বললাম, "না।"

"কিন্তু জমাদারনীরা যে বলছে?"

"জমাদারনী মিথ্যে বলছে।"

"তোমরা কাল বিকেলে জানলার ধারে যাও নি কি?"

"নিশ্চয় গিয়েছিলাম, আমাদের নিজেদের ঘরের জানলার কাছে যাব তাতে আবার আপত্তির কী আছে?"

"কিন্তু জানলা থেকে বাইরের লোকের সঙ্গে চিৎকার করে কথা বলেছিলে তো?"

"না, তা-ও বলি নি, আমরা নিজেরাই চেঁচামেচি করেছি। এতেও তোমাদের বলবার কিছু নেই।"

সুপারিটেন্ডেন্ট কথা না বাড়িয়ে টিকেটে "প্রথম অপরাধ—সাবধান" লিখে আমাদের ছেড়ে দিল। এবং তার পরদিনই 'সেল'-এর প্রত্যেকটি জানলায় পুরু করে তারের জাল দিয়ে দেওয়া হল যাতে আর দ্বিতীয়বার সে অপরাধ না করতে পারি।

আমাদের জেলে দু-একটি মহিলা পরিদর্শক আসতেন। কী করতে যে তাঁরা আসতেন তা তাঁরাই জানেন। কোনো দিন কোনো অভিযোগ তাঁদের কাছে জানিয়ে ফল পাই নি। সাধারণ কয়েদীদের যে খাবার দেখলেও চোখে জল আসে তার প্রতি একটি মহিলা পরিদর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করায় তিনি বালতিভরা ঝোলের গঙ্গা থেকে একটি ডাঁটা তুলে নিয়ে মুখে দিয়ে বললেন, "কেন এ রান্না তো ভালোই।" এরপর এঁদের আর কিছু বলতে উৎসাহ হত না। গরমের সময়ে কে ওঁকে বলেছিল জল রাখবার জন্যে আমাদের যথেষ্ট কুঁজো দেওয়া হয় না! সেই 'দরবার'টা অফিসে গিয়ে বোধ হয় করেছিলেন। এবং ওঁর কথায় কি না জানি না, কুঁজো আমরা তারপর কয়েকটা পেয়েছিলাম। কিন্তু কুঁজোর কথা উনি আর জীবনের ভুললেন না। যেদিনই আসতেন, যার সঙ্গেই দেখা হত, ওঁর প্রথম কথা ছিল, "কী, সব ভালো তো? কুঁজোটুজো সব পেয়েছ তো? এরপর দূরে থেকে ওঁকে দেখলেই সবাই পালাত—"ওই রে আবার সেই কুঁজোটুজো আসছেন!"

প্রেসিডেন্সি জেলের কথা মনে হলেই মনে পড়ে যায় জেলের ভিতরকার পাগলদের কথা। একটির পর একটি পাগল সেখানে আসতোই। মেন্টাল হস্‌পিটালে জায়গা নেই, অতএব জেলের মধ্যে পাঠিয়ে দেওয়া হত যতদিন না জায়গা খালি হচ্ছে। ওদের নীচের গারদগুলোয় বন্ধ করে রাখা হত। একটি পাগলী ছিল রীতিমতো সুন্দরী, অল্প

বয়স, কী কষ্টে পাগল হয়েছে কে জানে। তার কাজ ছিল সন্ধ্যা থেকে আরম্ভ করে সারারাত চিৎকার করে কাঁদা। এমনিতেই তো জেলের ভিতরকার আবহাওয়া বেশির ভাগ সময়েই থমথম করে। তার উপর এমনি করে সারারাত ধরে পাগলীর কান্না শোনা। আমরা তো সুনিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলাম আমাদের প্রত্যেকটি রাজবন্দিনীর পাগল হয়ে উঠবার আর বেশি দেরি নেই। আর-একটি ফিরিঙ্গী পাগলী ছিল, তার অভ্যাস ছিল, দেখা হলেই জড়িয়ে ধরবে, সুবিধে পেলেই আমাদের ঘরের মধ্যে ঢুকে আমাদের বিছানায় শুয়ে পড়বে, আর একবার শুলে আর ওঠানো যেত না, গায়ে দুর্দান্ত জোর। সমস্তক্ষণ ভয়ে ভয়ে থাকতে হত তাকে নিয়ে।

দুর্গির কথাও মনে পড়ে। তাকে ঠিক পাগল বলা চলে না, কিন্তু পাগল না বলে তাকে কী যে বলব তাও তো জানি না। সেই প্রথমবারের জেলে আসার পর থেকে ওকে দেখছি, তখন থেকে, কী তারও আগে থেকে ও জেলে আসা শুরু করেছে, বেশিদিন থাকে না, তিনমাস, ছ'মাস, এক বছর—এমনি ধরনের সাজা নিয়ে আসে। অপরাধ কখনো চুরি, কখনো বা অন্য কিছু। ছাড়া পাবার পর জেলের বাইরে গিয়ে গোনা এক মাসের বেশি ও বোধ হয় কোনবারও থাকে নি, আবার কিছু একটা করে জেলে ফিরে আসে। দুনিয়ায় ওর কেউ যে আছে বা কোনোদিন যে ছিল তা ওকে দেখে মনে হয় না। মুখে অবিশ্যি বানিয়ে বানিয়ে অনেক গল্প করে, "হ্যাঁ, আমার স্বামী আছে, ছেলে আছে, সে ইস্কুলে পড়ে।"

আমরা লক্ষ্য করতাম যত দিন যাচ্ছিল দুর্গির মনটা তত বেশি বিকৃত আর বীভৎস হয়ে উঠছিল। ওকে মানুষ বলে মনে করতেও হচ্ছে করত না। লোভ, হিংসা আর পাপের ছাপ যেন কে দশটা আঙুল দিয়ে ওর মুখে এঁকে দিয়েছে। সারাক্ষণ সকলের কাছে ওর চাওয়া স্বভাব। "মাসিমা, (কোথা থেকে এ ডাক যে বার করেছিল কে জানে।) একটু রুটি দেবেন মাসিমা?"

"ও কি, এক্ষুনি তো খেলে ছায়ামাসিমার কাছ থেকে নিয়ে?"

"তা হলে একটা সাবান, মাসিমা।"

যতক্ষণ না কিছু পেত জানলা থেকে ওকে সরানো দুষ্কর ছিল। থেকে থেকে কী সব গণ্ডগোল করত, তখন ওকে জমাদারনীরা মারতে আরম্ভ করত আর দুর্গির আরম্ভ হত গলাফাটানো চিৎকার আর মাটিতে মাথা ঠোকা। অথচ মিনিট কয়েক পরেই আবার কপালটপাল ফুলিয়ে, সর্বাঙ্গে ধুলো মেখে, এক মুখ হেসে জানলার কাছে এসে দাঁড়াত : "মাসিমা, একটা আম।"

এই দুর্গির এত কদর্যতা সত্ত্বেও ওকে একটুখানি ভালো না বেসেও থাকা যেত না। তা ছাড়া ওর মধ্যেও ভালো কিছু ছিল বৈকি। যে কাজ কেউ করতে চায় না, ঘৃণা করে, ভয়ে করে, দুর্গি অনায়াসে সে কাজে এগিয়ে যায়। জেলের ভিতর কারো বসন্ত হল, কেউ কাছে যাচ্ছে না, দুর্গি ঠিক তার পাশে গিয়ে বসেছে, জল দিচ্ছে, বাতাস করছে। কলেরা রোগীর অপরিষ্কার কাপড়চোপড় নির্বিকার মুখে পরিষ্কার করছে দুর্গি।

তখন ওকে দেখে মনটা কোমল হয়ে উঠত, "আহা সারাক্ষণই খালি সবার কাছে বকুনিই খাচ্ছে, অথচ ওর মতো কৃপার পাত্রী আর সংসারে কে আছে।"

বাইরে বেরুনোর পর একদিন দেশবন্ধু পার্কে শ্রীযুক্তা অরুণা আসফ আলির মিটিং-এ গেছি, হঠাৎ দেখি কে ফিসফিস করে ডাকছে : "মাসিমা, মাসিমা।"

"আরে দুর্গি, তুমি এখানে? কবে বেরুলে জেল থেকে?" তাড়াতাড়ি মুখে আঙুল দিয়ে বারণ করে, এদিকে-ওদিকে তাকায়। নিজের ভুল বুঝতে পেরে চুপ করে যাই, তাকিয়ে দেখি ফর্সা একখানা কাপড় পরেছে, মুখটাও একটু ভালো লাগছে যেন। কিন্তু বাইরে ও কদিনই বা থাকতে পারবে। বড়োজোর পনেরো দিন, কি একমাস!

১৫ আগস্টের পর জেলের বন্দীদের ছেড়ে দেবার কথা হচ্ছে। দেশের মুক্তির উৎসবে দেশের বন্দীরা একটিবারের জন্য অন্তত বাইরে মুক্তির নিশ্বাস ফেলবার সুযোগ পাবে, এর চেয়ে শোভন আর সমীচীন আর কী হতে পারে? কিন্তু এই ছাড়ার ব্যাপারেও অনেক বাছবিচার করার কথা উঠছে। যারা নাকি একেবারে দাগী আসামী, খুব খারাপ ধরনের অপরাধী, তাদের ছাড়া হবে না। একজনের সঙ্গে এ বিষয়ে একটু আলাপ হচ্ছিল। জিজ্ঞাসা করলাম, "খুব খারাপ আসামী আপনি কাদের বলেন?"

"এই যারা খুনটুন করেছে আর কি!"

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ভাবলাম, হায়রে, খুনী-আসামীদের প্রতি এদের কত ঘৃণা। দেশের মুক্তির পরমমুহূর্তেও তাদের এরা ছাড়তে নারাজ। তা ছাড়া ওদের সম্বন্ধে ধারণাও কত ভুল। এই খুনী আসামীদের সঙ্গে জেলে ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছি আমরা। নিজের চোখে দেখেছি অতি সাধারণ মেয়ে তারা। আমাদেরই মতো ভালোয়-মন্দে মেশানো মানুষ—স্নেহ, দয়ামায়া সবই তাদের আছে। ওদের অপরাধের পেছনে কারণ নানা রকম থাকে। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমাদের চোখে পড়েছে সমাজের উৎপীড়ন আর অভাব।

শহরজানের কথা মনে পড়ে। আঠারো-উনিশ বছরের মেয়ে, বিশ বছর তার জেল, অপরাধ : স্বামীকে বিষ খাওয়ানো। মেয়েটি আমার কাছে দোষ স্বীকার করে বলত, "আমি বুঝতে পারি নি, দিদি। আমার স্বামী বড্ড মারত। আমার এক কাকা একটা ওষুধ এনে বললেন, এটা স্বামীর ভাতের সঙ্গে মিশিয়ে খাইয়ে দিস, তা হলে আর অত্যাচার করবে না, তোর বশ হবে। আমি কি তখন বুঝেছি সেটা বিষ?" মেয়েটির সরল ঢলঢলে, কিছুটা বোকাবোকা মুখের দিকে চেয়ে—কথাটা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হত। ভাবতাম, গ্রামের একটি অশিক্ষিতা, কুসংস্কারাচ্ছন্না সরলা মেয়ের পক্ষে কাকার কথায় বিশ্বাস করা কিছু অসম্ভব ছিল না। অথচ তার সেই অজ্ঞতারই শাস্তি ভোগ করে যাবে সে তার সারা জীবন ভরে। মেয়েটির মন তখনো নির্মল ছিল, বুদ্ধি তখনো অপরিণত। অথচ জেলে যেভাবে তাকে বছরের পর বছর কাটাতে হবে, যে ভয়ংকর আত্মমর্যাদাহীন পরিবেশের মধ্যে জীবনের চোদ্দটা বছর কাটিয়ে যাবে, তাতে জেল থেকে যেদিন সে বেরুবে, সেদিন সে সত্যিই একটি বীভৎস জীবই হয়ে উঠবে।

নিজেকে নিজে প্রশ্ন করতাম, ওর এই জীবনব্যাপী দুঃখের জন্য দায়ী কে? সমাজের অশিক্ষা আর অত্যাচার একদিন ওকে একটা নিদারুণ অসামাজিক কাজের মধ্যে ঠেলে দিল, তার পর সেই সমাজেরই গড়া আইন ওর উপর চাপিয়ে দিল কঠোর শাস্তির বোঝা। আর সেই বোঝার ভারে বিকৃত হয়ে কলঙ্কের কালি কপালে নিয়ে যেদিন সে বেরিয়ে আসবে সেদিনও সে একজন খুনী আসামী, কোনোখানেই তার স্থান নেই, আবার গভীরতর পাপের পঙ্কেই তাকে আশ্রয় নিতে হবে। শুধু কি শহরজান? চোখের সামনে দিয়ে একের পর এক মিছিল করে যায়—জহরা, চোদ্দ বছরের বুদ্ধিমতী মিষ্টি মেয়েটি, সব ডেটিন্যু দিদিরা তাকে ভালোবাসে, সবার কাছে সে পড়ে, গল্প শোনে, 'জুবিলি'র সময়ে সেবার বাইরে যাবার জন্য কী তার ব্যাকুল চেষ্টা, বড়োসাহেবের পা ধরে সে কী কান্না! ছাড়া সে সেবার পেল না—তার বছরখানেক পরেই যক্ষা হয়ে জেলেই মারা গেল।

সদিমন, নইমন দুই পিসি-ভাইঝি, অনেকেরই ধারণা এরা সত্যি-সত্যি খুন করে নি, কিছু একটা ভুল হয়েছে। বুড়ো পিসি সদিমন বলে, "আমার তো আর বাইরেটা দেখা হবে না, জেলেই আমার মাটি কেনা! নইমনের তখন কী যে হবে!"

ভাইঝি নইমন বলে, "আমার আর কী, যা হবার তা হল, পিসির জন্যই কষ্ট হয়, বুড়ো মানুষ!"

দুজনে দুজনকে আঁকড়ে রয়েছে, কোনো গোলমালের মধ্যে যায় না, টনটনে আত্মসম্মানজ্ঞান, কারো কাছে কোনো কিছু চাইতে দেখা যায় না।

থাপুসের মা তিন বছরের মেয়েকে নিয়ে জেলে ঢুকেছে; সব সময়ে মেয়েটিকে বুকে আঁকড়ে রাখতে চায়, সব সময়ে ভয় ভয় ভাব, কখন বুঝি মেয়েটিকে কোল থেকে টেনে নিয়ে যাবে!

এমনি আরো কতজন। এরা সবাই খুনী-আসামী, এদের ছাড়বার কথা কেউ ভাবতেও পারছে না! অথচ এইসব বিশবছরী হতভাগ্যদের বাদ দিয়ে অন্য বন্দীদের মুক্তি দেওয়ার কোনো অর্থই যেন খুঁজে পাই না! ওদের বাদ দিয়ে জেলমুক্তি কথাটা শুনলেও হাসি পায়!

১৫

পণ্ডিত জওহরলাল তাঁর জীবনীতে লিখেছেন জেলের মধ্যে শিশুর অভাববোধটা ছিল অন্যতম। আমাদের ফিমেল ওঅর্ডে এই অভাববোধটা অবিশ্যি ছিল না। প্রায়ই শিশুর কলহাস্যে জেলখানাটা মুখর হয়ে থাকত, প্রায়ই নিত্যনতুন শিশু সমাগম হত। আর, ওদের কারো কারো সঙ্গে আমরাও জড়িয়ে পড়তাম নিবিড়ভাবে।

একদিন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে এমন সময়ে টুং টুং করে বাইরের দরজায় ঘন্টা বেজে উঠল। এমন সময়ে কে ঘন্টা বাজায়? আসামী এল নাকি? ছুটে গেলাম সবাই! সশব্দে দরজা খুলে ঢুকে এল কালো কুট্‌কুটে একটি বছর-চারেকের ছেলে।

ঢুকেই ছেলেটি সশব্দে কান্না জুড়ে দিল, বেরিয়ে যেতে চায়। জমাদারনী ওর মুখের উপর সশব্দে দরজা বন্ধ করে দিল। আহা, কার ছেলে গো—আমরা সবাই বিচলিত হয়ে উঠলাম। আমাদের মধ্যে একজন ছুটে গিয়ে ছেলেটিকে কোলে তুলে নিলেন—"ও খোকা, পাখি দেখবি? লাল পাখি?"

পাখির লোভেই হোক, বা নরম কোলে উঠেই হোক, ছেলেটি এক মিনিট চুপ করল, তারপরই আবার কোল থেকে নেমে পড়তে চায়, সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার, "বাবার কাছে যাব, খুলে দাও দরজা।"

ও দরজা যে খোলে না, শত অনুনয়েও যে খুলবে না—অতটুকু শিশু কী করে আর বোঝে। জমাদারনীরা ততক্ষণ চেঁচামেচি লাগিয়েছে। আমরা ঘরে বন্ধ হতে চলে গেলাম, খোকাকেও অন্য ঘরে আসামীদের সঙ্গে জোর করে বন্ধ করে দিল। রাতেও অনেকবার ছেলেটির কান্না শোনা গেল। সকালবেলা উঠে কিন্তু অবাক হয়ে দেখলাম ছেলেটি দিব্যি জমাদারনীদের সঙ্গে ঘুরছে ফিরছে—কান্নার লেশমাত্র নেই। জমাদারনীর কাছে শুনলাম ওর মা নাকি হাসপাতালে রয়েছে, অসুস্থ, বাবা বিচারাধীন আসামী, অন্য ওআর্ডে আছে। কাজেই মেয়েদের ওআর্ডে নারায়ণকে (ছেলেটির নাম) পাঠিয়ে দিয়েছে। এখানে ও একা একা ঘোরে, ভিখারির ছেলের মতো। জমাদারনীরা কখনো একটু দেখাশোনা করে, কখনো করে না। সবচেয়ে করুণ লাগত যখন ছেলেটি বিজ্ঞের মতো নিজের হাতে ভাত খেয়ে থালা ধুতে যেত। কোনোদিন কেউ হয়তো দয়া করে ওর হাত থেকে থালাটা কেড়ে নিয়ে ধুয়ে দিত, কোনোদিন কারো চোখেও পড়ত না!

আমরা ছিলাম কতকটা শুচিবাইগ্রস্তর দল, জেলে এসে চারিদিকে অপরিষ্কার দেখে দেখে এ রোগটা অনেকেরই হয়েছিল। পরস্পর বলাবলি করতাম, "কী দুষ্টু ছেলে নারাণ, জানো—আর ভারি নোংরা। সেদিন দেখছিলাম নর্দমায় হাত দিয়ে কী সব ঘাঁটছিল।" সব সময়ে সন্ত্রস্ত হয়ে থাকতাম, কখন সেই ময়লা-হাতে এসে আমাদের ছুঁয়ে দেবে! নারাণ কিন্তু কি করে বুঝে নিয়েছিল ওকে আমরা ভালোবাসি। তাই কাছে আসতে চায়। অনেক সময়ে, বেড়াচ্ছি এমন সময়ে ছুটে এসে কোলে মুখ গুঁজে দাঁড়িয়ে রইল, কিংবা দুটো হাত জড়িয়ে ধরল। মায়াও লাগে অথচ কী করি, বড়ো যে নোংরা ছেলে। বলি, "নারাণ, ছুঁসনে, লক্ষ্মীটি, দাঁড়া তোকে বিস্কিট এনে দিচ্ছি আর আম।" স্নেহের কাঙাল, মা-ছাড়া একফোঁটা ছেলে, বিস্কিট তো চায় না, চায় একটু আদর। কাজেই কতদিন আর তাকে দূরে ঠেলে রাখা যায়? প্রথম প্রথম নারাণ ছুঁলে কাপড় ছাড়তাম, হাত সাবান দিয়ে ধুতাম। কিন্তু ক্রমে সে সবই গেল। কিন্তু ওর ওই ধুলোমাখা পায়ে ওকে বিছানায় উঠতে দিই কী করে? অথচ বিছানায় উঠবেই সে। ভোরে রোজ লক্‌আপ খোলার সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকে মশারি তুলে উঁকি মারত—"ওই বাবু, ওঠ্ ওঠ্ না।" বাবু ডাকটা ও কোথা থেকে যে শিখেছিল ও-ই জানে। আমাদের একবিন্দুও ভয় পায় না। একদিন কী একটা দুষ্টুমি করায় রাগ করে একটু বেশি জোরে ধমকে উঠেছিলাম, এক মুহূর্ত একটু থতমত খেয়ে পরমুহূর্তে উল্টে আমাকেই ধমকে

দিল, "চিল্লাচ্ছিস্ কেন?" শোনো একবার কথা! অত রাগের মধ্যেও না হেসে পারি নি। কী করা যায় এ ছেলেকে নিয়ে!

মাঝে মাঝে ওর বাবার সঙ্গে কোর্টে যেত নারাণ। একদিন বেশ-একটু দেরি করে ফিরল। জমাদারনীরা এসে খবর দিল, "শুনেছেন, দিদিমণি, নারাণের মা মরে গেছে হাসপাতালে, আর ওর বাপের মাত্র এক মাস সাজা হয়েছে।"

নারাণকে কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করল, "কীরে নারাণ কী হল তোর?" গম্ভীর মুখে ছেলে বলে, "একমাস সাজা।" নিষ্পাপ কচি মুখখানি দেখে এমন মায়া হয়। মা যে মরে গেছে জানে কি ও?

নারানের একমাস সাজা—অর্থাৎ একমাস পরে ও চলে যাবে। তাই আদর ওর বেড়ে গেল। প্রতিদিন ভাত খাবার সময়ে ও বাটি নিয়ে আসত, আমাদের পাশে বসেই ওর খাওয়া চলত রোজ। কিন্তু একমাস তো সত্যিই বেশি দিন নয়। একদিন ওর যাবার দিন এসে গেল। দুপুরবেলা ঘুমন্ত ছেলেকে জমাদারনী ডেকে তুলল, "নারাণ, ওঠ্ বাড়ি যাবি চল্।" ধড়মড় করে ও উঠে বসল।

আমাদের মধ্যেও সোরগোল পড়ে গেল, "নারাণের জন্য খাবার নিয়ে এসো, নতুন-সেলাই-করা জামাটা পরিয়ে দাও, চুলটা ঠিক করে দাও, মুখে একটু পাউডার।" তা ছাড়া সবার হাতেই একটা করে বাক্স, নারাণের বিদায়-বেলার উপহার। বোকা ছেলে কী ভাবছিল কী জানি, পরিচিত আবেষ্টনী, এতগুলি স্নেহমমতাভরা হৃদয় ছেড়ে যেতে কষ্ট হচ্ছিল হয়তো। তার মুখের সেই দুষ্টু হাসি আজ একবারও দেখা গেল না, সেই অনর্গল কথাও সব বন্ধ। খালি কালো ঢলঢলে চোখদুটি লাল। গেট থেকে বেরুনোর পর কিন্তু দেখলাম বাবার কোলে উঠে দুষ্টু ছেলে হাসছে—গালের জল অবিশ্যি তখনো শুকোয়নি।

"এক্ষুনি আমাদের ভুলে যাবে ও, বাবার কাছে গিয়ে আর মনেও করবে না আমাদের।" আমাদের মধ্যে দার্শনিক বন্ধু একজন বলে উঠলেন, "সবাই ভুলে যায় হে—দুদিন আগে আর দুদিন পরে।"

হলও তাই। নারাণ চলে যাবার পর ওর জন্য মন-কেমন-করা আমরা ভুললাম বাবলুকে নিয়ে। বাবলু মাত্র ছ'মাসের শিশু। ওর মায়ের একবছর জেল। জেলের মধ্যেই দেড় বছরেরটি হয়ে বাবলু বাড়ি গেল। এই একটি বছর মার সঙ্গে ওর সম্বন্ধ কমই ছিল, আমাদের কোলে কোলেই সারাক্ষণ ঘুরত। একরত্তি ছেলের কত যে আদর; ওর জন্য নিত্য নতুন খেলনা আসত; নামই ওর কতগুলো, কেউ বলে বাবলি, কেউ বলে হাবলা, কেউ বলে সোনার বাবলু।

ওর মা চুরি করে জেলে এসেছে। ওরা একধরনের বেদেনীর জাত, চুরি করাই ওদের জাত-ব্যবসা। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ মাঝে মাঝে দুষ্টুমি করে বলত, "বাবলুটা বড়ো হয়ে কী হবে জানো তো? চোরেদের সর্দার। "ঈস্, কক্ষনো না, বাবলু হবে আমাদের স্বাধীন ভারতের সেনাদলের সর্বাধিনায়ক।"

শেষ পর্যন্ত ও-দুটোর কোনোটাই বাবলুকে হতে হয় নি। জেল থেকে বেরুনোর মাস ছয়েক পরেই খবর পেয়েছিলাম বাবলু আর তার মা দুজনেই বসন্ত হয়ে মারা গেছে।

এবারও প্রেসিডেন্সি জেলে আমরা প্রায়ই নানারকম জলসা, অভিনয় আর উৎসবের আয়োজন করতাম। এবার আগেরবারের চেয়ে কড়াকড়ি কম। জেলের অফিসাররা কেউ কেউ নিজেরা এসে আমাদের স্টেজ বেঁধে দিয়ে যেতেন। বাইরে থেকে সাজ-পোশাক, পরচুলা সবই আনানো হত। কাজেই অভিনয় সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে ওঠার কোনো বাধাই আর থাকত না।

এ ছাড়া এবারকার রাজবন্দিনীরা জেলের ভিতর ও বাইরের প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দিন যথোচিত অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে উদ্‌যাপন করতে আরম্ভ করেছিল। সাধারণ কয়েদীদের পক্ষে এটা খুবই ভালো হত, আমাদের পক্ষেও ভালো—বাইরের সঙ্গে একটা যোগ রেখে চলা আর কি! কিন্তু তবু এ-ও মাঝে মাঝে ভাবি একঘেয়ে লাগত, মনে হত বছরের মধ্যে এতগুলি মানবার দিন না থাকলেই যেন ছিল ভালো। একদিন আমার একটা ভারি মজার অভিজ্ঞতা হয়েছিল। স্বপ্ন-জাগরণে মেশানো সে এক বিচিত্র অনুভূতি। পরের দিন 'লেনিন-ডে'—বন্ধুরা সভা করবে। প্রত্যেকবারই সভায় চুপ করে বসে থাকি, ভালো দেখায় না। কাজেই এবার সংকল্প করলাম একটা প্রবন্ধ লিখে পড়া যাবে। অতএব সেদিন সন্ধ্যার পর বন্ধ ঘরে চাদরটা পায়ের উপর টেনে দিয়ে বিছানার কাছে হ্যারিকেনটা রেখে কাগজ পেনসিল নিয়ে বসে গেলাম।

একটু শীত শীত করছিল, চোখে যেন একটু ঘুমের আমেজ। তবু মনটাকে শক্ত করে শীতের সন্ধ্যালস্য দূরে ঠেকিয়ে রেখে লেনিনের স্মৃতি-তর্পণের চেষ্টা করতে লাগলাম। অল্প দু-চার লাইন কী লিখেছি, হঠাৎ কানের কাছে শুনতে পেলাম একটা পুরুষ-কণ্ঠের হাসি আর তার সঙ্গে সহাস্য প্রশ্ন, "কী লিখছ?"

চমকে তাকিয়ে দেখি, এ কী! আমার বিছানার পাশে খুব কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন লেনিন নিজে! সমস্ত শরীর স্তব্ধ হয়ে গেল। আমি কি স্বপ্ন দেখছি? জেগে জেগে স্বপ্ন? স্বপ্নের মানুষ এত স্পষ্ট হয়? কিন্তু স্বপ্ন যদি বাস্তবের চেয়েও প্রখর হয়ে দেখা দেয় তাকে স্বীকার না করেই বা উপায় কী? নিজের অজ্ঞাতেই কখন পাশের চেয়ারের উপরকার স্তূপাকার বইপত্র সরিয়ে আগন্তুককে বসতে দিয়েছি, টের পাই নি। আমার টেবিলের এলোমেলো বইগুলোর পাতা ওলটাতে ওলটাতে অতিথি আবার প্রশ্ন করলেন, "কই, উত্তর দিলে না যে?" একটু ভয়ে ভয়ে, একটু সলজ্জভাবে হাতের খাতাটাই এগিয়ে দিলাম, গলায় তখনো স্বর ফুটছিল না। খাতাটায় একবার চোখ বুলিয়ে আমার হাতে ফিরিয়ে দিলেন, মুখে কেমন চাপা হাসি।

এবার আর চুপ করে থাকতে পারলাম না, বললাম, "খুব খারাপ হচ্ছে বুঝি?"

"না, খারাপ হবে কেন, তোমাদের বাঙালিদের লেখা কি কখনো খারাপ হয়? শুধুমাত্র কথার ফেনা দিয়ে রঙিন বুদ্‌বুদ্ তৈরি করতে তোমরাই হচ্ছ জগতের শ্রেষ্ঠ জাত—এ প্রশংসা তোমাদের অতি বড়ো শত্রুও করবে।"

হঠাৎ এরকম জাতিগত আক্রমণে মাথাটা গরম হয়ে উঠল, একটু উত্তপ্ত স্বরে বললাম, "তা তো ঠিকই, বাঙালি তো কেবল কথার বুদ্‌বুদই তৈরি করে। বাঙলা দেশের লোকের অন্য কোনো পরিচয় তো পাও নি তুমি!"

এবার লেনিনের হাসির সঙ্গে মিশল একটু কোমলতার আমেজ, "না না, তা আমি বলি নি! আদর্শের জন্য পাগল হয়ে উঠতে তোমরা পারো ঠিকই। তবে কি জানো, শুধু ওতেই কাজ হয় না।" তারপর একটু থেমে, "মুহূর্তের উত্তেজনায় সর্বস্ব বিলিয়ে দিতে তোমাদের বাধে না বটে, কিন্তু একটা মরা-জাতকে টেনে তুলতে হলে দরকার যে বিপুল শ্রমসাপেক্ষ ক্লেশকণ্টকিত জীবনযাপন—তার তোমরা বড়ো অযোগ্য। যতদিন না দেশের অগণিত সর্বহারা নরনারীর সঙ্গে তোমরা নিজেদের মিশিয়ে দিতে পারবে..."

এবার একটু উৎফুল্ল হয়ে বলে উঠলাম, "জানো না বুঝি? আমরাও আজকাল ঠিক ওই কথাই বলি?"

"এই 'আমরা'টি কারা?"

"আমরা মানে দেশের কর্মীরা। আজকাল তো প্রায় প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলই এ ব্যাপারে অন্তত একমত যে গণজাগরণ, গণবিপ্লব না হলে—" কথার স্রোতে বাধা পেলাম।

"তোমার নিজেরও নিশ্চয়ই তাই-ই বিশ্বাস?"

একটু বিরক্ত হয়ে বললাম, "সেও কি আবার জিজ্ঞাসা করতে হয়?"

"কী করে বুঝব বলো, তোমাদের বিশ্বাসে আর কাজে যে এত আশমানজমিন তফাৎ তা আমাদের মোটা রুশীয় বুদ্ধি নিয়ে বুঝতে একটু দেরি হয় বৈকি।"

'কী এমন তফাৎ দেখলে তুমি?"

"কী তফাৎ দেখলাম? বল কী? বিশ্বাস তুমি যা-ই কর, কাজের বেলায় যে তুমি একেবারেই শূন্য সে জ্ঞানও তোমার নেই?"

ভগ্নস্বরে বললাম, "বাইরে যে ক'বছর ছিলাম, বিশেষ কিছু করতে পারি নি ঠিকই। তবে একেবারে কিছু যে করি নি তাও তো নয়। অমুক অমুক মিলের শ্রমিকদের মধ্যে ইউনিয়ন করেছি; একটি ধর্মঘটে জয়লাভ করেছি; অমুক অমুক গ্রামেও মাঝে মাঝে যাওয়া-আসা করেছি। কিন্তু তুমি তো জানো এ-সব কাজ কত শক্ত! বেশি-কিছু পেরে উঠি নি ঠিক, কিন্তু আরো কিছুদিন থাকলে—"

এবার লেনিনের দৃষ্টিতে আবার কোমলতার আভাস ফুটে উঠল, "দ্যাখো, তুমি মনে কষ্ট কোরো না। কতটুকু কী পেরেছ তাই দিয়ে আমি তোমাদের বিচার করছি না। আমি বলতে চাই তোমরা ঠিক কাজের ধারাটাই বোঝ না। অথবা বুঝেও বোঝ না, নিজেকে ফাঁকি দাও—অতটা দুঃখস্বীকারের সহিষ্ণুতার তোমাদের মধ্যে অভাব।"

"কী থেকে বুঝলে?"

"বুঝি অনেক কিছু থেকেই! এই জেলের মধ্যেই যে তোমরা বছরের পর বছর কাটিয়ে দাও, এখানে তোমাদের দেশের কত দুঃখী-বঞ্চিতের দলের সঙ্গে তোমাদের দেখা হয়, অথচ তাদের সঙ্গে কতটুকু মেশ তোমরা, কতটুকু প্রভাব পড়ে তোমাদের ওদের উপর? বলতে পারো কী শিক্ষা দিচ্ছ তোমরা ওদের?"

"কিন্তু তুমি তো জানো ওদের সঙ্গে মিশতে জেলে কত বাধা।"

"বাধা?" এবার লেনিনের কণ্ঠ গর্জন করে উঠল, চোখদুটিতে ফুটে উঠল দুঃসহ দীপ্তি, "বিপ্লবীদের অভিযানে বাধা বলে কিছু আছে নাকি? বাধা থাকলেই বা তোমরা মানবে কেন? আমি হলে—"

"তুমি হলে?"

"আমি হলে কবে কোন্ দিন সমস্ত বাধা ভেঙে চুরমার করে দিতাম। এক জায়গায় রাখবে অথচ সবার সঙ্গে মিশতে দেবে না, এও কখনো সম্ভব?"

অবিশ্বাসের সুরে বললাম, "তা হলে তোমাকেই সরিয়ে নিয়ে যেতো, কিংবা একা সলিটারি সেল্-এ বন্ধ করে রাখত।"

"তা রাখুক, কিন্তু তার মধ্যেও তো আমার থাকত একটা মস্ত বড়ো পরাজয়ের সম্মান। কিন্তু তোমরা এ কী করছ? মুখে তোমরা বলো জনসাধারণের স্বার্থ আর তোমাদের স্বার্থ এক। অথচ জেলে তোমরা নিজেরা কয়েকজন মিলে একটা অভিজাত শ্রেণী গঠন করে পরম বিলাসিতায় দিন কাটাচ্ছ। সাধারণ কয়েদীদের সঙ্গে তোমাদের সম্পর্ক—মনিব-ভৃত্যের সম্পর্ক ছাড়া কিছুই নয়। তোমাদের আহার্য চব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয়, আর ওদের, যারা তোমাদের জন্যই খেটে মরছে, উঠতে বসতে তোমাদের ধমক খাচ্ছে—ওদের খাওয়াপরার দিকে তাকানো যায় না!"

"কী করতে পারি আমরা?"

"কী করতে পার? তোমরা যা-কিছু পাও সবার সঙ্গে সমান ভাগ করে নিতে পারো, তাতে আর কিছু না হোক এই এতগুলি বঞ্চিতের দল তোমাদের আপন ভাবতে শিখবে। যদি বলো কিছুই তাতে কুলোবে না, তা হলে নিজেরাও এ-সব নেওয়া বন্ধ করে দিতে পারো।"

মনে মনে অনেক যুক্তি মাথা তুলে দাঁড়াতে চাইছিল : তাতে গভর্ণমেণ্টের অনেকগুলি টাকা বাঁচবে যে। তাছাড়া ঠিক অতখানি কষ্ট সহ্য করতে পারব কি? অভ্যস্ত তো নয়, স্বাস্থ্য কি টিকবে? পড়াশোনার কী করা হবে? সেও তো আমাদের দরকার—মুখে কিন্তু একটি কথাও বলতে পারলাম না। বিপ্লবী, তথাকথিত শ্রেণীমুক্ত কর্মীর মুখে যুক্তিগুলো কত যে অসার আর তুচ্ছ শোনাবে নিজেই সেটা উপলব্ধি করলাম। লেনিন স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন আমার দিকে, কিছুক্ষণ পরে বললেন, "কী ভাবছ? ভাবছ বড়ো শক্ত কাজ। দেশের জন্য মাথাটা এগিয়ে দিতে বরং পারলেও পারতে পার, কিন্তু প্রতিদিনের এই নির্যাতন সহ্য করতে পারবে না। তাই না?"

মাথাটা নিচু করে চুপ করে রইলাম। লেনিন এবার উঠে দাঁড়ালেন, "ঠিকই তাই। আমি আগেই জানতাম। আর শুধু তুমি কি একা! সারা ভারতবর্ষের সব জেলেরই তো আমি খবর রাখি...জওহরলাল, জয়প্রকাশ থেকে আরম্ভ করে আজকালকার ছাত্র কম্যুনিস্টকর্মী, সকলেরই ঠিক একই অবস্থা! আভিজাত্যের স্বাচ্ছন্দ্য তোমরা ছাড়তে পার নি, তোমাদের দেশের নিরানব্বুইজন গরিবের সঙ্গে নিজেদের মিশিয়ে দিতে পার

নি। তোমাদের গণবিপ্লবের আদর্শ অনেকটা পুঁথিগত, বুদ্ধি দিয়ে তাকে গ্রহণ করেছ, জীবন থেকে রেখে দিয়েছ বহুদূরে। কে জানে কতদিনে, কতযুগ পরে, এ দেশের মাটিতে সত্যিকারের কর্মীর দল গড়ে উঠবে। ভেবেছিলাম রাশিয়ার পর বুঝি ভারতবর্ষ—কিন্তু এই যদি হয় দেশের কর্মীর নিদর্শন—"

"এ কি বীণাদি, মাথার কাছে এমন করে আলোটা জ্বেলে রেখে ঘুমিয়ে পড়েছ? মশারি ফেলে দিয়ে যাব?"

ধড়মড় করে উঠে বসলাম, অর্ধসমাপ্ত প্রবন্ধ লেখা খাতাটা মাটিতে লুটোচ্ছে, পেনসিলটা তখনো হাতের মুঠোয় ধরা!

'লেনিন-ডে'র সভায় এবারও আমি অন্যবারের মতোই বোকার মতো চুপ করে রইলাম। সভার শেষে কে যেন আমাকে জিজ্ঞাসা করল, "আমার বক্তৃতাটা আজ কেমন হল?"

মুখ দিয়ে অতর্কিতে বেরিয়ে গেল—"ওসবে কিছু হবে না।" বন্ধুটির বিস্মিত দৃষ্টিতে চমকে গিয়ে তাড়াতাড়ি নিজেকে শুধরে নিলাম, "না না ভাই—কী বলতে কী বলেছি, খুব ভালো হয়েছে, বক্তৃতা কি তোমার কখনো খারাপ হয়!"

১৬

১৩৫০ সালের দুর্ভিক্ষের আর্তনাদ কারাপ্রাচীর ভেদ করে আমাদের কানে সবটুকু যেত না সত্যি, তবু যেটুকু ঢুকত তাতেই দিনরাত্রি বিষাক্ত করে তোলার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। সে-সময়ে একটি বন্ধুর কাছে একটা চিঠি লিখেছিলাম বসে বসে। চিঠিটা তাকে পাঠানো হয় নি, আমার কাছেই রয়ে গেছে। তার মধ্যে আমাদের সে-সময়কার মনের ছবি খানিকটা ধরা রয়েছে মনে করে এখানে তুলে দিলাম :

ভাই উমা, তোমরা সবাই হয়তো ভাবো জেলে এসে আমরা একদিক দিয়ে অনেকখানি বেঁচে গিয়েছি। মানুষের চরম দুর্দশা আর যন্ত্রণার দৃশ্য প্রতিনিয়ত আমাদের দেখতে হল না। স্টেট্‌সম্যান-এর ছবির মধ্যে দিয়ে দেখা আর বাস্তবে দেখা, তার কি তুলনা হয়? দূরে বসে কল্পনায় বিচলিত হওয়া এক জিনিস, আর কাছে থেকে প্রতিকারহীন আর ক্ষোভে নিজের হাত-পা কামড়ানো অন্য জিনিস। কথাটা ঠিকই ভাই। বেঁচেছি তো নিশ্চয়ই। তোমরা যখন সকাল থেকে রাত্রি অবধি ছুটোছুটি করছ—মিল্ক ক্যান্টিন আর লঙ্গরখানা আর অ্যাম্বুলান্সে—পায়ে পায়ে তোমাদের বেজেছে অগণিত গলিত মৃতদেহ, দু'কান ভরে বেজেছে শুধু ক্ষুধিতের কান্না "ফ্যান দাও মা, একটু ফ্যান," তখন আমরা! কিন্তু সে আর বলব না। আজকের দেশের এই পটভূমিকায় আমাদের এই স্বাচ্ছন্দ্য আর বিলাসিতার ছবি তোমাদের অসহ্য বোধ হবে, ক্ষমা করতে পারবে না আমাদের! কিন্তু যা বলতে চাইছিলাম—এক হিসেবে বাঁচলেও, পুরোপুরি বাঁচি নি।

জানো তো 'কমলি নেই ছোড়তা!' আমরা 'রাজপ্রাসাদের' অভ্যন্তরে লুকিয়ে বসে থাকলেই যে পৃথিবীর দুঃখব্যাথি যন্ত্রণা আমাদের ছেড়ে দেবে সেও কি কখনো সম্ভব? সিদ্ধার্থও তো রাজপুত্র ছিলেন। রাজপ্রাসাদে থাকতেন, তবু তো—তুমি হয়তো আপত্তি করবে, বলবে, উপমাটা এখানে বড়ো খাপছাড়া হল, তা ঠিক, আমিও তা মানছি। জানো উমা, আমাদের এই 'রাজপ্রাসাদের' আর একটা নাম 'দুঃখের ঘর'। এ নাম আসামীদের দেওয়া। কবে যে প্রথম দেয় তা জানি না। কিন্তু আমরা জেলে এসে অবধি শুনছি। এমন উপযোগী নাম তোমার মতো কবিও শত চেষ্টাতেও কিন্তু দিতে পারত না। 'দুঃখের ঘর' বলে 'দুঃখের ঘর'!

মহাসাগরের নামহারা কূলে
জগতের যত ভাঙা জাহাজের ভিড়।

তোমাদেরই কোনো কবি লিখেছিলেন না? কী দেখে লিখেছেন জানি না। আমি তো দেখি যত ভাঙা জাহাজের ভিড় সব আমাদের এই জেলের দরজায়। যত অক্ষম, যত দুর্বল, যত ব্যাধিগ্রস্ত—সবার শেষ স্থান, শেষ আশ্রয় যেন এই জেল। এমন রোগ নেই যা তুমি খুঁজে পাবে না এখানে, এমন অপরাধ নেই যা করে নি এরা। অপরাধ-বিজ্ঞানের চর্চা করতে বলেছিলে। আমার ভাই ও-সব হয় না। তা ছাড়া আমার তো মনে হয় এদের অপরাধ করার মতো এমন সহজ স্বাভাবিক ব্যাপার আর কিছুই হতে পারে না। খেতে পায় না, ছেলেপুলে অনাহারে মরছে, করবে না চুরি? শিক্ষা নেই, কোনো জ্ঞানবুদ্ধির উন্মেষ হতে পারল না কোনোদিন অথচ ঘাড়ের উপর চেপে রইল সমাজের কতগুলো মিথ্যা শাসন আর চোখরাঙানি—সেখানে অসামাজিকতা দেখা দেবে না বীভৎস মূর্তি ধরে?

কিন্তু যা বলছিলাম, তোমরা বাইরে দেখেছ, প্রতিদিন দেখছ ক্লীব মানুষদের পথে শুয়ে-শুয়ে নির্বাক হয়ে মরতে। কিন্তু ওদের মধ্যেই কেউ কেউ যে প্রতিবাদও করেছে, কতগুলো মেয়ে যে কঙ্কালসার দেহটাও অতি কষ্টে সোজা করে রেখে লুট করে খাবার চেষ্টাও করেছে সে খবর বোধ হয় তোমরা জানো না। জানলেও কাগজে কোথায় এক প্রান্তে একটুখানি উঠেছে, মনোযোগ দাও নি বিশেষ।

আমরাও প্রথমটা বেশ একটু চমকে গিয়েছিলাম। হঠাৎ একদিন সন্ধ্যাবেলা দেখি আমাদের জেলের উঠোনে ভিড় জমে গেছে। প্রথমটা মনে হয় ঠিক যেন কোনো শ্রমিক-নেত্রীর পরিচালিত শোভাযাত্রার মতো দৃশ্য, হাতে ঝাণ্ডা নেই শুধু। শুনলাম, সরকারের চালের লরি লুট করেছে এরা। কিন্তু ঠিক লুটেরার মতো চেহারা তো নয় এদের! একেবারেই গরিব বাঙালি চাষী বৌ, দিনমজুরের বৌদের মতো চেহারা। কে জানে এদের পেছনে কেউ ছিল কি না, কোনো প্রতিষ্ঠান, কোনো দল। অনেক প্রশ্ন করেও সেটা ওদের থেকে বের করতে পারলাম না, কেবলই বলে, "না, কেউ শেখায় নি, নিজেরাই করেছি!" বিশ্বাস করলাম না, কিন্তু খুশি হলাম। প্রথম দিন ওদের মুখগুলো কিছুটা নির্বিকার লাগল, যেন এর জন্য প্রস্তুত হয়েই ছিল, কিছুটা বিষণ্ন, এ

কোথায় এসে পড়লাম গোছের ভাব! তারপর রাত কাটতে-না-কাটতেই কিন্তু ওদের আরম্ভ হল রাজ্যের ভাবনা, চিন্তা, কান্না। একটি মেয়ে দুধের ছেলে ফেলে এসেছে; কেবলই কাঁদে, "বাড়িতে আর কেউ নেই গো! শুধু স্বামী—"

"স্বামী আছে, তবে আবার কাঁদছ কেন?"

"স্বামীর যে কাশ" অপর একজন বলে দিল।

একমুহূর্তে ব্যাপারটা স্বচ্ছ হয়ে উঠল। মেয়েটির কান্নাভরা মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবলাম, বাঙলার মেয়েকেও ধান লুট করতে শক্তি দেয় যে অভাব সে অভাব যে কী জিনিস এতক্ষণে বুঝলাম। সরকার অবিশ্যি এদের বেশিদিন আটকে রাখল না। কিছুদিন পরে সকলকেই ছেড়ে দিল। আমরা বলাবলি করলাম, "জেলে রাখলে খেতে দিতে হবে যে। তার চেয়ে বাইরে বরং না খেয়ে মরে গিয়ে সরকারের বোঝা লাঘব করবে।"

এরপর আবার এল আর-একদল। এবার আর লুট নয়, কলকাতায় চাল বেচতে এসেছিল—কলকাতার আশেপাশের গ্রামের মেয়েরা। কলকাতায় বাইরের চাল আনা যে নিষিদ্ধ তা কি এরা জানে না? কেউ জানে না, কেউ জানলেও ভালো করে বোঝে না, কেউ জেনেশুনেও এসেছে—"দুবার তো বেচেছি এর আগে, তখন তো ধরে নি।" এদের বড় আফসোস, "আমরা তো আর কারুর চুরি করিনি, মহাজনের কাছে চাল কিনে শুধু বেচতে গিয়েছিলাম, দুপয়সা যা পাই। তার জন্য এত নিগ্রহ?"

মুনাফাখোরী থামাবার জন্য কর্তৃপক্ষ খুব কড়া উপায় অবলম্বন করছেন—কাগজে পড়তাম রোজ, মনে সমর্থনও ছিল। মুনাফাখোরী যারা করে তাদের কথা ভাবতেই আগে আমার মনের মধ্যে ছবি জাগত হৃষ্টপুষ্ট নধরকান্তি এক-একটি টাকার কুমীর—অতিভোজনে যারা অথর্ব; 'রোল্‌স-রয়েস' ছাড়া যারা এক পাও নড়তে পারে না; কলকাতার বড়ো বড়ো প্রাসাদগুলো যাদের নিত্যনতুন ঢঙে গড়ে উঠছে—যার দিকে তুমি আমি লোভীর মতো চেয়ে থাকতাম পথ চলবার সময়ে। তুমিও নিশ্চয়ই আজও এই রকম কিছুই কল্পনা করে বসে আছ? অন্তত তোমার সে ভুল ভাঙাবার জন্যই একবার জেলে এসে দেখে যাও দেশের সরকার কাদের, কী ধরনের জীবদের তার পরমতম ও ভয়ংকরতম শত্রু মনে করে। তুমি দেখবে এদের মধ্যে কেউ আছে সত্তর বছরের বুড়ি, সব-কটি চুল পাকা, সব-কটি দাঁত পড়া। কারোর পিঠের মেরুদণ্ড এমন বাঁকা যে সব সময়ে কুঁজো হয়ে, বাঁকা হয়ে চলে, দেখলেই মনে হয় ধরে বসিয়ে দিই। কেউ বা নাবালিকা, তেরো-চোদ্দ বছরের কচি মেয়ে, না-খেতে-পাওয়া শীর্ণ মুখখানিও যার লাবণ্যে ঢলঢল করছে। কেউবা 'মা'—বাড়িতে যার দুই ছেলে বসন্তে আক্রান্ত হয়ে অনাহারে পড়ে আছে, যে তোমাকে দেখলেই তোমার হাত ধরে বলবে, "আমার ছেলেদের কী হবে দিদি?"

উমা ভাই, এদের দেখেশুনে বলে উঠতে ইচ্ছে হয় না কি?—"জয় হোক আমাদের চিরবান্ধব আমেরী-ওয়াভেল-নাজিমুদ্দীন গভর্মেন্টের সাধু চেষ্টার, সফল হোক, দেশব্যাপী মুনাফাখোর নিধনের মহা আন্দোলন! জেলের জালের মধ্যে যখন সরকার এতগুলি

ভয়ংকর ভয়ংকর শত্রু এত সহজে আটকে ফেলতে পেরেছে তখন বাঙলা দেশের চালের সমস্যা না মিটে আর যায় কি?"

তাই তো বলছিলাম, একবার এখানে এসে পড়ো, অনেক কিছু নতুন জিনিস চোখে দেখে যেতে পারবে যা বাইরে থেকেও তোমরা দেখ নি। কেমন আছ? আমাদের বাইরে যাবার আর বেশি দেরি নেই, অন্তত জনশ্রুতি তো সেইরকম।

আসি আজ। ইতি তোমার বীণা।

১৭

প্রেসিডেন্সি জেলের ভিতর দেখতে দেখতে তিনটে বছর কেটে গেল। ১৯৪৫ সালের মে মাসের একটি প্রভাতে যুদ্ধ-বিরতির সংবাদ খবরের কাগজের মারফত আমাদের কাছে এসে পৌছল। মস্ত বড়ো খবর। সমস্ত পৃথিবী এই দিনটির দিকে গভীর উৎকণ্ঠায় তাকিয়ে ছিল। এর উপর নির্ভর করছিল যত কোটি কোটি মানুষের জীবনমরণ। তবু এমনিই স্বার্থপর মানুষের মন যে সে-সব কোনো কিছুই আমাদের মনে পড়ল না। আমাদের খালি মনে হতে লাগল যুদ্ধ থেমেছে, এবার আর আমাদের আটকে রাখবে না, মুক্তি আমাদের আসন্ন!

হলও তাই। সেই বছরই শরৎকালের একটি শুভ্র প্রভাতে আবার বাইরের আলোয় এসে দাঁড়ালাম। আমাদের আশা অবশ্য পূর্ণ হল না, স্বাধীন ভারতে বেরুবো ভেবেছিলাম, কিন্তু বেরিয়ে আসতে হল যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত, দুর্মূল্যতায় অভুক্ত, দুর্ভিক্ষে উজাড় হয়ে-যাওয়া, অর্ডিনান্সের নাগপাশে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়ানো মৃতকল্প ভারতবর্ষে!

কিন্তু এও ঠিক, বাইরে থেকে যা মনে হয় শুধুই ব্যর্থতায় ভরা—শতধা বিচূর্ণ, বিদীর্ণ, বিকৃত—তারও ফাঁকে ফাঁকে কত শক্তি, কত সার্থকতাই না সঞ্চিত হয়ে থাকে। মানুষের ব্যক্তিগত জীবনেও তাই, একটা জাতির সমষ্টিগত জীবনেও তাই। আমাদের জীবন কতবার একেবারে সমে এসে থেমে গেছে, মনে হয়েছে আর বুঝি এক পাও যেতে পারব না, মনে হয়েছে এবার নিঃশেষ হয়ে গিয়েছি, হয়েছি দেউলিয়া। কিন্তু আশঙ্কা সত্য হয় না। শেষের মধ্য থেকে অশেষ আত্মপ্রকাশ করে।

জীবনের শূন্যপাত্র আবার কানায় কানায় ভরে যায় :

> এ জীবনে সদাই ঘটে ক্ষয়
> ক্ষতি তবু হয় না কোনো মতে।

জাতির জীবনেও তেমনি। অনেক কিছু ঘটনাই বাইরে থেকে মনে হয় শুধুই বিফলতাপূর্ণ, শুধুই পরাজয়ে ভরা। অথচ তারই ভিতর থেকে যে জাতির নতুন জন্মলাভ হয়েছে, অনন্ত শক্তির গোপন উৎস যে খুলে গিয়েছে, স্বল্পদৃষ্টি আমার কিছুই তার বুঝতে পারি না। তাই পরে যখন হঠাৎ সেটা চোখে পড়ে, চমকে উঠতে হয়। ভাবি কী করে সম্ভব হল? এ যে আমাদের সব প্রত্যাশার সব সাধনার অতীত জিনিস।

আমাদের এবার বাইরে এসে খানিকটা সেই অবস্থা হল। অত্যন্ত ডিমরালাইজড্‌ একটা পরিস্থিতির জন্য মনে মনে প্রস্তুত হয়ে এসেছিলাম। যুদ্ধের ফলে এবার আমাদের সমাজের মধ্যে গভীর ভাঙন ধরেছে জানতাম। সমাজের নৈতিক জীবন যে-স্তরে নেমে গিয়েছে সেটা অনেকেরই কল্পনারও অতীত ছিল। 'কালোবাজারে'র কালিমায় তো সারা দেশ আচ্ছন্ন। দেশজোড়া এইসব অধঃপতন আর অন্ধকার তার চরমে গিয়ে ঠেকল দুর্ভিক্ষের সময়ে। সেটাই গিয়েছে আমাদের ১৯৪৩ সালের পর থেকে একটানা অধোগতির চরম সীমা। আমরা যখন বেরিয়ে এসেছি তখন কিন্তু অবস্থা উল্টো খাতে বইতে শুরু করে দিয়েছে। বাইরে বেরিয়ে স্পষ্ট অনুভব করলাম, যা রেখে গিয়েছিলাম সে অবস্থা আর দেশে নেই। সমস্ত দেশ এই কটা বছরে ভয়ংকর বীভৎসতার মধ্য থেকে উত্তীর্ণ হয়ে এসে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কলঙ্কের কালি হয়তো অনেক জায়গাতেই লেগে আছে, তবু সব মিলিয়ে, ওই-সব নিদারুণ অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও হয়তো কতকটা ওরই জন্য জাতিগতভাবে আমরা অনেক শক্ত, দৃঢ়সংবদ্ধ আর নির্ভীক হয়েছি। মনের মধ্যে একটা আশ্বাসের সুর খুঁজে পেলাম, "যা চরম দুর্দিন তা আমরা পার হয়ে এসেছি, এবার আমাদের যাত্রা হবে আরো বেশি পাথেয় নিয়ে, আরো বলিষ্ঠতর পদক্ষেপে।"

আমাদের জেল থেকে বেরুনোর অল্প কিছুদিন পরেই শুনলাম বম্বেতে নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন হচ্ছে। আমার ছুট্টুদি বম্বেতে রয়েছেন। অতএব বাবাকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম—ছুট্টুদির বাড়ি বাবাকে নিয়ে যাওয়া, বম্বে দেখা, তিনবছর জেলবাসের পর একটুখানি ইচ্ছেমতো বেড়ানো, আর সর্বোপরি এতদিন পরে নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন—গুরুত্বে, আয়োজনে, আড়ম্বরে, যা প্রায় কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশনের মতো হচ্ছিল, তাতে যোগ দেওয়া—এতগুলো কাজ একসঙ্গে হবে, মন পূর্ণ তাই আনন্দ আর উৎসাহে।

নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে কিন্তু যা আশা করে গিয়েছিলাম সেরকম কিছু পাওয়া গেল না। সিমলা কনফারেন্স ব্যর্থ হওয়ার পর দেশ চাইছিল একটা নূতন পথনির্দেশ; অনেকদিনের নৈষ্কর্ম্যের অবসাদের পর মনের মধ্যে একটা চলার আবেশ সকলকেই যেন কিছুটা চঞ্চল করে তুলছিল। 'এ, আই. সি. সি.' কিন্তু 'এখন না, এখন যে যার জায়গায় গিয়ে লক্ষ্মী ছেলের মতো আরো শক্তি অর্জন করো, তারপর যখন ডাক আসবে' গোছের কতগুলি প্রস্তাব গ্রহণ করে আমাদের বিদায় করে দিলেন। সকলের কাছে শুনলাম তিন বছর আগে ঠিক ওই জায়গাতেই হয়েছিল ১৯৪২ সালের অধিবেশন। ওরই কিছু দূরের মাঠে মহাত্মাজী ধরা পড়বার পর কস্তুরবা সভা করেছিলেন। 'টীয়ার গ্যাস' আর লাঠি আর বন্দুকের গুলি দিয়ে সভা ছারখার করে দেবার চেষ্টা হয়েছিল—কেউ পালায় নি, ছেলেরা বীরের মতো পতাকা হাতে সামনে এগিয়ে গিয়েছিল; মেয়েরা, সেবিকাদল এক হাতে ভিজে রুমাল অন্য হাতে বালতি-ভরা জল সকলের কাছে এগিয়ে দিয়েছে টীয়ার গ্যাসের প্রতিষেধক হিসেবে, কানের পাশ দিয়ে মাথার উপর দিয়ে গুলি চলেছে—খেয়াল নেই : "এসেছে সে একদিন।" তার সঙ্গে তুলনায় এবারকার অধিবেশন যেন নিতান্তই প্রাণহীন লাগল।

তাছাড়া, ১৯৪২ সালের অধিবেশনে ছিল শুধু কর্মী আর যোদ্ধাদেরই সমাবেশ। এবার তাদের থেকে দর্শকদেরই ভিড় বেশি। তার উপর শুনলাম টিকিট বিক্রি নিয়েও নাকি অনেক কালোবাজারী ব্যাপার এখানে চলেছে। ১৯৪২ সালে যে প্রাণপণ করে লড়াই করেছে সে হয় ঢুকতেই পায় নি, নয় পিছনে কোন্ কোথায় যে বসে রয়েছে কেউ জানে না। আর সামনের সীটে হাজার টাকার নোট ফেলে দিয়ে জায়গা করে নিয়েছে যত সব টাকাওয়ালা স্বার্থ-সর্বস্ব লোক—১৯৪২ সালের সংগ্রামের সময়ে যাদের টিকিও কেউ দেখতে পায় নি। কী করতে যে ওরা এত উৎসাহ করে এসেছে তাও জানি না; কংগ্রেসটা কি একটা মজা দেখবার জায়গা হয়ে উঠল নাকি? মহাত্মাজী ১৯২৮ সালের কলকাতা-কংগ্রেসের আড়ম্বর দেখে পরিহাস করেছিলেন, "ফিলিস্ সারকাস্‌টা জমেছে ভালো!" এবার তিনি কী বলবেন? শুনলাম, শুধু আমাদের নয়, সকলেরই এটা খারাপ লেগেছে এবং কংগ্রেসের কর্তৃপক্ষ ঠিক করেছে যে এরপর থেকে নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির এরকম প্রকাশ্য অধিবেশন আর করা হবে না—দর্শকদের আসা নিষিদ্ধ থাকবে। ১৯৪২ সালের আন্দোলন নিয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করা হল। প্রস্তাবটি মোটামুটি মন্দ না। কিন্তু এক জায়গায় রয়েছে : যা-কিছু হিংসাত্মক কাজ দেশবাসীর পক্ষ থেকে হয়েছে তার জন্য "আমরা অনুতাপ জ্ঞাপন করছি।" 'অনুতাপ' কথাটা আমাদের অনেকেরই ভালো লাগে নি। অহিংসাই যে কংগ্রেসের নীতি তা ঠিক। তবু দেশব্যাপী গণবিপ্লবের সময়ে ওই সাধারণ নীতির কিছুটা এদিক-ওদিক হওয়া অনিবার্য এবং না হওয়াটাই অসম্ভব। আর যা অনিবার্য তা নিয়ে দুঃখপ্রকাশ করতে যাওয়া কংগ্রেসের মতো রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের শোভা পায় না। এক মহাত্মাজী ছাড়া এতে আহত হবার মতো অহিংসাপ্রীতি কংগ্রেসের নেতাদের মধ্যে আর কারো কাছে আছে বলে আমাদের জানা নেই। সেজন্য অনুতাপ কথাটার মধ্যে যেন একটু ভণ্ডামির আভাসই ফুটে উঠতে চায় বলে মনে হয়; শুধু তাই নয়, কেমন যেন মনে হয় ওটা ইংরেজের মুখের দিকে চেয়ে কয়েকটা ভয়ে ভয়ে বলা, যেন ভাবটা : "তোমরা কিছু মনে কোরো না, দুষ্টু ছেলেরা যা করেছে—কী আর করা যাবে!" কিংবা হয়তো মহাত্মাজীর প্রতি শ্রদ্ধাই এই প্রস্তাবের মূল কারণ ছিল। কিন্তু তাই যদি হবে, তা হলে মাত্র দু'বছর পরেই মহাত্মাজীর কাছে দাঁড়িয়েই কেমন করে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল বলতে সাহস পান, "আমরা তরবারি দিয়ে তরবারি নিবৃত্ত করব।"

যাঁরা ব্রিটিশের দুশো বছরের অত্যাচারে বিচলিত হলেন না, তাঁরা এক বছরের সাম্প্রদায়িক কলহে এমনি অধীর হয়ে উঠলেন যে অহিংসা তথা মহাত্মাজীর প্রতি সমস্ত অনুরাগ একমুহূর্তে তাঁদের কর্পূরের মতো উবে গেল।

বম্বেতে সে সময়ে বহু আগস্ট-বিপ্লবী আত্মগোপন করে ছিলেন। তাঁদের কারো কারো সঙ্গে দেখা হয়েছিল। সবচেয়ে আকৃষ্ট হয়েছিলাম অচ্যুত পটবর্ধনকে দেখে। ওঁর ভিতরের আগুন যেন সমস্ত চেহারায় ফুটে উঠত, চোখদুটো যেন জ্বলত সারাক্ষণ। কংগ্রেসের ওই প্রস্তাব নিয়ে তাঁর বিক্ষোভের অন্ত ছিল না, আমাকে বললেন, "এই

তো আজকের কংগ্রেসের লিডারশিপ্। নিজেরা কোনো প্রোগ্রাম দেবে না, কোনো পথ বাতলে দিয়ে যাবে না। দেশের লোকে তাদের নিজেদের চলার পথ ঠিক করে নিয়ে সর্বস্বপণ করে সংগ্রাম করে গেল—আজ তাদের ঘর নেই, বাড়ি নেই—পুলিশের অত্যাচারে কত লোক সর্বহারা, কতলোক প্রিয়জন হারিয়ে বসে আছে। আর, এখন ঝড় থেমে যাবার পর লিডাররা বেরিয়ে এসে অনায়াসে বলছেন, "আমরা অনুতপ্ত!" তাঁর কথাগুলোর মধ্যে যুক্তির চেয়ে ভাবাবেগই বেশি ছিল, উত্তরও কিছু দেওয়া যেত হয়তো। কিন্তু ওই 'অনুতাপ' ব্যাপারে অন্তত আমারও মনোভাব খানিকটা ওই রকমেরই বলে বিশেষ তর্ক করি নি সেদিন।

অরুণা আসফ আলির সঙ্গেও দেখা হল। বাঙলার এই বিপ্লবিনীকে ঘিরে সেদিন দেশের লোকের শ্রদ্ধা আর অনুরাগের সীমা ছিল না। আমরা কিন্তু দেখা করতে গিয়ে দেখি একেবারেই যেন আমাদেরই ঘরের মেয়ে। মিষ্টি মুখখানি হাসিতে ভরে আমাদের অভ্যর্থনা করে নিল। আমাকে বলল, "তুমি তো ভাই বেশি বড়ো না, নাম ধরেই ডাকব তো?" ওর বয়সটা জেনে নিয়ে বললাম, "আমিও তাই ডাকব, আমরা প্রায় সমবয়সী।" খানিকটা গল্প করলাম, ওর ফেরার-জীবনের গল্প। কলকাতায় আর বাঙলা দেশের এখানে-সেখানে অনেকদিন কাটিয়ে গেছে। আমাদের ব্রাহ্মসমাজের 'মন্দিরে' নাকি প্রায়ই রাত্রিতে লুকিয়ে মিটিং করত। হাসলাম, জিজ্ঞাসা করলাম, "মন্দিরের কর্তৃপক্ষ এ-সব কথা জানেন না নিশ্চয়ই? বিপ্লবীদের তাঁদের যে বড়ো ভয়!"

"ও আমি ঠিক করে নিয়েছিলাম। আমাকে তো আর তাড়িয়ে দিতে পারে না, আমিও তো ওই সমাজেরই মেয়ে।"

অরুণার দাদু ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল ছিলেন ব্রাহ্মসমাজের সে সময়কার প্রসিদ্ধ গায়ক আর নেতা, সেই সূত্রেই ওর এত দাবি। ছুটুদি ওকে সঙ্গে করে বাড়ি নিয়ে এল, আদর করে খাবারটাবার খাওয়াল। তখনো তো ফেরার হয়ে রয়েছে, সময়মতো খাবারটাবার পায় কিনা কে জানে! ইউসুফ মেহের আলির সঙ্গে দু'দিন দেখা করতে গেলাম। অসুস্থ অবস্থায় শয্যাশায়ী হয়ে রয়েছে। মনটা কিন্তু বিশ্বপরিক্রমা করে ফিরছে, সজীব, চঞ্চল প্রাণবন্ত মন। রাজনীতি নিয়ে আলাপ করলেন একটু। বললেন, "তুমি কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টিতে যোগ দিলেই খুশি হতাম। কিন্তু তোমাদের বাঙলার 'সি. এস্. পি'র যা অবস্থা, ওতে যোগ না দেওয়াই ভালো।"

বাঙলার কয়েকটি লোকের সম্বন্ধে কিন্তু ওঁর ধারণা খুব উঁচু। দু-একজন লোকের উনি এমন উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন—বললেন, "ওরা একেবারে খাঁটি সোনার মানুষ।"—শুনে মেহের আলির মানুষ চেনার শক্তি সম্বন্ধে অন্তত ধারণাটা আমার ভালো হল না। অসুস্থ বলে কোনো ব্যাপারেই বেশি তর্ক করি নি। বই-পত্রে ওঁর বিছানা টেবিল সব ভরতি, বললাম, "ডাক্তার পড়তে বারণ করে না?"

"করে, কিন্তু আমি শুনি না। না পড়লে আমি থাকব কী করে? পাগল হয়ে যাব না?"

এরপর মিনু মাসানার বাড়িতে একদিন মধ্যাহ্ন-ভোজনে যেতে হল। ওঁর 'সোশ্যালিজ্‌ম রিকন্‌সিডার্ড' বইটা নিয়ে এবার জেলে খুব হৈ চৈ হয়েছিল। বললাম সে কথা। দেখলাম মাথার মধ্যে ওঁর ওই বিষয়টাই ঘুরছে খালি। রাশিয়া সম্বন্ধে সমালোচনাপূর্ণ বইয়ে ওঁর বইয়ের শেল্‌ফ ঠাসা। আমাকে খালি জিজ্ঞাসা করেন, "এ-বইটা পড়েছ, ও-বইটা পড়েছ?"

কেবলই বলি, "না!"

শেষে বিরক্ত হয়ে বললেন, "কিছুই পড়াশোনা না করে তোমরা রাজনীতি করতে আস কী করে?"

মনে হল বলি, "তুমি যে বইগুলোর নাম বললে ওইগুলো না পড়লেই কি আর-কিছুই পড়াশোনা করা হয় না?" সংকোচে বলতে পারলাম না। ওঁর কাছে নিজেকে নিরেট মূর্খ প্রতিপন্ন করে মাথা হেঁট করে বাড়ি ফিরে এলাম। বাড়ি ফিরে হাঁফ ছেড়ে মনে হল : ও-সব বিদ্যাভিমানী শৌখিন সোশ্যালিস্টদের কাছে আমাদের মতো লোকের যাওয়াই ভুল!

নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনের পর বাঙলার প্রতিনিধিরা অনেকেই চলে গেলেন। আমরা রয়ে গেলাম। তখনো বেড়ানো হয় নি কিছুই। তা ছাড়া শরীরটা একটু না সারিয়ে কলকাতার কাজের মাঝে গিয়ে পড়েই বা লাভ কী? যাবার আগে কিন্তু দু-একজন বার বার মনে করিয়ে দিয়ে গেলেন, "তুমি কিন্তু দক্ষিণ কলিকাতা কংগ্রেসের সেক্রেটারি মনে রেখো সে কথা! দেরি করলে চলবে না।" কথাটা বারে বারে শুনে মনটা খারাপ হয়ে গেল, ভাবলাম তিন বছর যদি আমাকে বাদ দিয়ে দক্ষিণ কলিকাতা কংগ্রেসের চলে থাকে এখন তিনটে সপ্তাহও কি আর চলবে না? তা ছাড়া আমরা যে মানুষ সে কথাও এঁরা ভুলে যান যেন! মানুষের শরীর বলে একটা পদার্থ আছে, মন বলে একটা জিনিস আছে, এ-সবের দিকে কোনো দৃষ্টি দেওয়াই কি দরকার নেই? মনে পড়ছিল একবার 'জয়শ্রী'তে লীলাদির একটা প্রবন্ধে পড়েছিলাম : "রাজনীতির সর্বগ্রাসী দাবি মেটাতে গিয়ে," ইত্যাদি। প্রথমটা আমার কথাটা অত চোখে পড়ে নি। কমলাদি দেখিয়ে বললেন, "কি রকম সত্যি বিশেষণটা, না?"

তারপর থেকে অনেকবারই কথাটা মনে পড়েছে। সর্বগ্রাসী দাবিই বটে। মাঝে মাঝে মনটা বিদ্রোহ করে ওঠে : ভাবি আমরা দেশের কাজ করি, করতে ভালো লাগে বলে, দেশকে ভালোবাসি বলে, একান্ত নিজেদেরই প্রাণের গরজে। সেখানে কতটুকু করব না করব, কিভাবে চলব না চলব, অন্য লোকে আমাদের বলতে আসে কেন? এতটুকু এদিক-ওদিক হলেই বা লোকের কেন এত মাথাব্যথা, কেনই বা এত সমালোচনা? আমরা তো কারুর কাছে দাসখৎ লিখে দিইনি! আমি কাজ করি আমার স্ব-ইচ্ছায়, আমার নিজের সাধ্য অনুসারে। সেখানে, "এটা দেশকর্মীর উপযুক্ত নয়; এটা আপনার কাছে আশা করি নি, এটা আপনার করা উচিত ছিল" এমন সব কথার অবকাশ থাকে কী করে?

তারপর ভাবি এইই বোধ হয় স্বাভাবিক। জীবনটা দেশের সঙ্গে মিশিয়ে দেব, অথচ

দশের দাবিদাওয়ার ঘাতপ্রতিঘাত জীবনে লাগতে দেব না—তা কি আর চলে? আমরা আপন করে নিতে চেয়েছি বলেই তো ওরা আপনজনের মতো দাবি করে, ইচ্ছার বিরুদ্ধেও অত্যাচার করে, যাকে এক-এক সময়ে জুলুম বলে ভুল হতে চায়। যার জীবনের পরিধি যত বড়ো, তার নিজস্ব জীবনের—স্বকীয় সুখদুঃখের স্থান ততই সংকীর্ণ হয়ে আসতে চায়। তবু এও ঠিক, নিজেকে বাদ দিয়েও একেবারে চলা যায় না। এ দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য করে নিতে হয়। সহস্রের ভিড়ে নিজেকে যদি হারিয়েই ফেলি তা হলে তো সেটা আত্মবিনাশেরই সামিল—তাতে নিজেরও ক্ষতি, দেশেরও ক্ষতি। কেউ কেউ আছে যারা অনেকের মধ্যে থেকেও নিজেকে হারিয়ে ফেলে না, প্রকাণ্ড ভিড়ের মধ্যেও একা থাকতে পারে, দারুণ কোলাহলের মাঝেও নিজের মনের গহনে একা বাঁশি বাজিয়ে চলে, কোনো বাধাই বোধ করে না! কিন্তু এটা বোধ হয় কতকটা সাধনারও ব্যাপার। এমন সুন্দর সামঞ্জস্য আমাদের অনেকের জীবনেই নেই। তাই মাঝে মাঝে কাজ করতে করতে আমরা প্রায় পাগল হয়ে উঠি, ইচ্ছে হয় সব-কিছু ছেড়েছুড়ে ছুটে পালিয়ে যাই—দূরে, বহুদূরে—যেখানে কেউ নেই, একেবারে কেউ না। বন্ধু না, শত্রু না, দেশ না, ইংরেজ না, ঐশ্বর্য না, দারিদ্র্য না—শুধু আমি একা, আর আমাকে ঘিরে গভীর নিস্পন্দ নীরবতা!

বম্বেতে অবিশ্যি ঠিক এ রকম মনোভাব আমার ছিল না। লোভ ছিল কিছুদিন একটা ভালো করে বেড়িয়ে নেবার, একটুখানি আনন্দ পাবার, একটুখানি মাধুর্যের! বম্বের যা-কিছু দর্শনীয় ছুট্টুদিদের মোটরে চড়ে দু-চার দিনেই দেখা হয়ে গেল। তার পর বাবা ও একটি বন্ধুর সঙ্গে গেলাম পুণায়।

বম্বে থেকে পুণার পথটি সত্যিই মনোমুগ্ধকর। দুদিকে পাহাড়, পাহাড়ের গায়ে কতরকমের ফুল, কতধরনের গাছ; কোথাও জলের ক্ষীণ ধারা স্ফটিকশুভ্র মুক্তোর হারের মতো নেমে এসেছে; কোথাও বা সবুজ ক্ষেতে গালিচা পাতা; কোথাও ঘন জঙ্গলের গভীর রহস্য। পাহাড়গুলো দেখে ভাবছিলাম এরই জঙ্গলে জঙ্গলে একদিন মহারাজা শিবাজী ঘোড়া ছুটিয়ে দিগ্‌বিজয় করে ফিরতেন, মারাঠা বীরদের কত বীরত্বের কাহিনীই না এই পাহাড়ের গায়ে লেখা হয়ে আছে!

পুণায় গিয়ে উঠলাম একটি হোটেলে। সেদিনই বিকেলের দিকে গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। তিনি তখন ওখানকার স্বাস্থ্যাবাসে রয়েছেন। আমাকে দেখে হাসলেন, বললেন, "কী জন্য এসেছ?"

"তুমি জেলে একবার আমার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলে। তারপর এতদিন পাল্টা দেখা করা হয় নি, এটা সেই হিসেবেই ধরে নাও।"

তিনি হেসে বললেন, "তা হলে জেলেই পাল্টা সাক্ষাৎটা হওয়া উচিত ছিল।" তখনকার দু-একটা সমস্যা নিয়ে আমরা প্রশ্ন করলাম ওঁকে, ক্লান্তস্বরে বললেন, "দেখো, এ-সব উত্তর দেবার জন্য তো ওয়ার্কিং কমিটিই রয়েছে। আমাকে যদি তোমরা সবাই মিলে এ নিয়ে বিরক্ত কর তা হলে কী করে চলে! আমাকে কি তোমরা ১২৫ বছর সত্যিই বাঁচতে দেবে না? কিন্তু আমার যে বাঁচা দরকার!"

এবার ওঁকে সত্যিই বড়ো বেশি ক্লান্ত আর ভগ্ন দেখাচ্ছিল। আগের চেয়ে অনেকটা যেন বুড়ো হয়ে পড়েছেন। তাছাড়া এবার জেলে দুটো গভীর শোক পেয়েছেন, সে কথাও মনে পড়ে গেল। তারই আঘাতে হয়তো এত ভেঙে পড়েছেন। আর বেশি বিরক্ত না করে প্রণাম করে চলে এলাম। শুনলাম কাছাকাছিই মহাদেব দেশাই আর কস্তুরবার সমাধিস্থান। ইচ্ছে করলে সন্ধ্যার সময়ে যাওয়া যায়। কিন্তু সেখানে গেলে গান্ধীজীর প্রার্থনা সভায় যোগ দেওয়া হয় না। প্রার্থনা সভাও কখনো দেখি নি। কোথায় যাই তাই হল সমস্যা। আমার মনটা যেন ঝুঁকছিল 'সমাধি'-স্থানেরই দিকে। "সাংবাদিক হিসেবে আমার কিন্তু প্রার্থনা সভাতেই বেশি ঝোঁক," বন্ধুটি বললেন। এরপর আর কথা চলে না। অগত্যা সেখানেই যাওয়া স্থির হল।

এরপর পুরো একদিন পুণা শহরটা ঘুরে বেড়ানো হল। "কেশরী' পত্রিকা অফিসে গেলাম। আমরা বাঙলাদেশ থেকে এসেছি শুনে সুখী হলেন ওঁরা, বললেন, "মহারাষ্ট্রীয়দের সঙ্গে বাঙালিদের একটা খুব গভীর মিল আছে। আমাদের আরো যোগাযোগ রাখা উচিত।"

পুণার কংগ্রেস অফিসে গেলাম। বিরাট বাড়ি, প্রকাণ্ড হল, মস্ত বড়ো মার্বেল পাথরে বাঁধানো ছাদ। অনায়াসে চার-পাঁচ হাজার লোকের সভা ওরা ওই বাড়িতে করতে পারে। বম্বের কংগ্রেস অফিসও দেখেছিলাম, সেও এক এলাহী কাণ্ড। আমার কেবলই মনে পড়ে যায় আমাদের তখনকার কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের উপরে অপ্রশস্ত একখানি ভাড়া করা ঘরে কংগ্রেস অফিসের কথা। ওদের বললাম, "তোমাদের এখানে সব বড়োলোক তাই তোমাদের কংগ্রেসের এত টাকা।" ওরা বিশ্বাস করল না; বলল, "বাঙলায় বড়োলোক কিছু কম আছে নাকি? আসলে তোমরা টাকা জোগাড় করতে জানো না, দোষ তোমাদেরই।"

পরের দিন পুণা থেকে ফিরে এলাম। ট্রেনে একটা মজার ঘটনা হল। বাবার শরীরটা ভালো লাগছিল না, ওষুধ খাওয়াবো সঙ্গে এমন জল নেই, হাতের গ্লাসটা নিয়ে ট্রেন থেকে নামব কি না ভাবছি, এমন সময়ে সেই কামরারই একজন অত্যন্ত সুপুরুষ পাঞ্জাবী আমার হাত থেকে গ্লাসটা নিয়ে বললেন, 'দিন, আমি জল এনে দিচ্ছি।" ট্রেন ছাড়ার পর তাঁকে ধন্যবাদ দিতে গিয়ে মুখের দিকে তাকিয়ে কেমন যেন সন্দেহ হল। আমার ছোটোভাইয়ের কল্যাণে মাঝে মাঝে সিনেমায় যাওয়া, সিনেমা-স্টারদের সম্বন্ধে কিছু খোঁজখবর রাখার অভ্যাস আমারও আছে। মনে মনে সিনেমাসঙ্ঘের ভক্ত আমরা কমবেশি সকলেই। বন্ধুকে চুপিচুপি বললাম, "নিশ্চয়ই পৃথ্বিরাজ, জিজ্ঞাসা করে দেখতে হবে।"

জানা গেল আমার সন্দেহরই সত্যি। আলাপ জমে উঠতে দেরি হল না। পৃথ্বীরাজ নিজের জীবনের, আর্টের কথা খানিকটা বললেন। বললেন, "অভিনয়ের মধ্য দিয়ে স্বাদেশিকতা প্রচার করা কত যে দরকার; এর মধ্য দিয়ে জাতীয় সমস্যাগুলোর দিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়। এদিকে নেতাদের আরো মন দেওয়া উচিত।"

বললাম, "আমার বাবাকে আপনার একটা গান বা আবৃত্তি শোনাবেন?" তক্ষুনি রাজি হলেন, গভীর ভাবাবেগের সঙ্গে ঈষৎ ভাঙা বাঙলায় আবৃত্তি করলেন রবীন্দ্রনাথের: "আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণধুলার তলে" গানটি।

পুণা থেকে ফিরে অজন্তা-এলোরা দেখতে যাবার পরিকল্পনা করতে লাগলাম। অনেক দূরের হাঙ্গামার পথ। বাবার যাওয়া সম্ভব নয়। ভালো সঙ্গী না পেলে আমাদেরও যেতে দিতে ভয় পান। ভাগ্যক্রমে খুব ভালো কয়েকজন সঙ্গী পাওয়া গেল। সবশুদ্ধ জন পাঁচ-ছয় আমরা দল বেঁধে বেরিয়ে পড়লাম অতীতের সৌন্দর্যের অমরাবতীর উদ্দেশে। অজন্তা-এলোরার বর্ণনা করতে যাবার চেষ্টা এখানে করব না। ভাষার অতীত যে সৌন্দর্য, শিল্পীর বর্ণে রেখায় লীলায়িত-হয়ে-ওঠা যে একটা আলাদা বিরাট জগৎ, তাকে আমার মতো শিল্পজ্ঞানহীন অর্বাচীনের বর্ণনা করতে যাওয়া শুধু স্পর্ধা নয়, বাতুলতা। কতটুকুই বা তার সৌন্দর্য বুঝেছি আমরা? কতটুকু জানি ওখানকার পরিভাষা, বা টেকনিক? কিন্তু তবু, সে-সব বাদ দিলেও শিল্পীর যে আনন্দ তার উল্লাস ওইখানে ওই পাহাড়ের গুহায় গুহায় মূর্ত হয়ে উঠেছে, যে ঐশ্বর্যময় পরিপূর্ণ জীবনের অভিব্যক্তি ওখানকার প্রতিটি পাথরে পাথরে চিরসঞ্চরমান হয়ে রয়ে গিয়েছে, সেই আনন্দ আর সেই জীবনোচ্ছ্বাস আমাদের প্রতি রোমকূপে স্পন্দন নিয়ে এল, নিয়ে এল হৃদয়ে আনন্দের প্লাবন। অজন্তা-এলোরা শুধু চোখ দিয়ে দেখা যায় না, দেখতে হয় সমস্ত মন দিয়ে, হৃদয় দিয়ে, জীবন দিয়ে। সেই সুদূর অতীতে, ইতিহাস যেখানে গিয়ে স্তব্ধ হয়ে যায়, তখনো মানুষের মনে ছিল এতখানি প্রসারতা? ধ্যানের এমন গভীরতা? অনুভূতির এত তীক্ষ্ণ সূক্ষ্মতা? সৃজনের এমন রহস্যময় ক্ষমতা? সব-কিছু যেন গুলিয়ে উঠতে চায়। ক্রমাবর্তন? এগিয়ে চলেছি আমরা? শিল্পের দিক দিয়ে, জীবনের দিক দিয়ে এক পা-ও কি এগিয়েছি আমরা? আমাদের, ভারতবাসীদের তো বুক বিদীর্ণ করে কেবলই দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে, "কী ছিলাম, আর কী হয়েছি!"

অজন্তার এক-একটা ছবির দিকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে হয়। ছবির মুখে এত ভাব, এত কথা, এত ব্যথা কী করে যে ফুটিয়েছে কে জানে! সব ছবিই সুন্দর। কিন্তু বিশেষ করে আমার চোখে লাগল বুদ্ধদেবের একটা ছবি। বুদ্ধত্ব লাভের পর ভিক্ষাপাত্র হাতে নিজেরই রাজপ্রসাদে যশোধারার দ্বারে ফিরে এসে উর্ধ্বমুখে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। সে মুখে কী যে আছে আর কী যে নেই তা জানি না। একই সঙ্গে ফুটে উঠেছে বৈরাগ্য আর বেদনা, ত্যাগ আর প্রেম, নির্বাণ আর মৈত্রী। ভুলতে পারি না সে মুখ। আজও থেকে থেকে যেন অনুধাবন করে।

সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করলাম, "গ্রীক শিল্প কি এর চেয়েও সুন্দর?" আসল তো দেখি নি, কিন্তু ছবিতে যা দেখেছি তাতেই মুগ্ধ হই। ভারতীয় শিল্পের সঙ্গে তার ঠিক কোথায় প্রভেদ খুব স্পষ্ট করে বুঝি না যেন। ইচ্ছে হয় কোনো বড়ো শিল্পীর কাছে বসে বুঝে নিই। কল্পনা করলাম আবার একদিন আমরা এমনি সৌন্দর্য-পিপাসু মন নিয়ে গিয়েছি গ্রীসে, রোমে, ফ্লোরেন্সে—দাঁড়িয়েছি মিকেল-এঞ্জেলো, লিওনার্দো-দা-ভিন্‌চি আর

রাফায়েলের ছবির সামনে। অসম্ভব কল্পনা আর কি, কোনোদিনই হয়তো পূর্ণ হবে না। তবু কল্পনা করতে দোষ কী? ভালো লাগে যে।

কিন্তু কল্পনা-বিলাসের সময় এদিকে সংক্ষিপ্ত হয়ে আসছে। মনে মনে বিবেকের দংশন একটু একটু করে পীড়া দিতে আরম্ভ করল, মনে হচ্ছিল যা প্রাপ্য তার চেয়ে বেশি আনন্দ বেশি সময় ধরে ভোগ করে নিচ্ছি। এবার ফিরে যাওয়া উচিত। ফিরে যাওয়া উচিত সেইখানে—যেখানে মানুষের কর্মতরঙ্গ ক্রমশ উত্তাল হয়ে উঠছে, যেখানে মানুষের সংগ্রামের আয়োজন সর্বব্যাপী হয়ে উঠছে প্রতিদিন। প্রথম সারির সৈনিক হবার আশা রাখি আমরা, আমাদের কি সাজে এই সময় নিয়ে খেলা? কানের মধ্যে কেবলই যেন শুনি, কে যেন ডাকে : 'কমরেডগণ, সারি বাঁধো।'

১৮

কলকাতায় ফিরে এসে দক্ষিণ কলিকাতা কংগ্রেস নিয়ে লাগলাম। ১৯৪২ সালের পর থেকে সমস্তই এলোমেলো হয়ে রয়েছে। প্রথমে প্রয়োজন একটা অফিস-ঘর ঠিক করা। অনেক কষ্টে, অনেক ঘোরাঘুরির পর একটি ঘরের ব্যবস্থা করা গেল। তারপর সাইনবোর্ড টাঙিয়ে, চেয়ার-টেবিল-আলমারি জোগাড় করে, মাদুর কিনে, দৈনিক খবরের কাগজের ব্যবস্থা করে, কিছুটা গুছিয়ে বসা হল। তখনও কি জানি আগের দিন আর নেই! আমি তো মনে মনে ঠিক করে আছি আগের মতোই সকালসন্ধ্যা অফিসে গিয়ে একা একা ডিউটি দিতে থাকব। মাঝে মাঝে দু-চারজন পরিচিত বন্ধু হয়তো আসবেন, খানিকটা গল্প, খানিকটা বা কাগজ পড়া—তারপর দরজায় আবার তালাচাবি দিয়ে চলে আসা। কিন্তু মাঝের তিন বছরের যে অলৌকিক কাণ্ড ঘটে গেছে তার তো আর খোঁজ রাখি নি!

অফিস-ঘর খুলে বসতে-না-বসতেই দেখি লোকের ভিড় আর ধরে না। সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা—সব সময়েই সেখানে লোকের আনাগোনা। দরকারে অদরকারে সকলেই আজকাল সবচেয়ে আগে ছুটে আসে কংগ্রেস অফিসে। ঘরটি অত্যন্ত ছোটো—সবাই অসন্তুষ্ট হয়, মাত্র চারটি মাদুরে লোককে বসতে দিয়ে আর কুলিয়ে উঠতে পারি না। দু-চার ঘণ্টা অফিস যদি বন্ধ থাকত লোকের বিরক্তির অন্ত থাকত না : "কংগ্রেস অফিস সমস্তক্ষণ খোলা থাকে না কেন?"

অনেকদিন পরে অর্ডিন্যান্সগুলো উঠে যাওয়ায় একটা জনসভার আয়োজন করলাম। আবার সেই হাজরা পার্কে। পার্কে অসম্ভব ভিড়—তিলধারণের স্থান নেই। বাইরেও কাতারে কাতারে লোক দাঁড়িয়ে। স্বেচ্ছাসেবকদের ব্যবস্থা খুব ভালো হয়েছিল। অনেকদিন পর বক্তৃতা দিতে উঠে বক্তাদেরও সেদিন মন ও ভাষা দুই-ই খুলে গেল। কাজেই সকলেই সভা থেকে বেশ তৃপ্ত মন নিয়ে বাড়ি ফিরেছিল।

বাড়িতে এসে বৌদি আমাকে বললেন : "তোকে অভিনন্দন জানাচ্ছি, এমন সুন্দর

সভার আয়োজন করেছিলি বলে। এত সব লোক এতদিন ছিল কোথায়? এর আগে পায়ে ধরেও তো সভায় লোক আনতে পারতিস না।" আমারও মনে পড়ছিল—১৯৪২ সালে যেদিন এই হাজরা পার্কেই সভা করতে এসে খালি মাঠের শূন্যতা বুকে নিয়ে জেলে চলে গিয়েছিলাম—সেইদিনের কথা।

এরপর কংগ্রেসের সভ্য করার সময় এল। সে-সময় অসম্ভব কাজের ভিড়। রসিদ-বই বহু বিতরণ করেও কুলিয়ে উঠতে পারছি না, এত চাহিদা। আর চাহিদা অনুরূপ সরবরাহ না থাকায় লোকের বিরক্তিরও অন্ত নেই; অনুযোগ, অভিযোগ আর বকাবকিতে কান ঝালাপালা হয়ে উঠত আমাদের। কিন্তু এতে দুঃখ ছিল না, ভাবতাম এওতো একটা অভিনব অভিজ্ঞতা। এই তো সেদিন এই রসিদ-বই নিয়েই দোরে দোরে কাঙালের মতো কত ঘুরেছি; কেউ ফিরেও চাইত না। একটি সভ্য সংগ্রহ করতে অনেক সময় ঘন্টার পর ঘণ্টাও তর্ক করতে হয়েছে। শুধু কংগ্রেসের সভ্য সংগ্রহ করার কাজ ছাড়াও আরো কত যে কাজ হাতে এসে পড়ল তার হিসেব নেই। স্বেচ্ছাসেবকদল গঠন করা হল, প্রায়ই তাদের প্যারেড্, র‍্যালি বা প্রভাতফেরির ব্যবস্থা করা একটা কাজ। মেয়েদেরও প্যারেড ও সাইকেল-চড়া শেখানো—তারও ব্যবস্থা আলাদা। কয়েকটা বস্তির কাজও হাতে, ওখানকার ছেলেমেয়েদের একটা ইস্কুল করবার বন্দোবস্ত করতে হল। খিদিরপুরে, টালিগঞ্জে শ্রমিকদের মধ্যে কাজের ভারও কংগ্রেস থেকে নেওয়া হল। শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করার জন্য একটা শিক্ষাকেন্দ্র খুলতে চেষ্টা করলাম। কোনো কাজই তেমন জুতসই হয় না, শৃঙ্খলার বড়ো অভাব, কেবলই গোলমাল মতভেদ আর ঝগড়া। সকলেই দেখি আমারই উপর বিরক্ত হয়। 'সেক্রেটারিরই সব দোষ, সব দিক সামলাতে পারে না, সমতা রেখে কাজ করতে পারে না, আইডিয়া নেই' ইত্যাদি।

সেক্রেটারি কী আর করে—মাথা পেতে বকুনিগুলো মেনে নেয়। আমার কাজের কত যে ত্রুটি তা কি আমি বুঝি না? কলকাতার মতো একটা জেলার কংগ্রেস চালানো আজকাল কি আর মুখের কথা? এ যেন গোটা একটা গভর্ণমেন্টের দায়িত্ব আমাদের ঘাড়ে এসে পড়েছে। বিপদে-আপদে আমাদেরই কাছে জনসাধারণ এসে দাঁড়ায়। শহরে গোলমাল, অশান্তি, পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ—সকলেরই মুখে তখন এই প্রশ্ন : 'কংগ্রেস কী করছে?'

দায়িত্ব আছে অথচ ক্ষমতা নেই—কংগ্রেসের তখন সেই অবস্থা। যোগ্যতর হাতে পড়লে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা এবং মর্যাদা আরো যে বৃদ্ধি পেত সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। কংগ্রেসের প্রতি সাধারণের সেদিন যে-শ্রদ্ধা, যে-বিশ্বাস, যে-ভরসা ছিল, তার অনেকখানিই আমরা রক্ষা করতে পারি নি, হারিয়েছি নিজেদেরই ত্রুটি এবং অক্ষমতায়। কোথায় ত্রুটি সব সময় বুঝতেও পারতাম না, তবে এটা ঠিক বুঝতাম আরো বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ব্যক্তিত্ব থাকা আমার উচিত ছিল, আরো প্রখরতর বুদ্ধি। তবে আমাদের মস্ত বড়ো সান্ত্বনার বিষয় ছিল এই যে, আমরা চেষ্টার কোনো ত্রুটি করি নি। আমি আর সহকারী-সম্পাদক সে-সময় সারাদিন একদণ্ডও নিশ্বাস ফেলবার সুযোগ পেতাম না—এ কথা বিশ্বাস করুন।

এ ছাড়া আরো কয়েকটি কর্মী আর স্বেচ্ছাসেবক কী অসম্ভব খাটুনিই না খাটত। খাটুনিই হত সার, সংখ্যায় এত কম কর্মী নিয়ে একটা জেলা কংগ্রেস কমিটি তো সামলানো যায় না।

আমাদের আরেকটা বিশেষ দোষ ছিল : নতুন সক্ষম কর্মী আমরা জোগাড় করতে পারতাম না। কাঁচা অবস্থা থেকে পাকা করে তাদের আমরা গড়ে নিতে পারতাম না। তার ফল হত যা হবার—নিজেদেরও খাটুনির সীমা থাকত না, অথচ কাজও হত না মনের মতো।

তখনকার দিনগুলো এখনও স্পষ্ট মনে পড়ে। খুব ভোরবেলা উঠে চা খেয়ে (কোনোদিন না খেয়ে) বেরিয়ে পড়তাম। বাড়ি ফিরতাম কোনোদিন রাত ন'টা, কোনোদিন দশটা। মধ্যে এক মিনিটেরও বিশ্রাম নেই। খাবার মধ্যে কোনোদিন দোকানে বসে চাপাটি আর তরকারি, কোনোদিন বা কংগ্রেস অফিসে বসে নরম মুড়ি আর ফুলুরি। সে সময়ে ইস্কুলমাস্টারিটাও করতে হত। সেখানে অবিশ্যি আমার সব সময় অত্যাচারই ইস্কুল-কর্তৃপক্ষ হাসি মুখে সহ্য করে যেতেন। বেশির ভাগ দিন টিফিনের পরই আমি চলে আসতাম, বলে আসতাম 'বড্ড কাজ'। কংগ্রেসের কাজকে ইস্কুলের কাজের চেয়ে বড়ো মনে করতাম। তার ফলে আমার এই যে অমনোযোগ বা অন্যায় প্রশ্রয় নেওয়া কর্তৃপক্ষেরা চিরকাল ক্ষমা করেই গেছেন।

বাড়ির লোকেরা সে সময় আমার সম্বন্ধে আশা-ভরসা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলেন। বাবার সমস্ত রাগটা গিয়ে পড়ত কংগ্রেসের উপর : 'মানুষকে এরা খাটিয়ে খাটিয়ে একেবারে মেরে ফেলতে চায়—এ কোন্ দেশী ব্যবস্থা বুঝি না বাপু।'

তবুও দেখতাম বিশেষ কিছুই আমার করা হয়ে উঠত না, পদে পদে কর্তব্যচ্যুতি ঘটত। সবার অসন্তোষ বেড়েই চলছিল। কেবলই শুনি : 'সেক্রেটারি কোথায়? তাঁকে পাওয়া যায় না কেন? কী করেন তিনি?' সহকর্মীরা যতটা সম্ভব আমাকে বাঁচিয়ে চলতে চাইতেন, বলতেন, 'সেক্রেটারি তো একটা মানুষ—কত জায়গায় যাবে সে? যদি বলেন নাহয় দশটা টুকরো করে কেটে তাকে দশ জায়গায় পাঠিয়ে দিই।' এমনি কাজের ঘূর্ণিপাকের মাঝে যখন হাবুডুবু খাচ্ছি তখন হঠাৎ একদিন পালা বদলের সুযোগ এল। নানাকারণে সাব্যস্ত হল আমার অ্যাসেমব্লিতে যাওয়া। দক্ষিণ কলিকাতা কংগ্রেস হয়তো যোগ্যতর হাতে পড়বে, এই আশায় খানিকটা মুক্তির নিশ্বাস ফেললাম।

১৯

মাঝখানের তিনটি বছর জাতির জীবনের যে কত বড়ো এক অন্তর্বিপ্লব নিয়ে এসেছে তার আরেকটা প্রমাণ পেলাম ২১ নভেম্বর কলকাতার ছাত্রদের আচরণ দেখে। সেদিন রাত্রি তখন বোধ হয় আটটা হবে, কংগ্রেস অফিসে বসে খবর পাওয়া গেল : 'আজাদ-হিন্দ বন্দীদের মুক্তির জন্য ছেলেরা শোভাযাত্রা করেছিল, পুলিশে আটকে

দিয়েছে, অনেক গোলাগুলি চলেছে, ধর্মতলায় এখনও ছেলেরা সব বসে।' তখনই বাস-এ আমরা চার-পাঁচজন বেরিয়ে পড়লাম ব্যাপারটা কী দেখতে। কাছাকাছি গিয়ে দেখি ব্যাপারটা ঠিকই, ওয়েলিংটন স্কোয়ার থেকে ওয়াছেল মোল্লার দোকান অবধি অসম্ভব ভিড় আর চিৎকার। ভিড়ের ব্যূহ ভেদ করে ভিতরে না গেলে কিছুই বোঝা যাবে না। কাজেই অভ্যাসমতো ঘড়ি আর কলমটা ব্যাগে পুরে একজন বন্ধুর হাতে দিয়ে সেই দুর্ভেদ্য ভিড় ঠেলে ভিতরে ঢুকলাম। সেখানে গিয়ে মোটামুটি ব্যাপারটা জানা গেল। ছেলেরা শোভাযাত্রা করে ডালহাউসির দিকে যাচ্ছিল। ডালহাউসি তখনও সরকারি তালিকায় নিষিদ্ধ এলাকা বলে গণ্য—কাজেই পুলিশ সেদিকে যেতে দেবে না। ছেলেরাও সেদিকে যাবেই। তার ফলে পুলিশ গুলি করে; হতাহতের সংখ্যা অনেক। তারা এখন হাসপাতালে। বাকি সবাই এখানে বসে রয়েছে, ডালহাউসি তারা যাবেই—পুলিশের গুলির ভয়ে ফিরে আসবে না।

মনে হল কী সামান্য ব্যাপারটাই না কর্তৃপক্ষ এমন সাংঘাতিক করে তুলেছে। এটা ইংরেজদের চিরদিনের সেই চুলচেরা আইন ধরে চলার অভ্যাস আর কি! বাড়িতে আগুন লাগলেও যাদের বলা অভ্যাস : "হুকুম নেই আগুন নেভাবার।" এও সেই একই মনোভাবের পরিচায়ক। নইলে সারা কলকাতায় নিষেধাজ্ঞা তুলে দিয়ে শুধু ডালহাউসির দিকটায় সেটা বহাল রাখার কোনো মানেই হয় না। আর তোলা যে হয় নি সেটা ভালো করে কাগজে জানানোও কেউ দরকার মনে করে নি। আমরা তো কেউই জানতাম না যে ডালহাউসি নিষিদ্ধ জায়গা। সেরকম অবস্থায় ছাত্রদের এই শোভাযাত্রাকে একদিনের জন্য সেখানে যাবার অনুমতি দিলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কোথায় যে আঘাত লাগত ভেবে তার কূলকিনারা পাওয়া যায় না। কিন্তু তবু অনুমতি কিছুতেই দেওয়া চলে না। বহু ছাত্রের মাথা বরং তার জন্য বন্দুকের গুলিতে উড়িয়ে দেওয়া চলে, তবু তাদের এই সমবেত দাবির কাছে মাথা কিছুতেই নোয়ানো চলে না।

ছাত্রদের কাছে ব্যাপারটা তখন আর ডালহাউসি যাওয়া না-যাওয়ার প্রশ্ন নয়; ওটা হয়ে দাঁড়িয়েছে ওদের সম্মানের প্রশ্ন, ওদের মৃত সঙ্গীদের সম্মানের প্রশ্ন।

আমরা অবিশ্যি ছাত্রদের ফেরাবার খানিকটা চেষ্টা করলাম। "ডালহাউসি যাওয়ার দাবিটা কিছুই না, অর্থহীন। মিছিমিছি তার জন্যে এতগুলো অমূল্য জীবন নষ্ট করা চলে না। এর চেয়ে অনেক বড়ো কাজ রয়েছে তোমাদের। তা ছাড়া এভাবে খণ্ড খণ্ড সংগ্রাম করার সময়ও এটা নয়।" এই ধরনের নানান যুক্তি দেখালাম, কিন্তু ছাত্ররা আমাদের সে-সব কথায় কানও দিল না। প্রতিজ্ঞা ওদের অটল। খালি একজনের কথায় তারা ফিরে যেতে রাজী আছে বলে জানাল, তিনি ওদের চিরপূজ্য নেতাজীর অগ্রজ শরৎচন্দ্র বসু মহাশয়। কিন্তু শরৎবাবু কী বুঝলেন, দলের লোকেরা তাঁকে কী বোঝালো জানি না, শত চেষ্টাতেও তাঁকে কিছুতেই সেখানে আনানো গেল না। সেদিন সমস্ত রাতটা কাটল সেই ধর্মতলার রাস্তায় বসে। খবর পেয়ে আরো কয়েকজন কংগ্রেসকর্মী এলেন। ডাক্তার শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এসে অনেকক্ষণ রইলেন, ছাত্রদের ও কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে একটা কিছু মিটমাট করার চেষ্টা করলেন।

ছেলেদের সঙ্গে পুরোপুরি সায় দিতে পারছিলাম না। কিন্তু মনে মনে বিস্ময় আর শ্রদ্ধারও অন্ত ছিল না। কেবলই মনে হচ্ছিল এ জিনিস এর আগে এদেশে দেখা যায় নি।

একক বীরত্বের উদাহরণ আমাদের দেশে কম নয়। বহু তরুণ স্বেচ্ছায় প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে। কিন্তু এমনি করে পুলিশের গুলিতে বহু হতাহত হয়ে যাবার পরও ছত্রভঙ্গ না হয়ে অবিচল দৃঢ়তার মাথা উঁচু করে' দলবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা—এর নিদর্শন আগে কখনও পাই নি। জাতীয় জীবনে এ একটু নতুন শক্তির স্ফুরণ নিশ্চয়ই।

রাত্রি ভোর হওয়ার পর আমি বাড়ি চলে এলাম। কিন্তু ছাত্ররা তাদের সংকল্প ছাড়ে নি, পরদিন তারা দ্বিগুণ সংখ্যায় ডালহাউসি অভিযান শুরু করল—আবার রক্তের স্রোতে কলকাতার রাস্তা ভেসে গেল। শেষ অবধি ব্রিটিশ সরকারকেই অবিশ্যি জেদ ছাড়তে হল। বহু রক্তের মূল্য দিয়ে ছাত্ররা লাভ করল ডালহাউসি যাবার দাবি। কিন্তু শুধু তাই কি? ওটা শুধু ডালহাউসি যাবার দাবি বললে ঠিক বলা হয় না যেন। ওটা খামখেয়ালী ব্রিটিশ রাজত্বের উদ্ধত স্পর্ধার বিরুদ্ধে বাঙলার ছাত্রসমাজের আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার দাবি, ইংরাজের পাশবিক শক্তির বিরুদ্ধে ভারতীয় যুবকের সসম্মান বিদ্রোহ।

ঠিক এই জিনিসই অনুরূপভাবে দেখা দিল আবার ফেব্রুয়ারিতে 'রসিদ-আলি দিবসে'। সেদিনও সেই ডালহাউসি স্কোয়ারে শোভাযাত্রা, সেই আজাদ-হিন্দ-নায়কদের মুক্তির দাবি, সেই পুলিশের বেপরোয়া গুলি—আর তার সামনে ছাত্রদের নির্ভীক অভিযান। তবু নতুনত্বের মধ্যে ছিল এবার হিন্দু-মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়েরই যোগদান। কলকাতার রাস্তায় সেদিন বহুদিন পরে কংগ্রেস আর লীগের পতাকা একসঙ্গে দেখা দিল। অনেকেরই মনে এতে আশার সঞ্চার হয়েছিল, এতদিনে বুঝি হিন্দু-মুসলমান একসঙ্গে কাঁধে কাঁধ দিয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে শিখল। এতদিনে বুঝি ওদের মধ্যে চিরদিনের বিরোধের অবসান হল। আর সে অবসান নিয়ে এল বাঙলার ছাত্রসৈনিকরা, তাদের বুকের তাজা রক্ত দিয়ে!

অন্তরালে থেকে আমাদের এই আশা দেখে বাঙলার ভাগ্যদেবতা সেদিন নিশ্চয়ই অট্টহাস্য করে উঠেছিলেন। সে হাসি বন্দুক আর মেশিনগানের আওয়াজে আমরা সেদিন শুনতে পাই নি। ফেব্রুয়ারির 'রসিদ-আলি দিবস' আর ১৬ই আগস্টের 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস'—মাঝে ক'টা মাসেরই বা ব্যবধান?

নভেম্বরের ছাত্রসংগ্রাম আর ফেব্রুয়ারির 'রসিদ-আলি দিবস' শুধু ছাত্রদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। সমস্ত কলকাতা শহরের জনতা সেই সঙ্গে সঙ্গে উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল। এ-হেন উন্মত্ততাও আগে দেখি নি। পুলিশের গুলিরও শেষ নেই, মেশিনগানেরও বিরতি নেই, দেখতে দেখতে মিলিটারি গাড়ি সমস্ত কলকাতা শহর বেড়াজালের মতো ঘিরে ফেলল। কিন্তু তাতেও সে উন্মত্ততা থামে নি, নিজের চোখে না দেখলে এ ঘটনাও বিশ্বাস করতে পারতাম না।

দলে দলে লোক পুলিশের সশস্ত্র আক্রমণকে উপেক্ষা করে এগিয়ে চলেছে, মানবে

না তারা পুলিশের হুকুম, মানবে না তারা ইংরাজের জুলুম। দলে দলে তারা ভিড় করে এগিয়ে আসছে—মিলিটারি লরি পোড়াচ্ছে, পুলিশের গাড়ি আক্রমণ করছে, চৌরঙ্গিতে সাহেবি দোকান ভেঙে চুরমার করে দিচ্ছে। সে-সব ভিড়ের মধ্যে রয়েছে কারা? রাস্তার কুলি, রিকশাওয়ালা, ফলওয়ালা, ফেরিওয়ালা, ক্লাবের ছেলে, স্কুলের ছাত্র, অফিসের কেরানী। প্রত্যেকেরই চোখেমুখে বিদ্রোহ আর বেপরোয়া ভাব।

আমরা কংগ্রেসকর্মীরা মহা মুশকিলে পড়ে গেলাম। স্রোতের মুখের বাঁধ খুলে গিয়েছে—কলকাতার জনতার স্বতঃস্ফূর্ত জাগরণ। মনের অনেকদিনের চাপা উত্তেজনার আকস্মিক অগ্ন্যুৎপাত। একে থামানো আমাদের সাধ্যের অতীত। অথচ না পারি তা চোখ মেলে দেখে যেতে, না পারি তাতে নিজেরা ঝাঁপিয়ে পড়তে। চোখে দেখা যায় না এতগুলি জীবনের এভাবে অপচয়, এমনি কাতারে কাতারে নিরর্থক মরে যাওয়া। এতে যোগ দেওয়াও চলে না। জানতাম এভাবে হঠাৎ জ্বলে ওঠা আগুন হঠাৎই নিভে যাবে। এর পিছনে নেই কোনো প্ল্যান, নেই কোনো সুচিন্তিত উদ্দেশ্য, নেই কোনো প্রতিষ্ঠানের সমর্থন। কলকাতার এই খণ্ডসংগ্রামকে তখনই সারা ভারতব্যাপী করে তুলে গণবিপ্লব আরম্ভ করার স্বপ্নও কেউ কেউ দেখেছিলেন, কিন্তু সেটাও আমাদের কাছে একান্ত অসম্ভব, অলীক ছাড়া আর কিছু মনে হয় নি। কাজেই প্রাণপণ শক্তিতে তখনকার মতো সেই উত্তেজনাকে থামিয়ে রাখার চেষ্টা করা ছাড়া অন্য কোনো উপায় আমাদের ছিল না। কংগ্রেসের নামে সারা কলকাতার উন্মত্ত জনতার কাছে সারা শহর ঘুরে ঘুরে আমরা বলে বেড়ালাম—"সংগ্রাম এখনো আরম্ভ হয় নি। তোমরা শান্ত হও, তোমরা অপেক্ষা করো। সেদিন আসবে, শিগ্‌গিরই আসবে।"

আমাদের বর্ণিত "সেদিন" অবিশ্যি আর এল না। ইংরেজ ততদিনে বোধ হয় গোপনে তার ভারতবর্ষ ছেড়ে যাবার পরিকল্পনা প্রায় শেষ করে এনেছে। ভারতবর্ষের এই দুর্দম বিক্ষুব্ধ গণশক্তির সামনে শক্তি পরীক্ষায় নামবার ইচ্ছা তার আর রইল না। ১৯৪২ সালের বিপ্লব, আজাদ-হিন্দ ফৌজের অভিযান, বোম্বের আর-আই-এন বিদ্রোহ, কলকাতার নভেম্বর আর ফেব্রুয়ারির খণ্ডবিপ্লব—এরপর ভারতবর্ষকে আর ঠিক তাচ্ছিল্য করা চলে না। এমন দেশকে শাসন করায় লাভের চেয়ে যে ক্ষতিই বেশি "নেশান অব শপ্‌-কীপার্স" বণিক জাতির সেটা ধরতে আর দেরি হল না। তাই শাসনদণ্ডটা মানে মানে ছেড়ে দিয়ে অন্য দিক দিয়ে শোষণের কোনো পথ খোলা রাখা যায় কি না তারই সন্ধানে লেগে গেল তারা।

সে সময় কোনো একজন ইংরেজই যেন বলেছিলেন : "সমস্ত ভারতবর্ষটা এখন একটা বারুদের স্তূপের মতো হয়ে রয়েছে—একটি আগুনের স্ফুলিঙ্গে সমস্ত দেশটা জ্বলে উঠবে।"

সে স্ফুলিঙ্গ সোজা ইংরেজদের কাছ থেকে এল না। এল তাদেরই উস্‌কানিতে দেশের ভিতর প্রতিক্রিয়াশীল দলের হাত থেকে। ১৬ আগস্ট প্রত্যক্ষ সংগ্রামের দিনে কলকাতায় যে আগুন জ্বলে উঠল—আজও তা নিভলো না। মাঝে মাঝে ভয় হয় সমস্ত দেশটাকেই একেবারে ছাই করে দিয়ে যাবে না তো?

১৬ আগস্টের পর থেকে আজ অবধি দেশে যা ঘটে গিয়েছে তার বেদনা প্রকাশের কোনো ভাষা নেই, কলঙ্কের আর লজ্জারও কোনো সীমা নেই। গৃহযুদ্ধের এমন কুৎসিত রূপ আর কোথাও দেখা গিয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। চীনের চিয়াংকাইশেক-কম্যুনিস্ট সংঘর্ষ এর চেয়ে মনে হয় অনেক ভদ্র। প্যালেস্টাইনেও ইহুদী আর আরবরাও মুখোমুখি লড়াই করে, এমন কাপুরুষ কদর্য হিংস্রতা তাদের মধ্যে দেখতে পাওয়া গিয়েছে কি?

মহাত্মাজী এতদিন ধরে অহিংসার উচ্চসুরে দেশের মনের যে-তারটা বাঁধবার যা-কিছু চেষ্টা করেছেন, সুদে আসলে তারই শোধ তুলে নিলাম আমরা এই সাম্প্রদায়িকতার নিম্নতম পাশবিক স্তরে নেমে গিয়ে। ভারতবাসী আধ্যাত্মিক শান্তিপ্রিয় জাতই বটে! ইংরেজের সঙ্গে লড়াইয়ে যদি এতখানি রক্তক্ষয় হত, তাতে গ্লানি থাকত না কোনো, তার উদ্দেশ্যের মহত্ত্বে অন্য-সব-কিছুই চাপা পড়ে যেত। কিন্তু আমাদের এই গৃহযুদ্ধে—হিন্দু-মুসলমানের এই ছুরি মারামারি সম্পূর্ণ অর্থহীন, নিতান্ত গ্লানিপূর্ণ একটা ব্যাপার।

ধর্মের লড়াই বিংশ শতাব্দীতে অচল, সে হিসেবে ভারতবর্ষের সভ্যসমাজে অপাঙ্‌ক্তেয় হয়ে থাকাই উচিত। তৃতীয় পক্ষ ইংরেজের উপর সব দোষ চাপিয়ে অনেক সময় আমরা মনের বোঝা লাঘব করতে চাই। কিন্তু তৃতীয় পক্ষের হাতে খেলবার মতো মূঢ় যে আমরা এই স্বীকৃতিতে নিজেদের লজ্জা কমই ঢাকা পড়ে।

অনেকের মতে কংগ্রেস এভাবে ইংরেজের সঙ্গে সন্ধির পথে যদি স্বাধীনতা লাভ করতে না যেত, যদি বিপ্লবের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা আসত তা হলে আমাদের এই গৃহযুদ্ধ ঘটতো না। এই কথার পিছনে যুক্তি বা প্রমাণ দেখতে পাই কম। এটা কতকটা মনগড়া কল্পনা বলে মনে হয়। কংগ্রেস এর আগে বহুবার সংগ্রাম করেছে, কোনোদিনই মুসলিম-লীগ তথা মুসলিম জনসাধারণকে সেভাবে সঙ্গে পায় নি। বরং একদিকে যেমন কংগ্রেসের মধ্যে গণসংগ্রাম ধীরে ধীরে প্রসার লাভ করে চলেছিল, অন্যদিকে মুসলমান জনসাধারণ তেমনি ক্রমে ক্রমে—প্রায় শতকরা নিরানব্বই জনই—মুসলিম লীগকে, তার নগ্ন সাম্প্রদায়িকতাকেই দৃঢ় শক্তিতে আঁকড়ে ধরেছিল। নন্‌কোঅপারেশানের পর থেকে এই কুড়ি বছরের সংগ্রাম—হিন্দু-মুসলমানকে কাছে টানে নি বরং অধিকতর বিচ্ছিন্নই করে চলেছে। কাজেই বিপ্লব হলেই হিন্দু-মুসলমান এক হয়ে যেত—এ অভিমতের স্বপক্ষে কোনো প্রমাণ নেই।

অনেকে বলেন ১৯৪২ সালের সংগ্রামে মুসলিম লীগ যোগ না দিলেও বিরুদ্ধতা তো করে নি। এর উত্তর—তখনও প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধতার সময় আসে নি বলেই করে নি। যখনই তারা দেখল ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় আসছে, তখনই তাদের 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান' এই চিৎকার প্রবল হয়ে উঠল। আজ না হয় ঠিক একটা সংগ্রামের পরই ব্রিটিশ ক্ষমতা ত্যাগ করছে না বলে মনে হচ্ছে এটা ব্রিটিশের অনুগ্রহদত্ত দান এবং আজকের এই সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা কংগ্রেসের 'কমপ্রোমাইজিং' পলিশিরই বিষময় ফল।

কিন্তু কল্পনা করা যাক ১৯৪২ সালের সংগ্রামের সময়েই ইংরেজ পরাভব স্বীকার করল। তখনও ক্ষমতা হস্তান্তর হত কোনো-না-কোনো-দলের হাতে, এবং সে দল বোধ হয় কংগ্রেসই। সেখানে ঠিক সেই সময়ে মুসলিম লীগের আজকের এই মূর্তি প্রকাশ যে হত না, সেকথা বিশ্বাস করার পিছনে যুক্তি কতটুকু খুঁজে পাওয়া যায়?

কাজেই ওভাবে আজকের স্বাধীনতা লাভের এই পদ্ধতির উপর সমস্ত দোষ চাপিয়ে দেওয়ার অর্থ কিছু নেই। আসলে আমাদের এই সাম্প্রদায়িক সমস্যার মূল আরো অনেক গভীরে, এর কারণ আরো জটিল আর ব্যাপক। সাম্প্রদায়িকতার বিষে জর্জরিত মন নিয়ে সমস্ত দোষ ইংরেজের ভেদনীতি আর মুসলমানদের নীচ হিংস্র প্রকৃতির উপর না চাপিয়ে আমাদের আজ শান্তমনে এর বিচার করা দরকার। কার্যকারণ সূত্র ধরে বিশ্লেষণ করে দেওয়া দরকার—ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ, সামাজিক অর্থনৈতিক, আর মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। তাতে আসল গলদটা কোথায়, বিরোধের গভীরতম কারণ যে কী সেগুলো ধরতে পারা যাবে। আর তা ধরতে পারলেই অনেকখানি মানসিক ক্লেদমুক্ত হতে পারব আমরা। কারণ 'টু আন্ডারস্ট্যান্ড ইজ টু ফরগিভ।' আমাদের আজকের এই বিরোধের পিছনে তৃতীয় পক্ষ ইংরেজ বা শত্রুপক্ষ মুসলমান সম্প্রদায়ের কতখানি দোষ এবং দায়িত্ব সে বিশ্লেষণ আমি এখানে করব না। কারণ তার প্রয়োজন নেই। আজকের দিনে সে সম্বন্ধে আমরা প্রত্যেকেই অতি সচেতন। তার আলোচনায় নতুন কিছু লাভ নেই।

এই বিরোধের অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক কারণগুলোও যদিও আমি ছোটো করে দেখতে চাই না, কিন্তু কী জানি কেন কিছুদিন থেকে এর পিছনে সামাজিক কারণটাই আমার কাছে একান্ত বড়ো হয়ে দেখা দিয়ে সমস্ত মনটাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। আর কেমন যেন মনে হয়, এ সম্বন্ধে আমাদের হিন্দুসমাজের সচেতনতা অত্যন্ত কম। একদিক দিয়ে এই ব্যাপারে অন্ধই আমরা। আমরা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছি, একদিন কতকটা আত্মরক্ষার তাগিদেই হয়তো হিন্দুসমাজ নিজেকে যেভাবে নানান সংস্কার আর শুচিতার বেড়া দিয়ে আলাদা করে রেখেছিল, যা ক্রমে ক্রমে মুসলমান বা ম্লেচ্ছদের প্রতি নিদারুণ ঘৃণা আর অবজ্ঞায় পর্যবসিত হয়ে উঠল, তাই ক্রমে ক্রমে—আরো নানান প্রতিকূল শক্তির সঙ্গে মিশে গিয়ে আজকের হিন্দু আর মুসলমানের মধ্যে দুর্ভেদ্য ব্যবধানের প্রাচীরে পরিণত হয়ে উঠেছে।

অনেকবার যে গল্প অনেকের কাছে বলেছি এখানেও সেটা লিপিবদ্ধ না করে পারছি না। নোয়াখালি থেকে ফেরার পথে স্টিমারে একটি কলেজেপড়া মুসলমান মেয়ের সঙ্গে ভাব হয়েছিল। নানান কথায় ওকে বোঝাচ্ছিলাম ওদের ধর্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্র গড়তে যাওয়া কত হাস্যকর জিনিস, আজকের যুগে ওটা কত অচল। "ইতিহাসের ছাত্রী তুমি, ইতিহাসের কোথাও এ জিনিস পেয়েছ কখনও।" মেয়েটি তখন তর্ক করল না, ভাবলাম আমার শাণিত যুক্তিগুলো দিয়ে ওর মনে দাগ কাটতে পেরেছি। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই আমার সমস্ত অহংকার ধূলিসাৎ করে দিয়ে মেয়েটি গভীর আবেগের সঙ্গে বলে উঠল, "কুকুর-বেড়াল পাতের কাছে গেলে আপনারা ভাত ফেলেন না।

আমরা গেলে সে ভাত আপনাদের খাওয়া চলে না। এত ঘৃণা মনের মধ্যে রেখেও আপনারা আশা করেন আমরা আপনাদের আপন ভাবব?" ক্ষীণ দুর্বল প্রতিবাদ জানালাম, "কিন্তু আমরা কংগ্রেসের লোকেরা তো ও-সব মানি না?" মেয়েটি তার জবাবে বললে, "যাঁরা মানেন না তাঁরা ক'জন? হিন্দুসমাজের এক-দশমাংশও তো নয়।"

এরও উত্তর খুঁজে পেলাম না। মেয়েটির মধ্যে দেখতে পেলাম সমস্ত শিক্ষিত তরুণ মুসলমান সমাজের আহত আত্মাভিমান। এরাই তো মুসলিম লীগের মেরুদণ্ড, এরাই গ্রামে গ্রামে গিয়ে লীগকে শক্তিশালী করে তুলেছে। এদের মনের নিগূঢ় আত্মাবমাননা যতদিন না আমরা মুছে দিতে পারছি ততদিন মুসলিম লীগকে যত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি বলে গালাগালি দিই-না কেন তাকে ভাঙতে আমরা পারব না। হিন্দু-মুসলমানের আজকের এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড এরও পরিসমাপ্তি ঘটা কঠিন হবে। তরবারি দিয়ে তরবারিকে ঠেকিয়ে ভারত-বিচ্ছেদকে চিরন্তন করে রাখা যায়, ভারতকে আবার এক করা, শক্তিশালী করা যায় না।

হিন্দুসমাজের কর্ণধারদের আর দেশের নেতাদের এ জিনিসটা একটু তলিয়ে ভাবতে বলি। মনে করিয়ে দিতে ইচ্ছা হয় সত্যদ্রষ্টা কবির কঠোর মর্মভেদী অভিশাপবাণী :

> দেখিতে পাও না তুমি
> মৃত্যুদূত দাঁড়ায়েছে দ্বারে?
> অভিশাপ আঁকি দিল তোমার জাতির অহংকারে।
> সবারে যদি না ডাক, এখনও সরিয়া থাক,
> আপনারে বেঁধে রাখ চৌদিকে জড়ায়ে অভিমান,
> মৃত্যুমাঝে হবে তবে চিতাভস্মে সবার সমান।

কলকাতার দাঙ্গার কদিন অসহায় পঙ্গু দর্শকের মতো নিষ্ফল আক্রোশে ছটফট করে কাটিয়ে দিলাম। কত নির্দোষ লোককে চোখের সামনে মেরে ফেলল, কত লোকের ঘরবাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে গেল, কত নারী পুত্র-কন্যা-স্বামী সব হারিয়ে উন্মাদিনী হয়ে গেল; কত জায়গা থেকে ব্যাকুল সাহায্য চেয়ে পাঠাচ্ছে খবর পাচ্ছি, অথচ কিছুই করতে পারছি না। নিজেদের কিছুই করবার শক্তি নেই, না আছে অস্ত্রশস্ত্র, না আছে সাহস আর সঙ্গতি। দেশরক্ষার ভার যার উপর সেই দেশের সরকার নিজেই তো এ হাঙ্গামায় প্রধান অংশীদার হয়ে বসে রইল। কাজেই চার দিনের মধ্যে কলকাতায় পাঁচ হাজারেরও বেশি লোক মরল এবং আমরাও মানুষের সহ্যশক্তি কত অসীম, আর তার স্নায়ু কত শক্ত, সেটাই প্রমাণ করে দিয়ে তারপরও অনায়াসে হেসে-খেলে দিন কাটাতে লাগলাম। কিন্তু তখনও তো জানি না এখানেই এ দাঙ্গার শেষ নয়, সবে শুরু। কলকাতার ট্রাজেডির দু'মাসের মধ্যেই নোয়াখালি থেকে টেলিগ্রাম এল : "এখানকার অবস্থা অত্যন্ত সঙ্গীন, কলকাতার ঘটনা এর তুলনায় তুচ্ছতায় মিলিয়ে যাবে।"

নোয়াখালিতে আমরা যখন গিয়ে পৌঁছলাম তখন অবস্থা কিছুটা আয়ত্তে এসেছে—সবটা নয়। সুচেতাদি তার অনেক আগেই সেখানে গিয়েছেন, লাবণ্যদিও

রয়েছেন, শুনলাম মহাত্মাজীও শিগ্‌গিরই আসবেন। সুচেতাদি বললেন, "প্রথম দৌড়-ঝাঁপ করে যা করবার আমি করেছি, এই তো কত বিপন্ন লোককে তাদের গ্রাম থেকে বের করে এনে এখানে গাদা করলাম। কিন্তু এখন এদের নিয়ে কি করি? এইভাবেই বা কি করে থাকে এরা! আমি আর জানি না। এ সমস্যা আমার পক্ষে সমাধান করা সম্ভব নয়, বাপুজী আসছেন, তাঁর ওপর সব ভার চাপিয়ে দেব, আমি আর পারছি না।"

ওখানে থেকে কাজ করা, সুচেতাদিকে সাহায্য করা কত যে উচিত তা খুব ভালো করেই বুঝতে পারছিলাম। কিন্তু তবু কলকাতায় না ফিরলেও যে নয়—ফিরতে আমাকে হলই।

২০

যে কাজের তাগিদ আমাকে সেই দুর্দিনে নোয়াখালি থেকে ফিরিয়ে আনল—সেটা কিছুদিন পরেই আত্মপ্রকাশ করল অমৃতবাজার পত্রিকার কর্মচারীদের একান্ত অপ্রত্যাশিত ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে।

অমৃতবাজারের গোলমাল বহুদিন থেকেই ঘনিয়ে উঠছিল, ওখানকার ধর্মঘটের নোটিশ দিয়েই আমি নোয়াখালি চলে গিয়েছিলাম—কাজেই দশদিনের মধ্যে ফিরতেই হয় আমাকে। ওখানকার ইউনিয়নের আমি প্রেসিডেন্ট।

এর আগেও দু-একবার শ্রমিকদের ধর্মঘট পরিচালনা যে না করেছি তা নয়, এ সম্বন্ধে আমার কিছুটা অভিজ্ঞতাও ছিল। কত যে শক্ত কাজ তাও কিছু কিছু জানতাম। কিন্তু তবু অমৃতবাজারের ধর্মঘটের কাছে যে সমস্তই ম্লান হয়ে যায়। এবার যাকে বলে 'শক্ত পাল্লা' তাতেই পড়তে হয়েছিল। এর হারজিতের কাছে আমরা যেন কতকটা পণ করেছিলাম আমাদের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ, কংগ্রেসকর্মী হিসেবে আমাদের বহুপ্রচারিত কিষাণ মজদুর রাজ্যের আদর্শের পরীক্ষা, আর সর্বোপরি শ্রমিকদের মধ্যে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা।

অমৃতবাজার পত্রিকার ইউনিয়ন গঠন বেশিদিন হয় নি। সেই বছরই এপ্রিল মাসের গোড়ায় তারাদাস একদিন আমাকে এসে জানালে অমৃতবাজারের প্রেস-কর্মচারীরা একটা ইউনিয়ন করতে চায়, অনেক নেতাদের কাছে গিয়েছে, কেউই সাহায্য করতে রাজী হন নি। অমৃতবাজার কাগজকে কেউ চটাতে ভরসা পান না, পাবলিসিটি বন্ধ হয়ে যাবে যে। এক্ষেত্রে আমরা ভার নিতে পারি কি না? ঠিক পাবলিসিটি দাবি করার মতন নেতা আমরা কেউই নই, ওটা থাকায় বা বন্ধ হওয়ায় ক্ষতিবৃদ্ধি কতখানি আমরা তাও বুঝি না ঠিক। তা ছাড়া ভয়ে বা নিজেদের স্বার্থের জন্য শ্রমিকদের সাহায্য করব না, এর ক্ষুদ্রতাও মনকে আঘাত করল। খানিকটা যেন চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করা হিসাবেই তৎক্ষণাৎ রাজী হয়ে গেলাম। বীরেশ্বরবাবু, তারাদাস আর আমি, তিনজনে মিলে ওদের ইউনিয়ন গঠনে সাহায্য করতে এগিয়ে গেলাম। প্রথম প্রথম প্রেস-কর্মচারীরা অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে

থাকত। মিটিঙে কুড়ি-বাইশজনের বেশি লোক হয় না, ইউনিয়নের কথা বেশি খোলাখুলিভাবে বলতেও সাহস পায় না। কিন্তু দু-তিন মাসের মধ্যে এ ভাবটা কেটে গেল। ক্রমে প্রায় সকলেই ইউনিয়নে যোগ দিল। প্রথম শুধু প্রেস-কর্মচারীরা ছিলেন, ক্রমে অফিস কর্মচারী ও সাবএডিটাররাও সবাই এসে যোগ দিলেন। ওদের যত বিক্ষোভ আর অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরে জমেছিল এখন যেন সব একসঙ্গে ফেটে পড়ল। দীর্ঘ চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর ধরে যাঁরা কাজ করছেন, অমৃতবাজার কাগজে যাঁরা বুকের অর্ধেক রক্ত ঢেলে দিয়েছেন, তাঁদেরও কারো মাইনে ৩০ টাকা, কারোর বা ৪০ টাকা। জরাজীর্ণ, ক্ষীণদৃষ্টি এ-সব বৃদ্ধরা যেন অমৃতবাজার কাগজখানার বিরুদ্ধে মূর্তিমান বিদ্রূপ, যে কাগজ জাতীয়তাবাদী বলে প্রসিদ্ধ, যেখানে প্রতিদিন পাতার পর পাতা ধরে প্রচারিত হয়ে চলেছে কত সোশ্যালিজম, কত ট্রেড ইউনিয়নিজম, কত গান্ধীবাদ—প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে কত ন্যায়, সাম্য আর সুবিচারের দাবি।

বৃদ্ধরা ছাড়া ওখানে যুবকরাও রয়েছে, যারা নতুন যুগের মানুষ, মানুষের দাবি সম্বন্ধে যারা সচেতন। এদের প্রধান অভিযোগ—অমৃতবাজারে মনুষ্যত্ব প্রতিপদে লাঞ্ছিত হয়, তোষামোদ আর ফেভারিটিজ্‌ম আর খামখেয়ালীতে কাগজখানার ম্যানেজমেন্ট আগাগোড়া ভরা। এ-সবকে থামানো ইউনিয়নের প্রধানতম কাজ। ঠিক এতখানি অসন্তোষ আর বিক্ষোভ যেখানে জমে আছে, সেখানে ধর্মঘট আটকাবে কে? কর্তৃপক্ষ ভুল করেছিলেন—আমরা ধর্মঘট ওখানে করাইনি, একটা অবশ্যম্ভাবী ঘটনাকে মেনে নিয়ে তাকে পরিচালিত করেছিলাম মাত্র। কিন্তু কর্তৃপক্ষ ব্যাপারটাকে কেবলই বিকৃত করে দেখতে চেষ্টা করলেন। প্রথম একবার প্রচার করা হল—"এটা কম্যুনিস্টদের কারসাজি, জাতীয়তাবাদী কাগজকে ধ্বংস করার চেষ্টা।" অনেকেই কথাটা বিশ্বাস করল। আমরা বারে বারে বলতে লাগলাম, "ইউনিয়নের কর্মকর্তাদের মধ্যে একজনও কম্যুনিস্ট নেই, সবাই কংগ্রেসের সভ্য আর আমরা বাইরের যারা আছি প্রত্যেকেই কংগ্রেসকর্মী।" তখন তাঁরা বললেন যে হয় আমরা রাতারাতি কম্যুনিস্ট পার্টিতে চলে গিয়েছি, আর নয়তো কম্যুনিস্টদের ফাঁদে এভাবে পড়ে গিয়েছ যে নিজেরাই বুঝতে পারছি না। অর্থাৎ আমরা কংগ্রেসকর্মীরা এমনই নিরেট বুদ্ধি নিয়ে রাজনীতি করি যে কম্যুনিস্টদের হাতে খেলাটা আমাদের পক্ষে যেন খুবই সহজ আর স্বাভাবিক ব্যাপার।

এই সময় কংগ্রেসের কাছ থেকে আমরা আরো সাহায্য আশা করেছিলাম, কিন্তু পেলাম না। অনেকগুলো প্রশ্ন এ সময় সামনে এসে পড়ল, সেগুলোর সমাধান হওয়া দরকার ছিল, এবং আজও আরো বেশি করেই আছে। কংগ্রেস মহলে কোথাও কোথাও তখন প্রথম একটা কথা শোনা গেল, কংগ্রেসের এ-সব ব্যাপারে নিরপেক্ষ থাকা উচিত, শ্রমিক-মালিকের বিরোধে কংগ্রেসের কর্তব্য হচ্ছে মধ্যস্থতা করা, সালিশি করা। কংগ্রেসকে যাঁরা বিশ্বাস করেন একটা সর্বশ্রেণীর প্রতি সমভাবনাপন্ন প্রতিষ্ঠান তাঁদের একথা বলা চলে। কিন্তু আমরা যারা বারবার বলে এসেছি, "কংগ্রেস বিবর্তিত হয়ে হয়ে আজ গণ-প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়ে উঠেছে, আজকে দেশের দুঃস্থ জনসাধারণের স্বার্থ আর

কংগ্রেসের স্বার্থ এক; কংগ্রেসের উদ্দেশ্য কিষাণ মজদুর রাজ প্রতিষ্ঠিত করা; যেখানে ধনিকে-শ্রমিকে, জমিদারে-প্রজায় লড়াই কংগ্রেস সেখানে বিনাদ্বিধায় শ্রমিক আর কিষাণের পক্ষ নেবে, অবশ্য যদি সে লড়াই ন্যায়সঙ্গত দাবি নিয়ে হয়; কংগ্রেসের মধ্যে থেকে, কংগ্রেসের ভিতরই আমাদের কিষাণ আর শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ করা উচিত; অন্য কোনো দল করে কংগ্রেসের বাইরে থেকে করার প্রয়োজন নেই;" আমাদের এতদিনের এই এতগুলো কথা বা বিশ্বাস কি সম্পূর্ণ ভুল?

তা যদি হয় তা হলে তো আমাদের আগাগোড়া সব-কিছু নতুন করে ভাবতে হয়। আর যদি ভুল না হয়, তাহলে কিছুতেই বলা চলে না কংগ্রেস নিরপেক্ষ থাকবে। মজদুরদের মধ্যে কংগ্রেসের নামে কাজ করব আমরা, তাদের সংঘবদ্ধ করব, তাদের অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত (আমাদের বিচারেই অবশ্য) দাবি নিয়ে সংগ্রাম করব, আর কংগ্রেস তখন বলবে : "আমাদের কাছে শ্রমিকও যা মালিকও তা। অতএব আমি নিরপেক্ষভাবে বলছি তোমরা উভয়েই ঝগড়াটা লক্ষ্মীছেলের মতো মিটিয়ে ফেলো।" এতে শ্রমিকরা কংগ্রেসের প্রতি আস্থাই বা রাখবে কেন? কংগ্রেসের নামে সংঘবদ্ধই বা হতে চাইবে কেন? তার তখন স্বতই ঝুঁকবে সেই-সব প্রতিষ্ঠানের দিকে যারা তাদের রুটির লড়াইয়ের দিনে তাদের পিছনে এসে দাঁড়াবে, তাকে সম্পূর্ণ ও স্পষ্ট সমর্থন জানাবে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন তখন উঠেছিল, আমাদের ধর্মঘট যে ন্যায়সংগত কংগ্রেস তা বুঝবে কী করে? আমরা কি কংগ্রেসকে জানিয়ে কংগ্রেসের মত নিয়ে এ লড়াই আরম্ভ করেছিলাম যে আমরা আশা করব কংগ্রেস আমাদের সমর্থন করবে? কে কোথায় কখন কবে এরকম ধর্মঘট আরম্ভ করে বসবে, আর তার ঝুঁকি কংগ্রেস নেবে—এ আশাও করা অন্যায়। কিন্তু এর উত্তরে আমরা বলব, কংগ্রেসের 'লেবার সাব-কমিটি' তখন গঠিত হয় নি; কাজেই কংগ্রেসের মত নিতে গেলে কাকে জানাব! এক একজিকিউটিভ কমিটিকে জানাতে পারতাম, কিন্তু প্রত্যেকটা ধর্মঘটে কংগ্রেসের একজিকিউটিভ কমিটির মিটিং ডেকে তার মত নিয়ে করতে হবে এরকম কোনো ব্যবস্থা আছে বলে আমরা জানতাম না। ব্যাপারটা শুধু অসুবিধাজনকই নয়, খানিকটা অসম্ভবও। তবু সেটাই যদি বিধান আছে জানতাম, তা হলে তাও করতে ত্রুটি আমরা করতাম না।

তা ছাড়া আরো একটি কথা—কংগ্রেসের নামে, কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আমরা শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করি, সেকথা কংগ্রেসের কর্তৃপক্ষ প্রায় সকলেই জানতেন। অনেক সময় তাঁরাই আমাদের জানিয়েছেন, "সেখানে একবারও যেও, অমুক শ্রমিকদের গোলমালটা একবার দেখো।" সেখানে আমরা যে একেবারে সকলের অজ্ঞাতে, দায়িত্বশূন্যভাবে, নিতান্ত ব্যক্তিগতভাবে কাজ করছি এটা আমরা একবারও মনে করি নি। যারা দল করে, তারা জানে তাদের সমস্ত কাজের পিছনে সেই দলের সমর্থন রয়েছে। আমাদের অন্য কোনো দল নেই, কিন্তু মনে মনে বিশ্বাস করি আমাদের পিছনে রয়েছে কংগ্রেসের সমর্থন। যখন কংগ্রেসের একান্ত অন্তরঙ্গ মহলেও কোথাও কোথাও যেন আমাদের কেউ চেনে না, আমরা কী করছি না করছি তা নিয়ে কারো

দায়িত্ব নেই—এই রকম আভাস ফুটে উঠতে লাগল, তখন আমাদের অবস্থাটা অনেকটা দস্যু রত্নাকরের মতোই হয়ে উঠল—তার পাপের ভাগ, যাদের জন্য পাপ করে, সেই মা, বাবা, স্ত্রী কেউই নিতে চাইল না। আমরাও কংগ্রেস কংগ্রেস করে যত চিৎকারই করি-না কেন, কংগ্রেস রাজী হয় না আমাদের সুকৃতি অথবা দুষ্কৃতির বোঝা স্বীকার করে নিতে।

ধর্মঘটীদের কাছে লজ্জা পেলাম, তাদের কাছে বলেছিলাম অন্যরকম। আমরা এমন চালচুলোহীন সংগতিহীন জানলে ওরা আমাদের ইউনিয়নে ডাকত কি না কে জানে, কারণ ওরা তো আমাদের ডাকে নি—ডেকেছিল কংগ্রেসকে। যা হোক, তবু কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের বিশেষ সমর্থন না পাওয়ার জন্যই যেন আরো ইস্পাত-কঠিন দৃঢ়তা নিয়ে আমরা ধর্মঘট চালিয়ে গেলাম। আমাদের লজ্জা আর চিন্তা খানিকটা লাঘব করে কংগ্রেস মহিলা সাব-কমিটির সম্পাদিকা কমলাদি তাঁর মহিলাকর্মীদের নিয়ে আমাদের পাশে এসে দাঁড়ালেন—নিজে দরজায় দাঁড়িয়ে 'পিকেটিং' করলেন। এ সময়ে কয়েকজন কংগ্রেসকর্মীও নানাভাবে আমাদের সাহায্য করেছেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র কংগ্রেসের সেক্রেটারি, প্রেসিডেন্ট আর কর্মীদেরও সব সময়েই পেতাম। শুধু ছাত্র কংগ্রেস নয়, প্রত্যেকটি ছাত্র প্রতিষ্ঠানই তাদের আন্তরিক সহানুভূতি আর অকুণ্ঠ সাহায্য নিয়ে এগিয়ে এল। ধর্মঘটীদের সাহায্য ভাণ্ডার জনসাধারণ ও অন্যান্য শ্রমিক প্রতিষ্ঠানের অকৃপণ দানে পূর্ণ হয়ে উঠল। অনেক ঝড়-ঝাপটা অতিক্রম করে অনেকদিন পরে আমাদের ধর্মঘট সাফল্যলাভ করল। আজকে অমৃতবাজার ইউনিয়ন সুপ্রতিষ্ঠিত। শ্রমিকদের অতদিনের অতখানি দৃঢ়তা, সংহতি আর দুঃখবরণ ব্যর্থ হয় নি।

ধর্মঘট মিটে যাবার পর সকলকে জানালাম এবার আমি নোয়াখালি যাব। তারাদাস পরিহাস করে বলল, "কী, শনিবারের চিঠির সমালোচনার ভয়ে নাকি?"

উত্তরে বললাম, "না ভাই, তাগিদ আরো গভীরেরই।"

২১

নোয়াখালিতে এবার যখন এসে পৌঁছলাম দুর্যোগের প্রথম ভয়ংকর দিনগুলো তখন কেটে গিয়েছে। মহাত্মাজীর নির্দেশে সুচেতাদি বিধ্বস্ত গ্রামগুলিতে একটি করে কংগ্রেস ক্যাম্প খুলে দু-তিনজন করে কংগ্রেসকর্মী বসাচ্ছেন। তারা গ্রামের লোকেদের সাহস দেবে, পুণর্বসতিতে সাহায্য করবে, সাম্প্রদায়িক সম্ভাব ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করবে। আমাদের চারজনের—আমি, মৃদুলা (মৃদুলা দত্ত, সদ্য এম্. এ, পাশ করা ছাত্রী), তারাচরণ (কলেজের ছাত্র) আর ডাক্তার গোডেক্কারের (বোম্বের মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র, নোয়াখালিতে কাজ করতে এসেছিলেন)—উপর ভার পড়ল রামগঞ্জথানার 'নোয়াখোলা' গ্রামে গিয়ে বসবার। জায়গাটা খারাপ। প্রথম যেদিন বোঁচকা-বুঁচকি নিয়ে আমরা সেখানে গিয়ে পৌঁছলাম, চারদিকে এমনি থমথমে ভাব যে গা ছমছম করে। যেদিকে তাকাই

শুধু পোড়া বাড়ি, লোকের মুখ দেখাই যায় না। চারদিকে শুকনো মাঠ—খাঁ খাঁ করছে। একটা আধ-পোড়া বাড়িতে প্রথম গিয়ে উঠলাম। বাড়ির মালিক বুড়ো বৈকুণ্ঠ দত্ত আর তার নাতি কামিনী কাছাকাছি কোথায় ছিল, আমাদের দেখে বেরিয়ে এল। কংগ্রেস থেকে আসছি শুনে আনন্দে উচ্ছ্বাসে বুড়ো কেঁদে ফেলে প্রায়, "কী অবস্থায় এই জনশূন্য অরণ্যে পড়ে আছি শুধু আমিই জানি।" ওর বাড়ির মেয়েরা এ-বাড়িতে থাকতে পারে না, কাছেই আর এক 'দত্ত'দের বাড়িতে গিয়ে রয়েছে। দিনের বেলা কখনও এ-বাড়িতে আসে, রান্নাবান্না করে, সন্ধ্যা হতে-না-হতেই আবার চলে যায়। সেই 'দত্ত'দের বাড়িতে গিয়ে দেখি বাড়িটা অপেক্ষাকৃত বড়ো, পুড়েও যায় নি। বাড়ির একজন কর্তা স্থানীয় পোস্টমাস্টার। সেখানে ঘর চেয়ে নিয়ে আমরা ক্যাম্প খুলে বসলাম।

প্রথম ক'টা দিন কাটল নোয়াখোলা আর তার আশেপাশের কয়েকটা গ্রাম দেখেশুনে। শিগ্‌গিরই পুনর্বসতির টাকা পাওয়া যাবে, তার জন্য ক্ষতিপূরণের লিস্ট আমাদের তৈরি রাখা দরকার। এই সুযোগে গ্রামগুলোর সঙ্গে প্রথম পরিচয়টাও হয়ে গেল। আমাদের ক্যাম্প খোলার খবর রটে যাবার পরই অনেকে গ্রামে ফিরে আসতে লাগল। তা ছাড়া পুনর্বসতির টাকা শিগ্‌গির দেওয়া হবে সে খবরও রটে যাওয়ায় অনেক লোক ফিরতে লাগল। প্রায় এক সপ্তাহের মধ্যে সমস্ত গ্রামেরই চেহারা বদলে গেল। প্রথম দিনে সেই থমথমে ভাব যে এই গ্রামেই দেখেছিলাম সেটা যেন আমাদের কাছেই স্বপ্নের মতো মনে হত। এ গ্রামের সবচেয়ে বড়ো বাড়ি চৌধুরীবাড়িতে আটজনকে হত্যা করা হয়েছে, এইখানেই ছিল সেই বিখ্যাত কালো কুকুর যে গান্ধীজীকে সারাবাড়িতে পথ দেখিয়ে দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, যাকে দেখে গান্ধীজী চোখের জল সামলাতে পারেন নি। ঠাকুরবাড়িতে খুন হয় নি, কিন্তু যা হয়েছে তাও কম নয়। এ-বাড়ি বাঙলার একটি প্রসিদ্ধ বিদ্বান পরিবারের, বহু বিদ্যানিধি, বিদ্যালঙ্কার, সর্বালঙ্কার এই পরিবারে ছিলেন। তাঁদের বহু যত্নের, বহুদিনের সঞ্চিত বহু দুর্লভ সংস্কৃত বই আর পুঁথির একটি লাইব্রেরি ছিল; সেটা সম্পূর্ণ ছাই হয়ে গিয়েছে, একটি ছেঁড়া পাতাও আর খুঁজে পাওয়া যায় না।

নোয়াখালিতে লক্ষ্য করার জিনিস—দাঙ্গার সময় বড়ো বড়ো জমিদার বাড়িতেই অত্যাচারটা বেশি হয়েছে, এবং ওখানকার কোনো কোনো জমিদারও যে অত্যন্ত অত্যাচারী, মামলাবাজ, সুদখোর ছিলেন একথা ওখানকার হিন্দুরা নিজেরাই স্বীকার করে। কাজেই ওখানকার হাঙ্গামার পিছনের অর্থনৈতিক কারণটাও তুচ্ছ করবার নয়। তবে সমস্ত ব্যাপারটা ধর্মের সঙ্গে মিশে বিকৃত হয়ে উঠেছিল আর কি। তাছাড়া এত লুঠতরাজেও গরিব মুসলমানেরা পায় নি কিছুই। কোথায় যে লুঠের সমস্ত টাকা অদৃশ্য হয়ে গেছে কে জানে। আমরা এ কথা ওখানকার মুসলমানদের কেবলই বলতাম, "অত যে লুঠ করলে, তবু তো তোমাদের সেই ভাঙা ঘর আর ছেঁড়া কাপড়, লুঠের টাকা গেল কোথায় তোমরা ভেবেও দেখ না।" আমাদের কথাগুলো ওদের মন স্পর্শ করত তা বুঝতে পারতাম, যদিও তারা মুখে বিশেষ কিছুই বলত না।

গ্রামে যে আবার সহজ জীবন ফিরে আসছে, সেটাই প্রমাণ করবার জন্য গ্রামের লোকেরা ঠাকুরবাড়িতে একদিন রাত্রে হরিসংকীর্তনের ব্যবস্থা করলেন। বাদ্যযন্ত্র কতগুলো পুকুরে আর জঙ্গলে লুকানো ছিল, সেগুলো বার করে এনে, হারমোনিয়ম, ঢাক-ঢোল বাজিয়ে গলা ফাটিয়ে সে কী কীর্তনের ধূম! মৃদুলা কানে কানে ফিসফিস করে বলল—"বীণাদি, এরাই যখন ক্যাম্পে টাকার দরখাস্ত নিয়ে যায় কি রকম মিনমিন করে। এখন তো দেখি খুব তেজ!"

নোয়াখালিতে আবার বৈষ্ণবদের বেজায় ছড়াছড়ি। সকলেরই প্রায় গলায় কণ্ঠি রয়েছে, নবদ্বীপে গুরু রয়েছেন। আমার কেমন সন্দেহ হত অন্য বহুবিধ কারণের সঙ্গে নোয়াখালির হিন্দুদের এই চরম দুর্দশা আর ভীরুতার পিছনে এই বৈষ্ণব ধারাও খানিকটা ছিল না তো?

আমরা বাঙালি মাত্রই অলস জানতাম। তবু নোয়াখালির হিন্দুদের আলস্য আমাদেরও যেন ধৈর্যচ্যুতি ঘটাত। আমাদের যাওয়ার অল্প কিছুদিন পরেই, আমাদের এলাকার গ্রামে মহাত্মাজীর আসবার খবর এল। সেই উপলক্ষ্যে রাস্তাঘাট পরিষ্কার করা, সাঁকো বাঁধা প্রভৃতি নিয়ে সবাই কিছুদিন ব্যস্ত রইলাম। উদ্দেশ্য এই সুযোগে গ্রামগুলো একটু পরিষ্কার আর বাসযোগ্য করে তোলা। সেই সময় গ্রামের লোকদের দিয়ে কোনো কাজ করানো, বিশেষ করে কোনো জনহিতকর কাজ করানো কী যে দুরূহ ব্যাপার তার খানিকটা পরিচয় পেলাম। গান্ধীজী আসছেন, এতেও তাদের কোনো উৎসাহ নেই, নিষ্প্রাণ নিরানন্দ চোখ নিয়ে চেয়ে থাকে। তবু ওর মধ্যেই দু-চারজন উৎসাহী যুবক পাওয়া গেল। তা ছাড়া প্রতিদিন উৎসাহ আর আনন্দের বড়ো বড়ো ডোজের ইনজেক্‌শন দিয়ে দিয়ে বাদবাকি লোকদেরও কাজে নামিয়ে নেওয়া গেল—সবশুদ্ধ আয়োজন মন্দ হল না। গান্ধীজী বরং আপত্তি করলেন, "এত বেশি আয়োজন করলে কেন? এ-সব চাঁদোয়া আর সাজসজ্জার কী দরকার ছিল?"

অনেকদিন পরে আবার গান্ধীজীকে কাজে পেলাম। বাঙলা দেশের বড়ো অভিমান ছিল গান্ধীজী বাঙলাকে বেশি ভালোবাসেন না। এবার তাদের সব দুঃখ-অভিমান নিঃশেষে মুছে দিয়ে বাঙলার চরম দুর্দিনে গান্ধীজী তাদের অত্যন্ত কাছে এসে দাঁড়ালেন, সমস্ত ভাবনা, চিন্তা, সমস্যার বোঝা মাথায় তুলে নিলেন। দুটো দিন প্রায় সারাক্ষণই তাঁর কাছে ছায়ার মতো ঘুরলাম। এমন করে তাঁকে কাছে পাবার সুযোগ আর কি কোনোদিন আসবে?

নোয়াখালির সেদিনের সেই অবস্থায় কোনো পথ কোনো আলোই দেখতে পাই না। হিন্দুরা সংখ্যায় এত কম, কোনো কোনো গ্রামে মাত্র চার-পাঁচ ঘর হিন্দু রয়েছে, তা ছাড়া বাড়িগুলোও এত দূরে দূরে, এরকম অবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠদের ওরকম মনোভাবের মাঝে কী করে থাকবে ওরা? ভরসা দেবার কোনো কিছুই খুঁজে পাই না যে? বাপুজীকে সব কথাই খুলে বললাম। তিনি বললেন, "সবই তো ঠিক, কিন্তু কীই বা করা যায়? তবে কাউকে তো আমরা ফিরে আসতে জোর করছি না; যদি আসে, তাদের কাছে,

তাদের পাশে আমরাও রয়েছি। আর যদি কিছু নাও পারি ওদের সঙ্গে মরতে তো পারব।"

বড়ো যেন করুণ আর অসহায় শোনাচ্ছিল ওঁর মুখের কথাগুলো।

আমাদের গ্রামে কিছুদিন আগে ইদ্রিস পাঠারী বলে একটি মুসলমানকে মেরে ফেলেছে মুসলমানরাই। দুই দলে লুঠের মাল নিয়ে ঝগড়ার ফলাফল আর কি! খুনটা আমরা ক্যাম্প থেকে করিয়েছি বলে গ্রামে ভীষণভাবে রটানো হচ্ছিল। গান্ধীজীকে জানিয়ে রাখলাম ব্যাপারটা, বললেন, "সত্যিই আমাদের ক্যাম্পের ও-ব্যাপারে কোনো যোগ নেই তো! তবে আর কি? নিশ্চিন্ত থাক্, যা খুশি বলুক ওরা।" তারপর মৃদুলাকে হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, "ফাঁসি যেতে পারবি তো?"

গান্ধীজীর সঙ্গে প্রার্থনা সভার পর সন্ধ্যাবেলা একসঙ্গে বেড়াতে গেলাম। গ্রামের সে পথটা পরিষ্কার করা হয় নি তত। কে যেন আমাদের বললেন, "আপনি আগে আগে গিয়ে পথটা দেখুন, কাঁটা আছে কি না।" তাকিয়ে দেখি আমার পায়ে চটি। তাড়াতাড়ি এক পাশে গিয়ে পায়ের চটিটা খুলে ফেলে গান্ধীজীর কাছে চলে এলাম। ওঁর চোখ এড়াল না, পরম স্নেহের সুরে বললেন, "বীণা, তোর পা খালি করলে আমি কি আমার পায় কম ব্যথা পাব রে?"

সেদিন রাস্তায় অনেক গল্প করলাম, বাঙলায় আগে কবে কবে গান্ধীজী এসেছেন, বাঙলা ভাষা কবে প্রথম শিখতে আরম্ভ করেন, সেই সব পুরোনো দিনের গল্প। রবীন্দ্রনাথের কথা উঠল, বললাম, "ভাগ্যিস উনি আজ বেঁচে নেই, বাঙলার এই অবস্থা সহ্য করতে পারতেন না তিনি।"

গান্ধীজী সায় দিয়ে বললেন, "ঠিক বলেছিস, রবীন্দ্রনাথের মন অত্যন্ত কোমল ছিল। আমার সেবারের সেই প্রায়োপবেশনের সময় আমার কাছে গিয়েছিলেন, তখন তিনি চোখের জল রাখতে পারেন নি।"

এবার গান্ধীজীকে দেখে আমার কেবলই মনে হচ্ছিল, উনি যেন বড়োই একা, কেউ কোথাও যেন ওঁর সঙ্গী নেই। ওঁর মনের সাহচর্য দিতে পারে এমন মানুষই বা সংসারে কোথায়? যাঁরা পারতেন তাঁরাও তো কেউ আজ নেই : মহাদেব দেশাই, কস্তুরবা, রবীন্দ্রনাথ। গান্ধীজী নোয়াখালিতে তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যদের সব দূরে দূরে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কাছে ছিল শুধু নাতনী। তাছাড়া ঘিরে ছিল সব সংবাদপত্রের রিপোর্টারদের দল। রিপোর্টারদের অনেকেরই চেনা-মুখ। তাঁদের কলকাতায় অন্য আবহাওয়ায় বরাবর দেখে এসেছি। এখানে ওঁদেরও অন্য মূর্তি, গান্ধীজীকে ঘিরে রয়েছেন সারাক্ষণ। ওঁর সঙ্গে গ্রাম থেকে গ্রামে হেঁটে চলেছেন, পথে গান গেয়ে গেয়ে গান্ধীজীর শ্রান্তি দূর করছেন, প্রার্থনা সভায় রামধুন আর রবীন্দ্রসংগীত গাইছেন। হেসে বললাম, "একেবারে গান্ধী-শিষ্য হয়ে গেছেন সবাই!"

তাঁরাও হেসে উত্তর দিলেন, "না হয়ে উপায় কী বলুন?"

সব চাইতে ভালো লাগত ভোরবেলা গান্ধীজীর সঙ্গে এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে

যাওয়াটা। সারাপথ গান গাওয়া হত : "যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে," "তোর আপনজনে ছাড়বে তোরে", "একবার তোরা মা বলিয়ে ডাক" প্রভৃতি গান্ধীজীর প্রিয় রবীন্দ্রসংগীতগুলি।

ভোরবেলার শিশিরভেজা পথ, কপালে মাথায় পড়েছে প্রভাতসূর্যের প্রথম আলো, গান্ধীজীর পাশে পাশে রবীন্দ্রনাথের গান গাইতে গাইতে এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে যাওয়া—কেবলই মনে হচ্ছিল, আমাদের এ যাত্রা যেন শেষ না হয়। এই পথ বেয়েই যেন পৌঁছে যেতে পারি মানুষের চরম কল্যাণের শিখরে—যেখানে নেই কোনো রক্তের দাগ, নেই কোনো স্বার্থের হানাহানি, নেই অন্যায় আর অত্যাচারের উদ্ধত আস্ফালন।

২২

মাঝে মাঝে নিজেদের গ্রামের এলাকা ছাড়িয়ে অন্য গ্রামেও যাওয়া হত। একদিন রায়পুরা থানার দালালবাজারের ধ্বংসস্তূপ দেখে এলাম। বিরাট দুর্গের মতো বাড়ি ভেঙে পুড়ে ছাই হয়ে রয়েছে। শুনলাম ওদের নাকি বারোটা বন্দুক ছিল, নোয়াখালির সবচেয়ে ধনী ওরা, তবু কোনো বাধা না দিয়ে রাতারাতি পালিয়ে গিয়েছে, বন্দুকগুলো থানায় জমা দিয়ে গিয়েছে হয়তো! নোয়াখালির অনেকেই বলেন, এক ওই দালালবাজার থেকেই প্রতিরোধ করে সারা জেলাটাকে বাঁচিয়ে দেওয়া যেত। এদের পালানোর ফলে নৈতিক শক্তি একেবারেই ভেঙে যায়।

এরপর একদিন সন্ধ্যায় সায়েস্তানগরের চিত্ত রায়ের বাড়িতে যাওয়া হল। মনে হল যেন কোনো তীর্থস্থানে এলাম। ভাঙা পাথরের দু-চারটে টুকরো কুড়িয়ে ব্যাগে ভরলাম। দু'জন মুসলমান কাছাকাছি কোথায় ছিল, সামনে এসে নিজে থেকেই সবিস্তারে গল্প শুরু করল। চিত্তবাবুকে অনেক বলেও কেউ বাড়ি থেকে পালাতে রাজী করতে পারে নি। ঘটনার আগের দিন রাত্রে বসে বসে কারা আগে মরবে তার ফর্দ তৈরি করেছেন। কিন্তু সেই রাত্রেই নাকি তাঁর স্ত্রী তাঁকে লুকিয়ে ছেলেমেয়েদের নিয়ে পালিয়ে কাছের কোন্ মুসলমান বাড়িতে আশ্রয় নেন। বুড়ি মা কিন্তু শেষ পর্যন্ত বীর ছেলেকে বুকে আঁকড়ে ছিলেন। সামনে মস্ত একটা নাটমন্দির থাকায় যুদ্ধ করার অসুবিধা হয়, বন্দুকের গুলিগুলো কেবলই লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে থাকে। শেষকালে গুলি যখন শেষ হয়ে গেল, আর কোনো আশা নেই দেখে চিত্তবাবু নিজের হাতে মা'র বুকে ছুরি বসিয়ে দিয়েছিলেন, সঙ্গীদেরও একে একে মেরে ফেলেছিলেন। তারপর নোয়াখালির শেষ বীর নিজের বুকে ছুরি বসিয়ে মৃত্যুবরণ করেন। বাড়িটা তখন আগুনে ঘিরে ফেলেছে। জীবন্ত চিত্তবাবুকে ওরা পেল না, কিন্তু তাঁর মাথাটা কেটে নিয়ে ফুলবল খেলেছিল।

আসন্ন সন্ধ্যার আবছায়া ঘনিয়ে আসছে—এদিক-ওদিক থেকে দু-একজন অপরিচিত লোক স্বেচ্ছায় বেরিয়ে এসে এমনি সব গল্প করছে। মনে হচ্ছিল যেন প্রাচীনকালের কোনো দুর্গ বা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ কোনো স্থানে এসে দাঁড়িয়েছি। এ কার গল্প শুনছি?

রাজপুত কোনো বীরের, মারাঠী কোনো যোদ্ধার, না গুরুগোবিন্দের কোনো শিষ্যের? সমস্ত শরীরে থেকে থেকে কাঁটা দিয়ে উঠছিল। চিত্তবাবুর বর্ণনা করলেন কালিদা (নোয়াখালির সার্বজনীন কালিদা, এমন মানুষ আগে দেখি নি, মনটা মাধুর্যে ভরা, করুণা উপচে পড়ছে চোখে মুখে—সমানভাবেই সবার কালিদা)। কালিদার অনেকদিনের চেনা চিত্ত রায়—খুব সুন্দর চেহারা ছিল, বয়স খুব বেশি নয়, পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ হবে। স্বাস্থ্য আর শক্তি শরীরে ধরত না, শিকারে, খেলাধুলায় সব সময়ে মেতে থাকতেন।

"বাবাঃ, এমন নির্জন জায়গায় ওরা থাকত কী করে? আসতে এক মাইলের মধ্যে জনমনুষ্যের সাড়া পাই নি"—আমাদের মধ্যেই একজন মন্তব্য করলেন।

কালিদা বললেন—"আহা তাতে কী, নিজেরা নিজেদের নিয়ে থাকত। বাড়িভরা কত লোকজন, তা ছাড়া গ্রামে কত নাচগান, কত আমোদপ্রমোদ।"

সামনের ভাঙা পোড়া বাড়িটার দিকে চেয়ে কল্পনা করতে চেষ্টা করলাম : গ্রামের প্রকাণ্ড জমিদারবাড়ি—দাসদাসী, লোকজন, নায়েব-গোমস্তা। জমিদার চিত্ত রায়ের কলকাতা থেকে আসা বন্ধুবান্ধবের ভিড়। বাড়ির অন্তঃপুরে লক্ষ্মীর ঐশ্বর্য আর শ্রী। মনে হল জমিদার চিত্ত রায় ধ্বংসোন্মুখ জমিদারগোষ্ঠীর শেষ আভিজাত্য আর অভিমানে শেষবার জ্বলে-ওঠা -শিখায় আকাশ রাঙা করে পূর্ণ গরিমায় অস্ত গেলেন, প্রায়শ্চিত্ত করে গেলেন দেড়শো বছরের জমিদারি প্রথার পরতে পরতে সঞ্চিত যত ক্লেদ, অত্যাচার আর গ্লানির। এইবার যবনিকা টানা চলে—জমিদারদের নির্বাপিত দীপ-উৎসব রজনীর উপর। কিন্তু শুধু তাই বোধ হয় নয়। জমিদার চিত্ত রায়ের থেকেও আমাদের মনের মধ্যে বোধ হয় বেশি দাগ কাটে বাঙালী যুবক চিত্ত রায়—শক্তিতে, স্বাস্থ্যে, সাহসে ভাস্বর। নিষ্কম্প হাতে যে মা'র বুকে ছুরি বসিয়ে দেয়, স্থিরচিত্তে রাত্রে বসে বসে যে তালিকা করে কে পর পর মরবে, পালিয়ে যাওয়ার কথায় যার সমস্ত পৌরুষ ঘৃণায় সংকুচিত হয়ে ওঠে। বাঙলার এই মৃত্যুঞ্জয়ী যুবকের দেখা নাকি আর আগের মতন পাওয়া যায় না। কিন্তু নিঃশেষও তারা হয় নি। কখনও ধর্মতলার রাস্তায়, কখনও কলকাতার ময়দানে, কখনও বা নোয়াখালিরই গ্রামে, তাদের মরণজয়ী অট্টহাসি শোনা যায়, সারা দেশ চকিত হয়ে চেয়ে দেখে এ বাঙলার সেই চিরপরিচিত তারুণ্যের মূর্তি।

রাত্রে বাড়ি ফিরবার সময় মন সকলেরই ভারাক্রান্ত। কিন্তু এ বেদনাও পরম সান্ত্বনায় মাখা, এ আমাদের 'রোদনভরা আনন্দ'। নোয়াখালিতে এসে অবধি এ জিনিস, এ অনুভূতি আর কোনোদিন পাই নি। তবু এর সঙ্গেও একটা কথা কাঁটার মতো খালি বুকে খচখচ করছিল : চিত্ত রায়ের স্ত্রীর কথা। সে হতভাগিনী নারী আজ না জানি কিভাবে দিন কাটাচ্ছে! আফ্‌সোসে, অনুতাপে তার ভিতরটা ছারখার হয়ে যাচ্ছে না কি? কে জানে কী ধরনের মেয়ে সে। আর, চিত্ত রায়ের ছেলে-মেয়েরা? বীরপিতার সন্তান তারা, ভীরু মায়ের ভীরুতাকে শতবার ধিক্কার দিয়ে, ভীরুতার মূল্যে রক্ষা পাওয়া জীবনগুলো কিভাবে কাটিয়ে চলেছে তারা কে জানে!

মাঝখানে কিছুদিন কলকাতা ঘুরে যেতে হল এ্যাসেমব্লির জন্য। এ্যাসেমব্লির

'এয়ার-কন্ডিশন্‌ড্‌' ঘরের গদিআঁটা চেয়ারে বসে অনারেব্‌ল্‌ মেম্বারদের কায়দাদুরস্ত বক্তৃতা শুনতে শুনতে মনে হত—কী ভীষণ অবাস্তব এই-সব, কত বেশি দূরে দেশের মানুষের থেকে, বাস্তব থেকে, সত্যিকারের সমস্যা থেকে।

আবার নোয়াখালি ফিরে গিয়ে এবার খানিকটা গঠনমূলক কাজে মন দিলাম। এবারে আমার আস্তানা হল নোয়াখালির দক্ষিণচরের এলাকায়—টুমচর, চররোহিতা, চরমণ্ডল এই-সব গ্রামে। এর সবগুলি গ্রামই নমঃশূদ্রপ্রধান। বিশেষ করে চরমণ্ডল গ্রামটিতে খুব ঘন বসতি, ঘর নমঃশূদ্রের ঘর। মানুষগুলি সাদাসিধে, বেশিরভাগই অশিক্ষিত। এদেরও প্রায় প্রত্যেকেরই ঘরবাড়ি লুঠ হয়েছে, ধর্মান্তর করেছে, মেয়েদের শাঁখা সিঁদুর ভেঙে মুছে দিয়েছে। মেয়েদের আর কী কী অত্যাচার সইতে হয়েছে সব জানি না—ওরা চেপে যেতে চায়, আমরা ও-সব নিয়ে বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করি না। তবে দু-একটা জোর করে বিয়ে করার ঘটনা যে এ-সব গ্রামে হয়েছে তা জানতাম।

সাধারণত এ-সব গ্রামে অতি ছোটো বয়েসে বিয়ে দিয়ে দেয় এরা। বাল-বিধবায় ভর্তি গ্রাম। এখানকার বেশিরভাগ বিধবা মেয়েদেরই কেমন যেন লাগে, মনে হয় ভিতরে আছে গ্লানি। এখানে বৈধব্যের কড়াকড়ি কম। এক হিসেবে সেটা ভালো। কিন্তু ছোট্টবেলায় জ্ঞান হতে-না-হতেই বিয়ে, তারপর সারাজীবন বিধবা হয়ে থাকা, পুনর্বিবাহের কোনো ব্যবস্থা নেই, লেখাপড়াও শেখানো হয় না। মনে হত এ যেন একরকম জোর করে ব্যভিচারের দিকে ঠেলে দেওয়া। প্রকাশ্যে গ্রামের পথে ঠোঁটে আলতা মেখে, গায়ে গয়না পরে, এদিকে সরুপাড় ধুতি ও সিঁদুরহীন সিঁথিতে বৈধব্যের চিহ্নটুকু বজায় রেখে—রাস্তার মাঝে দাঁড়িয়ে-থাকা-মেয়ে, এ দৃশ্য এর আগে কখনও চোখে পড়ে নি। অবাক হয়ে বোকার মতো কতগুলি প্রশ্ন করে ফেললাম তাকে।

দুপুরে আমাদের ক্যাম্পের স্কুলে পড়তে আসত কয়েকটি মেয়ে। রানী (আমার সহকর্মী) একদিন তাদের আস্তে ডেকে বলল—"শুনুন একটা কথা বলি, ঠোঁটের ওপর কী দিয়েছেন? ওতে বড়ো বিশ্রী দেখায়। তা ছাড়া আলতা তো পায়ের জন্য, ও বিষ, মুখে দিলে খুব ক্ষতি হয়, সব দাঁত পড়ে যায়। কপালে ওই যে আপনি টিপ পরেছেন (এ মেয়েটি সধবা) ওতেই খুব ভালো লাগছে।"

সেই মেয়েগুলি উঠে গিয়ে মুখ ধুয়ে এল। যা হোক কথাটা রাখল। কিন্তু তা হলে কী হবে, সমাজের এই একটা মস্ত সমস্যা এই গ্রামে যেন চোখে আঙুল দিয়ে নিজেকে সব সময়ে জাহির করছে। রানী বলছিল ওর কাছে নাকি মেয়েরা গল্প করেছে, ঝুলনের রাত্রে এখানে অনেক সব বিশ্রী কাণ্ড হয়। একেবারে প্রকাশ্যে, সামাজিক উৎসব হিসেবে। আশ্চর্য! বাইরে যারা নিজেদের এত বাঁধতে চেয়েছে, সেই সমাজের ভিতরেই এত অসংযত উচ্ছৃঙ্খলতা আর কদর্যতা।

বিকেলের দিকে গ্রামের অনেক মেয়েই ক্যাম্পে বেড়াতে আসত। তার মধ্যে একটি মেয়ের কথা মনে পড়ছে। মেয়েটির আড়ালে তার মা চুপিচুপি আমাকে বলল—"আমি গরিব বিধবা, মেয়েকে বেশিদূর পড়াতে পারি নি, মেয়ের তাই বড়ো রাগ।"

ছিলাম না। এবারে মরব, তবু বাড়িতে ঢুকতে দেব না।" এ ধরনের কথা নোয়াখালিতে পুরুষদের মুখেও কম শুনেছি। মেয়েরা তো কোথাও চিৎকার শুনেই কাঁপে আর কাঁদে। তাই এদের মুখে এই ধরনের কথা ভালো লাগল বড়ো।

গঠনমূলক কাজের মধ্যে 'স্কুল' করার দিকেই আমার ঝোঁক সবচেয়ে বেশি ছিল। পল্লী-সমাজের রমেশের জ্যেঠিমার কথাটা কানে বাজত : "ওরে, আলো জ্বেলে দে রে, শুধু আলো। তারপর ওরা নিজেরাই বুঝতে পারবে কোন্‌টা ভালো আর কোন্‌টা মন্দ।"

দুপুরে গিয়ে বৌদের পড়াতাম। রাত্রে পুরুষদের জন্য নাইট-স্কুল। সারাদিন ক্ষেতে রোদে বৃষ্টিতে খেটেখুটে পরিশ্রম করে বেচারিদের ক্লান্তির আর শেষ থাকত না। তবু সব কাজের শেষে রাত নটার সময় সবাইকে টেনে নিয়ে মহা সোরগোল করতে করতে ক্যাম্পের ভিতরকার স্কুল-ঘরটায় বই-শ্লেট নিয়ে যেতাম। মাটিতে হোগলা পাতা হত, উপরে হ্যারিকেন ঝোলানো হত, সঙ্গে নেওয়া হত শ্লেটমোছার জন্য ন্যাকড়া। আমাদের উৎসাহের প্রাবল্যের সামনে ওদের ক্লান্তি বা অনিচ্ছা মাথা তুলতে সাহস পেত না। কিছুদিন পরে ওদের উৎসাহ বাড়ল খানিকটা। কারো কারো মাথা ভালোই, চটপট বানানগুলো শিখে নিয়ে রীতিমতো চিঠি লিখতে শিখে ফেলল। দু-চারজন একটু বেশি বয়সের, তাদের পড়ানোই বড়ো শক্ত ছিল। অক্ষরগুলোই ঠিক চিনে উঠতে পারে না, অনেক শেখানোর পরও বলে—"আ—আর ম।"

"কী হল?"

"জল।"

মাঝে মাঝে হেসে ফেলতাম, কখনও রাগ হয়ে যেত। তখন এমন করুণ চোখে চাইত, বলত—"আমাদের আর হবে না কিছু।"

অনুতপ্ত হয়ে বলতাম—"না ভাই হবে না কেন, নিশ্চয়ই হবে। একটু সময় লাগবে আর কি!"

ওদের একজন পড়া শিখতে পারত না কিছুতেই, কিন্তু অঙ্কে ভালো মাথা ছিল। পড়া না পারার লজ্জাটা সে ঢাকতে চাইত সব অঙ্কগুলোর সঠিক উত্তর কষে আমাদের প্রশংসা অর্জন ক'রে।

চরমণ্ডল গ্রামে ছোটো ছেলেদের জন্যেও কোনো স্কুল দেখলাম না। শুনলাম জেলা স্কুল বোর্ডের সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুল আছে একটা। কিন্তু সেটাও বসে না। মাস্টারই আসে না, কী করে বসবে? অনেক কষ্টে মাস্টারটিকে খুঁজে বার করলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, "স্কুল খোলেন না কেন?"

মাস্টারমশাই বললেন, "স্কুল বোর্ড থেকে তেরো টাকা মাইনে পাই, ওতে আমার পোষায় না। গ্রামের লোক চাঁদা তুলে দেবে বলেছিল কিন্তু কোনোদিনই দিল না। আমি পড়াতে পারব না।"

তেরো টাকা মাইনে। শুনেই মনটা একটা ধাক্কা খায়, মুখেও কিছুক্ষণ কথা জোগায়

না, তবু খানিকটা গায়ের জোরেই তাঁর সঙ্গে ঝগড়া করলাম, "তা হলে বোর্ড থেকে তেরো টাকাই বা নেন কেন মাসে মাসে? টাকা নেবেন, অথচ গ্রামশুদ্ধ ছেলেমেয়েগুলো এভাবে মূর্খ হয়ে ঘুরে বেড়াবে, সে কী করে হয়?"

মাস্টারমশাই তৎক্ষণাৎ আমার হাতে একখানি পদত্যাগপত্র লিখে দিলেন, বললেন, "দরকার নেই আমার তেরো টাকার, পাঠিয়ে দেবেন আপনি পদত্যাগপত্র।"

কাগজখানা হতে নিয়ে মহা মুশকিলে পড়লাম। ভাবলাম "তেরো টাকায় নতুন মাস্টারই বা পাই কোথায়?" শেষে ঠিক হল আপাতত আমরাই পালা করে করে পড়াব। গ্রামে একজন পুরোহিত ছিলেন একটু লেখাপড়া জানা, আর একজন গ্রাম্য কবিরাজ—তাঁদেরও চেপে ধরলাম। বললাম, রোজ ঘণ্টাখানেক করে অন্তত আসবেন স্কুলে? তাঁরা রাজী হলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্কুলটা খুলে আসতে পারি নি। স্কুলঘরটা ঠিক করে সুপারিগাছের বেঞ্চিগুলো বেঁধে এসেছি মাত্র। পরে অবিশ্যি খবর পেয়েছি, টিকেনভাই (সহকর্মী) লিখেছে স্কুলটা নাকি চলছে ভালোই। গ্রামের লোকেরা এতদিনে রাজী হয়েছে মাস্টারের মাইনে বাবদ কিছু চাঁদা দিতে।

২৩

নোয়াখালিতে বসে বসেই কাগজে পড়লাম ৩ জুনের মাউন্টব্যাটেনের ভাষণ। ভারতবর্ষের স্বাধীনতালাভ আরো নিশ্চিততর, আরো সংকীর্ণতর পরিধির মধ্যে বাঁধা পড়ল—পরম আনন্দের কথা। ভারত বিচ্ছেদ আর বাঙলা বিচ্ছেদ—গত্যন্তর নেই বলে, বর্তমান অবস্থায় বাঁচবার একমাত্র উপায় বলে, মনটা অনেক আগেই প্রস্তুত করে নিয়েছিলাম। তবুও মনটা যেন বিষাদ আর অবসাদে ভারাক্রান্ত। বিশেষ করে নোয়াখালির—এই বিধ্বস্ত উপদ্রুত মাটিতে দাঁড়িয়ে বঙ্গ বিচ্ছেদ সহ্য করা যেন একেবারেই অসম্ভব হয়ে উঠছিল। আশেপাশের লোকেদের মুখের দিকে চাইতে পারছিলাম না। ওদের চোখেমুখে একটা নীরব অসহায় অভিযোগ কেবলই আমাকে বিদ্ধ করত : "এ তোমরা কী করলে? কোথায় আমাদের ভাসিয়ে দিয়ে যাচ্ছ তোমরা!"

ইচ্ছা হত ওদের হাত জড়িয়ে ধরে চেঁচিয়ে বলি, "না, না, তোমাদের ছেড়ে আমরা যাই নি, যাব না। তোমাদের সঙ্গে আমাদের বংশপরম্পরার, জন্মজন্মান্তরের সম্বন্ধ, তোমরা যে আমরাই।"

আমাদের নিজেদের দেশ চট্টগ্রামের কথাও মনে পড়ে যেত। দেশের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ কম। বাবা বরাবর বাইরে—কলকাতায় চাকরি করেছেন, আমাদের তাই দেশে যাওয়া হয়নি বেশি। তবু ছোটোবেলা থেকে চট্টগ্রামের কথা আর গল্প শুনে আসছি। মা খুব ছোটোবেলা থেকেই মুখস্থ করেছিলেন না-দেখা ঠাকুরদাদা আর ঠাকুরমার নাম, দেশ জিজ্ঞাসা করলে অতি ছোটোবেলায় আধো-আধো স্বরে বলতাম, "চত্তগ্রাম"। দেশে থাকতাম না বলেই যেন আরো নিবিড় করে দেশকে আপন করে রাখতে ইচ্ছা

হত। একটু বড়ো হয়ে বাবার কাছে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেশের গল্প শুনতাম—শুনতাম বাবার ছেলেবেলার গল্প। বাবা সবচেয়ে ভালোবাসতেন তাঁর বাবার গল্প বলতে, বলতেন, "আমাদের দেশের প্রাচীন সংস্কৃতির যা-কিছু মহৎ, যা-কিছু উদার, সব আমার বাবার মধ্যে দেখতে পেতাম।"

ছোটোবেলায় কবে একবার দুর্দান্ত ঝড়ের দিনেও প্রতিবেশীর ডাক শুনে ছ-সাত বছর বয়সের ছেলেকে (আমাদের বাবা) খড়ের ঘরের একটা চৌকির ধারে বসিয়ে রেখে ঠাকুরদাদা প্রতিবেশীর সাহায্যের জন্য চলে গিয়েছিলেন—সে গল্প কতবার যে শুনেছি আমরা। তাছাড়া ঠাকুরদাদার সম্বন্ধে বাবার মনে একটা গোপন ব্যথা ছিল জানতাম। বাবা যখন প্রথম যৌবনে ব্রাহ্মসমাজের সংস্পর্শে এসে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করে ব্রাহ্মসমাজে বিবাহ করলেন, ঠাকুরদাদা গভীরভাবে আহত হয়েছিলেন। কিন্তু বাইরে কোনোদিন তার কোনো অভিব্যক্তি ছিল না। একবার আমাদের এক পিসেমশাই বাবার আলাদা খাবার ব্যবস্থা করেছিলেন। ঠাকুরদাদা তাতে মর্মান্তিক দুঃখিত হন। শেষে পিসেমশাই ঠাকুরদাদার কাছে অনেক করে ক্ষমা চেয়েছিলেন, বলেছিলেন, "আমি কি সত্যি ওকে আলাদা করে রাখব? শুধু ও যদি একটু কষ্ট পেয়ে, ভয় পেয়ে, মতটা বদলায় সেইজন্যই ওকে আলাদা খেতে দিয়েছিলাম।" অত বছর আগে ঠাকুরদাদার মনের এই উদারতা একটু অসাধারণ বৈকি।

বড়ো হয়ে বাবার সঙ্গে যখন প্রথম দেশে গেলাম। দেখলাম, আমাদের দেশের প্রতি মমতা শুধু একতরফা নয়। দেশের, বিশেষ করে আমাদের 'সাড়োয়াতলী" গ্রামের সকলেই আমরা যেতেই একান্ত আপনজনের মতো আমাদের কাছে টেনে নিলেন। বাবা তখনও সেখানে সকলেরই পরম শ্রদ্ধার 'বড়্দাদা' বা 'বড়োজ্যাঠা'। এখনও গ্রামের অনেকেই বাবাকে চিনল, বাবারও পুরোনো সব স্মৃতি কত যে মনে পড়ে যায়! গ্রামে আমাদের পাশের বাড়ির প্রতিবেশী চাঁদ মিঞার ছেলে এসে বাবাকে প্রণাম করে দাঁড়াল। বাবা আমাদের বললেন, "ছোটোবেলায় ওদের বাড়ি গিয়ে কত দুধ যে খেয়েছি, খুব ভালো ভালো গোরু ছিল ওদের।"

আমাদের প্রতি অবিশ্যি আত্মীয়স্বজনের একটু অভিমানও আছে—আরো বেশি দেশে যাই না বলে। আসার সময় বলে এলাম, "এবার খুব বেশি আসব, এত সুন্দর আমাদের দেশ আর এত আদর তা তো জানতাম না আগে, এখন লোভ বেড়ে গেল।"

বাবা সঙ্গে করে আমাদের দুই ভাইবোনকে দেশের প্রতিটি জায়গা দেখালেন—চন্দ্রনাথ পাহাড়, সহস্রধারা, সীতাকুণ্ড, বাড়বকুণ্ড, এমন-কি, কর্ণফুলির মোহানা বরখল অবধি। দেশ থেকে চলে আসার সময় মনে হচ্ছিল বড়ো আপন জায়গা ছেড়ে যাচ্ছি। নাই বা ওখানে মানুষ হলাম, নাই বা থাকল খুব ঘনঘন যাওয়া-আসা, তবু—'দেশ' দেশই, পিতৃভূমি—"সপ্তপুরুষ যেথায় মানুষ সে মাটি সোনার বাড়া।"

বাঙলা বিভাগের কথা স্থির হয়ে যাওয়ার পর মনে মনে স্থির করে ফেললাম চট্টগ্রামে এখন আরো বেশি করেই আসা-যাওয়া করতে হবে আমাদের—পিতৃভূমির

ঋণ বেশি সুদে শোধ করার সময় এসেছে। কাগজে দেখলাম বাঙলা ব্যবচ্ছেদের জন্য ছুরি ধরবার ভারটা আমাদের অর্থাৎ পরিষদের সদস্যদের উপরই পড়েছে। এবার তাহলে আবার কলকাতায় ফিরতে হয়। অনেকদিন থেকেই একবার সন্দ্বীপ যাওয়ার কথা হচ্ছিল, সেজন্য আগে একবার সন্দ্বীপ ঘুরে যাওয়া ঠিক হল। বাঙলার এক প্রান্তে পড়ে-থাকা এক ছোট্ট দ্বীপটি—কারোই বড়ো ওখানে যাওয়া-আসা হয় না। অথচ সাম্প্রদায়িক ঝড়ঝাপটা ওখানকার উপর দিয়েও কম যায় নি। আমরা যেতেই একদিকে যেমন পুঞ্জীভূত দুঃখ-অভিমান সকলের মুখর হয়ে উঠল, তেমনি ওখানকার কর্মীরা, অধিবাসীরা যেন মস্ত বড়ো একটা আশ্রয় বা ভরসার স্থান পেল এমনিভাবে আমাদের আঁকড়ে ধরল। প্রায় চারদিন ওদের সঙ্গে বড়ো আনন্দে কাটালাম, গ্রামে গ্রামে ঘুরলাম, ওদের সমস্যার কথা শুনলাম, পরামর্শ দিলাম।

এদিকে মনে মনে আমি ফেরবার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছি। দুর্যোগের জন্য ওখানে কোনো খবরের কাগজ আসছে না, ডাক বন্ধ। আমার কেবলই মনে হতে লাগল—কী জানি যদি পরিষদের অধিবেশন খুব তাড়াতাড়ি হয়?

সন্দ্বীপে আসা-যাওয়া যে এত হাঙ্গামার আগে জানতাম না, তা হলে এত কম সময় হাতে নিয়ে, এত বড়ো দায়িত্ব মাথায় রেখে যেতাম না নিশ্চয়ই। প্রথম দিন ফেরবার স্টিমার ধরতে গিয়ে দেখি উত্তাল সমুদ্র, আর আকাশের ঈশান কোণে মেঘের সাড়ম্বর সমারোহ। মাঝিকে বললাম, "ইউসুফভাই, স্টিমার অবধি তুলে দিতে পারবে না?" মাঝি রাজী হল। কিন্তু নৌকোয় উঠে চারদিকের অবস্থা দেখে সঙ্গীরা অনেকে ভয় পেয়ে গেলেন, আমাদের যিনি সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর ভয়ই বেশি। আমি তখনও মাঝিকে যাবার জন্য তাগিদ দিচ্ছি দেখে ধমক দিয়ে উঠলেন, "খবরদার মাঝি, ওঁর কথা শুনো না, স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী।" জাতিগত আক্রমণে আমারও মাথা গরম হয়ে উঠল। আমি প্রত্যুত্তরে অমনি একটা প্রবাদ দিয়ে ওঁকে বকবার চেষ্টা করতে লাগলাম। একটা প্রবাদও মনে এল না ছাই—সংসারে যত প্রবাদ সবই কি মেয়েদের বিরুদ্ধে লেখা? মুখে বলা চলে না, মনে মনেই গজগজ করতে লাগলাম—এমন ভীতু লোক এরা, এদের সঙ্গে আসাই ভুল হয়েছে।

প্রথম দিন স্টিমার ধরা হল না। নৌকো যদিও ঘাট অবধি গিয়েছিল শেষ পর্যন্ত, কিন্তু স্টিমার সেদিন ছাড়বে না বলায় ফিরে আসতে হল। চুপচুপে ভিজে কাপড়ে গোরুর গাড়িতে চড়ে যখন বাড়ির কাছাকাছি এসে পড়েছি তখন শুনলাম স্টিমার ছাড়ার আওয়াজ। সেদিন আর যেতে পারলাম না। পরের দিন বরিশালের স্টিমার ধরে, বরিশাল হয়ে কলকাতায় ফিরলাম। সেদিনও সমুদ্রের অবস্থা খারাপ ছিল, কিন্তু আমার মুখের অবস্থা আরো খারাপ দেখে কেউ আর সেদিন বিশেষ আপত্তি করলেন না। স্টিমারে উঠে দেখি, হাতিয়ার মুসলিম লীগ এম. এল. এ. ওই স্টিমারেই যাচ্ছেন। তাঁর কাছে শুনলাম কুড়ি তারিখে আমাদের পরিষদের অধিবেশন। আর সেদিন সতেরো তারিখ। অর্থাৎ এ স্টিমারটি না ধরতে পারলে আমার কুড়ি তারিখে কিছুতেই কলকাতায়

পৌঁছোনো হত না। যিনি আমায় সেদিন নৌকোয় বকেছিলেন তাঁকে বললাম, "শুধু স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী তাই দেখলেন, আর মেয়েদের প্রত্যক্ষ-অনুভূতি কি রকম তীব্র হয় তা দেখলেন না?"

কলকাতায় এসে দেখি ভীষণ হৈ হৈ পড়ে গিয়েছে। আমার তখনও না ফেরায়, আর বিশেষ করে সন্দ্বীপ যাওয়ায় সবাই বিস্মিত আর সন্দিগ্ধ। বাজারে জোর গুজব, আমি নাকি লাখ টাকা ঘুষ নিয়েছি ভোট না দেবার জন্য। বাবা এ-সব শুনে অস্থির হয়ে শেষে আমার ছোটোভাইকে নোয়াখালি পাঠিয়ে দিয়েছেন আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসবার জন্য। তার আগে টেলিগ্রাম আর চিঠি আর ট্রাঙ্ক-কলে নোয়াখালির পোস্ট অফিস বড়োলোকই হয়ে উঠেছে প্রায়। তার একটাও আমি পাই নি, আগেই বলেছি সন্দ্বীপে ডাক যাচ্ছিল না। আমি বাবার উপর রাগ করলাম, "মিথ্যা নিন্দাতে এত ভয় পাও কেন, বাবা? টাকার ব্যাপারে আমার কোনো কথাই তো গায়ে লাগে না। যা জানি সম্পূর্ণ মিথ্যা, তাতে বিচলিত হও কেন?"

বাবা উত্তরে বললেন, "তুই ভয় না করতে পারিস, কিন্তু আমি যে বাবা।"

কলকাতায় ফিরে এসে এবার আমাদের মনে প্রশ্ন জাগল : দেশ তো প্রায় স্বাধীন হয়ে এল, এখন আমরা করব কী। এখনকার কাজ যেন আরো কঠিন মনে হতে লাগল: স্বাধীন দেশকে গড়ে তোলার কাজ। কী দিয়ে আরম্ভ করব, কোন্‌খান থেকে শুরু হবে, কী হবে পদ্ধতি? সবাই সবাইকে প্রশ্ন করি, উত্তর কারুরই জানা নেই। দেশে সোশ্যালিজম যে আমরা আনতে চাই সে বিষয়ে তো কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু সেখানে পৌঁছবার পথ মনের মধ্যে স্পষ্ট করে আঁকা নেই যেন। দেশের কারো মনে আছে কি না সন্দেহ। 'সোশ্যালিজম' শুনতে আর ভালোও লাগে না। একদিন বন্ধুদের কাছে বলছিলাম, "মুশকিল হচ্ছে এই : এখন সকলেরই মুখে সোশ্যালিজম্—শরৎবাবুর, প্রফুল্লবাবুর, সুরেনবাবুর, শিবনাথবাবুর—অথচ এদের কারুরই মিল নেই।"

একটি বন্ধু আমাকে সংশোধন করে বলল, "আরো সুরাবর্দির নামটা বাদ দিয়ে গেলে যে বড়ো? ওঁর মুখেও তো 'সোশ্যালিজম্'! 'ইত্তেহাদ' পড়ো নি বুঝি?"

কিন্তু কথার ফাঁকি দিয়ে কতদিন আর চলবে! এবার সুস্পষ্ট আর বলিষ্ঠ রেখায় নিজেদের লক্ষ্য শুধু নয়, লক্ষ্যে পৌঁছবার পথ এবং উপায় দুটোই এঁকে নেবার সময় এসেছে, গোঁজামিল আর চলবে না। কংগ্রেস-সম্পাদক শঙ্কররাও দেও-র এ সম্বন্ধে বিবৃতিটা ভালো লাগল। তিনি বলেছেন, "কংগ্রেসের রাজনৈতিক কাজ শেষ হয়েছে। এখন সামাজিক বিপ্লব সংগঠন করার দায়িত্ব নিয়ে নতুন নীতি তাকে ঠিক করে নিতে হবে।"

আমাদের কংগ্রেস কর্মীদেরই যেন হয়েছে সবচেয়ে মুশকিল। আমরা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এতদিন প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছি 'কিষাণ মজদুর রাজ'-এর। বলেছি, ক্ষমতা হস্তান্তর মানেই দেশের জনসাধারণের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর। আজ সেই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করার দিনে পথে কত যে বাধা চোখে পড়ে। চোখে পড়ে অনেক কিছু দুরূহ সমস্যা

যা আগে 'ও কিছু না, সব এমনিই ঠিক হয়ে যাবে' বলে উড়িয়ে দিয়েছি। আমাদের বাড়ির 'নতুন জেনারেশানের' কংগ্রেসের প্রতি আস্থা কম। আমার বোনঝিরা সোশ্যালিস্ট পার্টিতে কাজ করে, বালিগঞ্জের কাছাকাছি চব্বিশ পরগণার গ্রামে 'কিষাণ সঙ্ঘ' গড়ে তুলেছে—নিষ্ঠা আর পরিশ্রমের শেষ নেই। আমার সঙ্গে মেলে না কংগ্রেস নিয়ে। ওরা বলে—"কংগ্রেসের মধ্যে রয়েছে যতসব জমিদার আর বড়োলোকেরা—এদিকে গ্রামে ওদের সঙ্গে আমাদের লড়াই করতে হয়। কাজেই কংগ্রেসের কাজ করে আমরা সুবিধা পাই না।"

এতদিন মুখে তর্ক করে এসেছি, বলে এসেছি কংগ্রেসের উপর ওরা অবিচার করছে, কংগ্রেস দেশের জনসাধারণের জিনিস, দরিদ্র জনসাধারণকে বাদ দিয়ে কংগ্রেস একদিনও বাঁচতে পারত না। তাছাড়া কংগ্রেসের ইতিহাস খুললেই দেখা যায়, ধনিকে আর গরিবে একটা নীরব সংঘর্ষ অনেকদিন ধরে ওর ভিতরে চলে আসছে, যার ফলে ক্রমেই ধনীরা সরে দাঁড়াচ্ছে, প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে দরিদ্ররা—সাধারণ মানুষরা।

কিন্তু শুধু মুখের তর্কের দিন তো আর নেই। সামনে বাস্তবের অগ্নিপরীক্ষা কংগ্রেসকে পার হতে হবে। হয় সে-পরীক্ষা থেকে সে উত্তীর্ণ হয়ে আসবে সগৌরবে, একটি আঁচড় গায়ে না লাগিয়ে—বিপুল শক্তির আধার হয়ে। আর নয়তো আজকের বঞ্চিত, জাগ্রত জনশক্তির পুঞ্জীভূত দাবির সংঘাতে চৌচির হয়ে ভেঙে পড়বে এতদিনের এই বিরাট প্রতিষ্ঠান। কংগ্রেস কর্মীদের আজ একটা সংকটময় দিন এসেছে সন্দেহ নেই। অনেকটা যেন জীবন-মরণ সমস্যা।

আপাতত সকলকে এই বলে থামিয়ে রাখি : "আগে ১৫ই আগস্ট আসতে দাও, আগে আমাদের নতুন শাসনযন্ত্র গড়ে উঠুক। কংগ্রেসের পরীক্ষা তো একদিনেই শেষ হবে না, এ পরীক্ষা দেশের জনগণের সামনে চলবে, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর। তারই মধ্য দিয়ে ক্রমেই পরিস্ফুট হয়ে উঠবে তার সত্যিকারের রূপ—সত্যিকারের পরিচয়। নতুন করে অর্জন করে চলবে কংগ্রেস দেশের লোকের শ্রদ্ধা আর আস্থা।"

ইতিমধ্যে একটু-আধটু যা ঘটেছে তাতে কিন্তু ক্ষুব্ধ হবার কারণ আছে যথেষ্টই।

সেদিন খবরের কাগজ হাতে নিয়ে খোকা (ছোটো ভাই) ঘরে ঢুকে বলল, "গভর্ণরের মাইনে কত ঠিক হল দেখেছ? এতেও তোমরা কিছুই করবে না?" কী যে করব তাই-ই তো সমস্যা! মনে পড়ছিল ডাণ্ডি অভিযানের আগে মহাত্মাজীর ভাইসরয়কে লেখা চিঠি : "পৃথিবীর কোনো দেশের শাসনযন্ত্রের যিনি শীর্ষস্থানীয় তাঁর সঙ্গে দেশের জনসাধারণের গড়পড়তা আয়ের এত প্রভেদ থাকে না যেমন আছে ভারতবর্ষে।"

সেই একান্ত বিসদৃশ প্রভেদ মুছে দেবার সময় আজও কি এল না? খোকা বলে চলল—"কিচ্ছু ভালো লাগছে না আমার। ১৫ই উৎসব করতে ইচ্ছা করছে না। সমস্ত থানায়, কোর্টে, আর অফিসে সেদিন পতাকা তোলার ভার দেওয়া কিনা যতসব এস. পি., এস. ডি. ও. আর ম্যাজিস্ট্রেটদের উপর—যারা একদিন এই পতাকার কী

লাঞ্ছনাই না করেছে। একবার কল্পনা করো তমলুক থানায় বিপ্লবের দিনের মাতঙ্গিনী হাজরাকে যে গুলি করে মেরেছে, সেই এস. পি.ই আজকে সসম্মানে দাঁড়িয়ে সেই থানাতেই গিয়ে পতাকা তুলবে। স্বাধীনতার এমন অসম্মান, বিপ্লবী শহীদদের এমন চরম অমর্যাদা এর আগে কোনো দেশে হয়েছে কি? কী হত যদি বলা যেত সরকারি বাড়িগুলোয় পতাকা তুলবেন সমস্ত জেলার জেলা-কংগ্রেসের সভাপতি, সম্পাদক বা অন্য কোনো রাজনৈতিক বহুলাঞ্ছিত কর্মী?"

ওর কথার কিছু উত্তর দিলাম না, মনটা আমারও ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। মনটা ভেসে চলে গেল আগেকার দিনগুলোয়। মাতঙ্গিনী হাজরার এক হাতে গুলি লেগেছে, অন্য হাতে পতাকা আঁকড়ে ধরে চিৎকার করছেন, "এগিয়ে চলো—এগিয়ে চলো।" শেষে সে হাতেও গুলি লাগল, কপালে গুলি লাগল, রক্তাক্ত দেহ ভূলুণ্ঠিত হয়ে পড়ল, তখনও তাঁর হাতে পতাকা ধরা রয়েছে!

মনে পড়ছিল কলকাতায় এস. বি. আর আই. বি. অফিসের অত্যাচারের কথা। ব্যাটারি চার্জ, বরফে শুইয়ে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা, চাবুক দিয়ে মেরে মেরে অজ্ঞান করে দেওয়া—আবার জ্ঞান ফিরিয়ে এনে আবার মারা। ব্যক্তিগত প্রতিশোধের সময় এটা নয় জানি, কিন্তু তবু ভাবি যারা এতদিন ধরে অত্যাচার করে এসেছে—যাদের উপর নির্ভর করে পরম নিশ্চিন্ততায় এতদিনের ব্রিটিশ সাম্রাজ্য তার নির্মম শোষণ চালিয়ে এসেছে—তাদের যদি আজ স্বাধীন ভারতবর্ষেও আমরা সম্মান মর্যাদা দিয়ে সসম্মানে এগিয়ে দিই, তাহলে সেই স্বাধীন ভারতের কাঠামোটা তেমন শক্ত হয়ে গড়ে উঠবে কি? স্বাধীন ভারত সৃষ্টি হয়েছে যে-সব শহীদদের অস্থি আর রক্ত দিয়ে তাদের সঙ্গে এই চির-স্বার্থান্বেষী মনুষ্যত্বহীন মানুষগুলির আজকের দিনের কর্মধারায় কোনো মিলই থাকবে কি, সমস্ত ইমারতটাই এই বৈপরীত্যের সংঘর্ষে ভেঙে পড়বে না তো?

খোকা আরো যেমন বলছিল, "জানো অমুক অমুক গত যুদ্ধের সময় কংগ্রেসের কথা না মেনে যুদ্ধে গিয়েছিল, আজ তারা 'কিংস কমিশন' নিয়ে জাঁকিয়ে বসেছে, মোটর হাঁকিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।" কংগ্রেস গভর্নমেন্ট তাদেরই ডাকল স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলনের সময় 'গার্ড অব অনার' দেবার জন্য। আর যারা আজীবন স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করে এল, ১৯৪২ সালের বিপ্লবের আয়োজন যারা নিজেদের সমস্ত শক্তি দিয়ে গড়ে তুলল তারা আজ কোথায় পড়ে রইল তা কে জানে! কেউ হয়তো আমাদের কিশোর কর্মী কমলের মতো যক্ষ্মাগ্রস্ত হয়ে পড়ে রয়েছে, কেউ বা বেকার হয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছে। কেউ পড়ে রয়েছে কোন্ অখ্যাত কোনায়, কেউ তার খবর রাখে না।"

আবার কল্পনা করলাম—পণ্ডিত জওহরলাল আহ্বান করেছেন তাদের যারা যে-কোনো ভাবে হোক স্বাধীনতার সংগ্রামে যোগ দিয়েছে—স্বাধীনতার যোদ্ধাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন, "রাজধানীতে, প্রত্যেকটি প্রদেশে প্রত্যেকটি জেলায়—সবচেয়ে প্রথম তারাই থাকবে রাষ্ট্রীয় পতাকাকে অভিবাদন জানাতে।"

তবুও উত্তরে খোকাকে বললাম, "যারা দেশের স্বাধীনতার জন্য সর্বস্ব পণ করতে

পেরেছিল, তারা স্বাধীনতালাভের পরেও এ ক্ষতিটুকু অম্লানবদনে সহ্য করে যেতে পারবে। ত্যাগের ও দুঃখের কাঁটার মুকুটই তাদের শ্রেষ্ঠ গৌরব—আজও তাই-ই থাক্ তাদের মাথার ভূষণ হয়ে, অন্য কিছুই তাদের জন্য কামনা করিস নে।"

তবে দেশের দিক দিয়ে দেশের ভার তাদের হাতেই আসাটা বাঞ্ছনীয়—যারা দেশের মানুষের জন্য ভাবে, দেশের স্বার্থ যাদের কাছে নিজের স্বার্থের চেয়ে বড়ো। কিন্তু তাও একদিন আসবে, পুরোপুরিই আসবে। আমাদের সংগ্রামের ইতিহাসের শেষ অধ্যায় আজও লেখা হয় নি। আজও আমরা অপেক্ষা করে থাকব—আজও পথচলা আমাদের শেষ হয় নি।

৮ই জুলাই এই বইটি লিখতে আরম্ভ করেছিলাম, আজ ১০ আগস্ট। তাকিয়ে দেখি লেখা শেষ হয়ে এসেছে। পিছনের পাতাগুলো উল্টেপাল্টে দেখি—কিছুই ভালো লাগে না যেন। কেন এ বই লিখলাম, কে জানে! কেবলই মনে হয় কিছুই বুঝি লেখা হল না, সবই বোধ হয় রয়ে গেল না-বলা। মনে অব্যক্ত যে ব্যথা আর আনন্দ, প্রীতি আর স্মৃতি, ব্যর্থতার কান্না আর তপস্যার সিদ্ধি জমা হয়ে রয়েছে তার কতটুকুই বা ফুটল আমার কলমের মুখে, আমার খাতার বুকে! ধরা পড়েছে শুধু একান্তই যা বাইরের জিনিস—যা না লিখলেই বোধ হয় ছিল ভালো।

বইটির লিখতে বসবার আগে মনে মনে আমি কী চেয়েছিলাম কী জানি! খানিকটা বিদায় নেবার ইচ্ছা ছিল কি? কর্মজগৎ থেকে বিদায়? সংসারের দুর্নিবার রথচক্রের অবিশ্রাম ঘূর্ণন থেকে বিদায়? মাঝে মাঝে সত্যিই বড়ো ক্লান্ত লাগে। মনে হয় জীবনীশক্তি বুঝি ক্ষীণ হয়ে আসছে—প্রাণের দুর্দম গতিবেগ হয়ে আসছে স্তিমিত।

তবু ছুটি যে মেলে না জীবনদেবতার কাছে। আজও জীবনের নব নব আহ্বান আমার প্রতিটি মুহূর্তকে পরিপূর্ণ করে রাখে। আজও অঞ্জলি পূর্ণ করে উপচে পড়ছে কত আনন্দের ঐশ্বর্য, কত মাধুর্যের অমৃত। নেব না বলে ফিরিয়ে দিতে কি পারি? নতশিরে বরণ করে নিই জীবনপথে জীবনদেবতার নব নব আশীর্বাদ।

মানুষের কান্না বুকে নিয়ে একদিন জীবনের যাত্রা আরম্ভ করেছিলাম। সে কান্নার আজও তো বিরাম নেই! আজও আকাশে বাতাসে শুনি দুঃখের হাহাকার, ক্ষুধার আর্তনাদ, অভাবের অব্যক্ত বেদনা। তাই আজও মনে আনা চলে না ক্লান্তির কথা, মনে আনা চলে না বয়সের অজুহাতে বিশ্রামের অনুসন্ধান। এই কামনাই আজ শুধু মনে জাগে—আমাদের বিপ্লবী জীবনের পরিণতি যেন টেনে নিয়ে না যায় একটা নিষ্কর্ম অবসাদের মরুভূমিতে। যেন জীবনের শেষ দিন অবধি বলতে পারি :

মহা- বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত
আমি সেই দিন হ'ব শান্ত,
যবে, উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল
আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না;
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ
ভীম রণ-ভূমে রণিবে না।

পথের শেষ আজও আমার হয় নি। আজও হৃদয়ের প্রতি স্পন্দনে বেজে চলেছে পথের দেবতার ডমরু ধ্বনি : "এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো—আগে আরো আগে।"

———